প্রকৃতিং পরমাং

(শ্রীশ্রীমা সারদার চরিতানুধ্যান)

দ্বিতীয় ভাগ

স্বামী অবজজানন্দ

প্রকাশক ঃ
শ্রীকৃষ্ণনাথ বসু
১৩/১-জি, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা ১৩৬৯
ইংরেজী ২৫ অক্টোবর, ১৯৬২

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

●

সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন
হাওড়া-৭১১ ১০১

অনুপমা বুক হাউস
৭, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

●

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

এবং প্রকাশকের নিকট

মুদ্রক ঃ
শ্রীঅসীম কুমার সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২, বিধান সরণী (ব্লক ৮৮-
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ব্লক মুদ্রাকর
রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট
৭/১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রকাশকের নিবেদন

মাত্র কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বে 'প্রকৃতিং পরমাং' প্রথমভাগ যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন চিন্তাতেও আনা যায় নাই যে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ মুদ্রণের জন্য পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে এমন প্রবল তাগিদ অচিরেই আসিতে থাকিবে। কিন্তু প্রথমভাগ দিবালোকে আসিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদগ্ধ সাধু-ব্রহ্মচারী, সুধী-সাহিত্যিক ও ভক্ত-পাঠক-পাঠিকা অনেকের নিকট হইতে ক্রমাগত অনুরোধ আসিতে শুরু করে দ্বিতীয় ভাগের জন্য। আমরা উহাতে কিছুটা অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিলাম, নিজেদের নানাবিধ অসুবিধা ও অক্ষমতার কথা ভাবিয়া। অবশেষে লজ্জাহারিণী মা আমাদের লাজ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারই প্রসন্নতায় ও কৃপায় গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ মুদ্রণের আনুকূল্যে সকল বাধাগুলিকে ক্রমে আমরা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হই,—আর্থিক সংস্থানও করিতে পারা যায় ধীরে ধীরে তাঁহার দয়াতে। পূজনীয় গ্রন্থকার তাঁহার সম্মতিসহ দ্বিতীয় ভাগের পাণ্ডু-লিপি ইতিমধ্যে আমাদের হাতে প্রদান করিয়া বাধিত করেন। শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর ইচ্ছায় 'প্রকৃতিং পরমাং' দ্বিতীয়ভাগ গ্রন্থখানিকে তাঁহার অনুরাগী প্রতীক্ষমান পাঠক-পাঠিকাদের হাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারায় আমরা বাস্তবিকই পরমকৃতজ্ঞ আজ। আন্তরিক প্রত্যাশা রাখি, গ্রন্থের প্রথম ভাগের মতোই, কিংবা ততোধিকভাবে বর্তমান দ্বিতীয়ভাগও ভক্তচিত্তে মাতৃচিন্তনের নব নব প্রেরণা সঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে,—অনুধ্যানোপযোগী প্রভূত উপকরণ লাভে ভক্তগণ উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন।

বর্তমান কঠিন অর্থ সঙ্কটের মধ্যে গ্রন্থমূল্য ব্যয়-আনুপাতিক ধার্য করা হইয়াছে, যাহাতে পুস্তক-সংগ্রহে বিশেষ চাপ সৃষ্টি না হয় কাহারও পক্ষে। ব্যবসায়-সম্মত হিসাব এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, লাভালাভের কোনও প্রশ্নও তাই নিতান্তই অবান্তর গণ্য হইয়াছে।

দি প্যারট প্রেসের সঞ্চালক শ্রীঅসীমকুমার সাহা এবং তাঁহার সহকারিগণ যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এই পুস্তকের মুদ্রণকার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই।

আমাদের এই স্বার্থহীন উদ্যোগে সুধী সজ্জন ও অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাগণের সহৃদয় সহানুভূতি নিয়তই কাম্য। মা তাঁহার সকল সন্তানের মঙ্গল করুন।

বিনীত

প্রকাশক

সূচীপত্র

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

সতেরো

আঠারো

পরিশিষ্ট

চিত্রসূচী

গ্রন্থ-পরিচয়

'প্রকৃতিং পরমাং'—দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রীশ্রীমায়েরই ধ্রুব ইচ্ছা এই প্রকাশনের পশ্চাতে,—তা' দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট আমাদের কাছে অন্যথায় গ্রন্থের প্রথম ভাগেই উদ্যোগের সমাপ্তি সাধিত হত। জগদম্বার কৃপায় আমাদের প্রকল্পিত 'প্রকৃতিং পরমাং' গ্রন্থখানিও দুই ভাগে সম্পূর্ণ হল এই সঙ্গে।

শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মোক্ষদা গুরুমূর্তির এবং তাঁর অখিল মাতৃরূপের অনুস্মৃতি-অনুচিন্তনই বর্তমান দ্বিতীয় ভাগের মূল আজীব্য প্রসঙ্গ। গ্রন্থের প্রথম ভাগে তাঁর দেবীভাব ও শাস্তিবিধায়িনী রূপের পরিচিন্তন যথাক্রমে দু'টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। অনুরূপ এই দ্বিতীয় ভাগেও দুই খণ্ডে মায়ের মুক্তিদাত্রী গুরুরূপকে 'ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ' এবং তাঁর অভয়প্রদা স্নেহময়ী জননীভাবকে 'মাতঃ প্রযত্নপরমাসি...' শীর্ষক অনুধ্যান-পর্বে ক্রমানুযায়ী চিত্রণের চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত 'ভূমিকা'-তে বিশদভাবেই নিবেদিত হয়েছে, আমাদের এই চরিতচর্চার মূল উপলক্ষ কী, তাৎপর্য কোথায়। ভরসা রাখি, তাতেই আমাদের মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে,—এখানে সে-সবের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জীবনীগ্রন্থে সাধারণতঃ ঘটনার কালক্রমিক সন্নিবেশ এবং সংসাধিত কার্যাবলীর পূর্বাপর সবিস্তার উল্লেখ থাকে। কিন্তু 'প্রকৃতিং পরমাং' সে-অর্থে একখানা জীবনী কিংবা জীবনকাহিনী নয়,—পরন্তু স্বল্পায়তন চরিত-চর্চা বা জীবনানুধ্যান-প্রয়াস মাত্র। প্রকাশিত ভূমিকাতে সে-কথাও স্পষ্টতঃই বলা হয়েছে। তাই এখানে উক্ত লক্ষণীয় রীতির ব্যতিক্রম অবশ্যই দেখা যাবে। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের বহুতর ঘটনা বা কার্যাবলী এখানে সংগ্রথিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঐগুলির ধারাবাহিক সুবিন্যাস ও সঠিক পরম্পরাক্রমে সংস্থানের দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, পক্ষান্তরে মনোনিবেশ করা হয়েছে, ঐ-সব ঘটনাবলী বা কার্যাদির মূলে নিহিত যে গূঢ় রহস্য অথবা তাৎপর্য রয়েছে তারই যথাশক্তি পর্যেষণা ও অনুচিন্তনের প্রতি। আমাদের ধারণা, কোনও অতিমানবিক জীবনের স্থূল চরিতবৃত্তের প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাতে সন্নিহিত সূক্ষ্ম লক্ষ্যার্থ বা ইঙ্গিতগুলির দিকেও সমভাবে দৃক্‌পাত করলে, তবেই চরিত-চর্চার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়ে থাকে। আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা মাত্র সেদিকে দৃষ্টি রেখেই।

প্রচেষ্টাতে অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সে-প্রচেষ্টা সাধনের যোগ্যতা সবার থাকে না—বা থাকলেও তার তরতম বিলক্ষণ থাকে। আমরাও এই দুরূহ সাধনে উদ্যোগী হয়েছি একমাত্র স্বাধিকারের বলেই—কোনওরূপ যোগ্যতাসহ নয়। মায়ের সন্তান আমরা সকলেই,—স্বাধিকার আমাদের মাত্র এই-ই। যে-মায়ের সমান স্নেহভাগী সন্তান শরৎ ও আমজেদ উভয়েই—আমাদের পরম ভরসা-বোধ এই যে অকিঞ্চন আমরাও তো তাঁরই। অন্যথায় আমাদের এই দুঃসাহসিক ও স্পর্ধিত প্রয়াস মোটেই ক্ষমার্হ হতে পারে না। মহাসাধক কবি পুষ্পদন্তের অনুকরণে আমরাও পরম আশ্বস্ত: নিজ নিজ বুদ্ধির সামর্থ্য অনুযায়ী স্তব করে জগতে সকলেই যদি অনিন্দনীয় হয়েছে, তাহলে আমাদের অজ্ঞানকৃত এই অতিকথনও নিশ্চয়ই ঘৃণ্য হবে না। "অথাবাচ্যঃ সর্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্ / মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ।" দেবতারা যেখানে বিচরণে ভীত সঙ্কুচিত, মূর্খের দল সেখানে যথেচ্ছ বিহার করে।—প্রাচীন এই আপ্তবাক্য আমাদের লেখনীকে আড়ষ্ট করে তোলে—ভাষাকে স্তব্ধ করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে যখনই স্মরণ করি, আচার্যবরিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের সেই উক্তি: "তাঁর (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর) বিষয়ে একটা কিছু লিখবো মনে করি ; কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে যাই। যাক্, তাঁর ইচ্ছা হয় তো কালে হবে।"—এ কথা তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন (১৮৯৫) গুরুভ্রাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে। অনধিগম্যা মাকে নিয়ে আমাদের এই চপল বালক্রীড়াকে পরমদয়াল স্বামিজী স্নেহচক্ষেই দেখবেন,—ক্ষমায় উপেক্ষা করবেন এবং সাদর প্রশ্রয়ে উপভোগও করবেন এমন-বিশ্বাসও আমরা আন্তরিক পোষণ করি।

বর্তমান দ্বিতীয় ভাগে দেবী সারদা আমাদের মননাসনে গুরু ও মা, এই দুই ভাবে সংস্থাপিতা হয়েছেন,—অর্চিতাও হয়েছেন দুই দৃষ্টিতে, যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে।

শ্রীরামকৃষ্ণেরই জীবোদ্ধারক শক্তি মূর্তিমতী হয়েছেন সারদাকারে—অতএব অধুনাতম মোক্ষার্থী বিশ্বে জ্ঞানদাত্রী গুরুরূপেই তিনি সমধিক প্রকটিতা। লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় জগৎপাবনী সাধনার সারভূতা বিগ্রহ শ্রীসারদা। শ্রীবিদ্যারূপিণী সারদাই শ্রীরামকৃষ্ণের সকল বাক্যের প্রাণময়ী ব্যাখ্যা—বাণীরূপা সর্বশুক্লা সরস্বতী। তাঁর সমুদয় কর্মের মর্ম-মূর্তিও তদ্‌ভাবরঞ্জিতা শ্রীগুরুরূপিণী সারদা।

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্লাবী মাতৃভাবের কায়ারূপ,—তাঁর প্রদত্ত 'মা'-মন্ত্রের

অবয়বী প্রতিমা হচ্ছেন শ্রীশ্রীমা। দেবীকে বা অবতার শক্তিকে 'মা'-রূপে উপাসনা আমরা অনাদিকাল থেকেই করে আসছি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের পূর্বেও এমন মাতৃ-আরাধনা একেবারে বিরল ছিল না,—রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ প্রমুখ মাতৃসাধকগণের ভক্তিতে, হৃদয়ের টানে জগন্মাতা মর্তের মাটিতে অবতরণ না করে পারেন নি,—এমন কি, কন্যাবেশে এসে ভক্ত পিতার ভাঙা বেড়া বেঁধে দিয়ে গেছেন, জননীবেশে এসে আর্ত সন্তানের অভাব মিটিয়ে দিয়েছেন, দুঃখে-তাপে শান্তি ও সান্ত্বনা প্রদান করেছেন। এই মর্তের মাটিতে এমন সব অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেছেন আদ্যাশক্তি জগদম্বা স্বয়ং। আমরাও তাঁর সঙ্গে এমনই ভাবে একটা আত্মীয়তা-বোধ প্রাণে অনুভব করে আসছি সেই কতো যুগ ধরে! তবুও কিন্তু তিনি আমাদের মা হয়েও, কোন্ অমর্ত্যলোকের দেবীই থেকে গিয়েছিলেন এতোকাল,—দেবী মর্ত্যভূমিতে নেমে এসে ঠিক মানুষেরই মতো মানুষ-শরীর পরিগ্রহ করে, মানুষের সঙ্গে বসবাস করেন নি, বিচরণ করেন নি। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনলীলা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা তাঁকে দেখি,—ত্রিদিবের নিত্যধাম ছেড়ে এসে এখানে তিনি এই ধরণীতে অবতীর্ণা সাক্ষাৎ সজীব সচলা রক্তমাংসের শরীরধারিণী—শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাধিতা ভবতারিণীর সঙ্গে অভিন্না, অখিল বিশ্ব-সন্তানের শ্রীশ্রীমা। শ্রীশ্রীমা সারদার জীবনবৃত্তান্তে আমরা পরমাপ্রকৃতি দেবী ভগবতীর উল্লিখিত অবতরণ-ধারারই চরম উৎকর্ষ দেখে বিমোহিত হই। 'ভগবতী দেবী সা নিত্যা' হয়েও আমাদের পরম স্নেহময়ী 'মা' রূপে তিনি 'সম্ভূয় কুরুতে জগতঃ পরিপালনম্'। 'মা' যদি সত্যি সত্যি এমন 'মা'-টি হয়ে আমাদের স্পর্শের মধ্যে না-ই আসতেন, তা'হলে বর্তমান জড়বাদসর্বস্ব যুগে অধ্যাত্মজগতের যে কী অপূরণীয় সর্বনাশ সংঘটিত হত, তা' বাস্তবিকই কল্পনার অতীত।

অধ্যাত্মরাজ্যের পরম প্রাপ্তি হচ্ছে, সর্বতোভাবে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধিকে নিজ ইষ্টে বিলয় করে দিয়ে, একান্তভাবে তদাশ্রয়লাভ এবং তাঁরই মাধুর্যময় চিদ্রস আস্বাদনে মগ্ন হওয়া,—ক্রমে তদাকার বা তন্ময় হয়ে যাওয়া। শ্রীভগবানের মাতৃ-ভাবে এই অভীষ্ট প্রদানের বিশেষ এক জাদুকরী শক্তি রয়েছে। দুর্বল সন্তানের শত দোষকেও মা কদাপি রোষদৃষ্টিতে দেখেন না—মা স্বয়ং ক্ষমারূপা, সন্তানবৎসলা। সখ্য দাস্যাদি ভাবেও ইষ্টে আত্মতা বা আত্মীয়তা বোধের উন্মেষ হয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু মায়ের কোলের সন্তানটির যে মাতৃনির্ভর একান্তই মা-সর্বস্ব জীবন—তার যে মা-ময়তা, তা যেন তুলনাবিহীন—সব ভাবকে ছাপিয়ে চলে যায়। শ্রীশ্রীমা-রূপে

দেবী ভগবতীর এই যে সংসারে 'সবার মা' হয়ে অবতীর্ণ হওয়া—সেটা যেন ইহলোক-সচেতন ভোগলোলুপ আধুনিক মনুষ্যসমাজকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করার জন্যই তাঁর অহেতুকী করুণা। চিরকল্যাণময়ী সর্বানুস্যূতা সর্বভূত-জননী একদিকে যেমন অবতার-সঙ্গিনীরূপে যুগলীলার পূর্তিসাধনে নিরতা, একই কালে অন্যদিকে তেমনই তাঁকে দেখি সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাঁর স্বকীয় ভাবমহিমার সঞ্চারণার দ্বারা সর্বপ্রকার বিভেদ, অসাম্য ও অমঙ্গলকে বিদূরণে পরম তৎপরা। ভারত তথা সমগ্র ভূমণ্ডলই শ্রীশ্রীমায়ের লীলাক্ষেত্র,—সকলদেশের সকল জাতিই মায়ের সন্তান,—এমনকি ইতর জীবও। মানব সভ্যতার এক নব সূর্যোদয় সূচিত হয়েছে এই অভূতপূর্ব মাতৃ-মূর্তির আবির্ভাবে। যুগসঙ্কট সমাধানের এক অত্যাশ্চর্য আদর্শকে মা তাঁর প্রাত্যহিক আটপৌরে জীবনচর্যাতেও প্রকট করে গিয়েছেন। সংসারে শতধা-বিভগ্ন শান্তিকে পুনঃসংস্থাপনে সদা-প্রণোদিতা এই মাকে,—চেতন মাতৃপ্রতিমাকে, নিবিড় আদরে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করাই, আমাদের অকিঞ্চিৎকর বর্তমান প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীমা সারদার চিত্রচতুষ্টয়ঃ (এক) পরমা প্রকৃতি শ্রীভগবতী, (দুই) শান্তিবিধায়িনী, (তিন) মোক্ষদা জ্ঞানদা গুরু এবং (চার) ভীতজনের আশ্রয় ও অভয়দাত্রী মা,—আমাদের অভীপ্সিত চরিতানুধ্যানের এই চারটি দিক, মোটা-মুটিভাবে পর্যবেক্ষিত হল, চারটি খণ্ড-সমন্বিত পুস্তকের দুই ভাগে,—অবশ্য আমাদের দুর্বল দৃষ্টিতে যতোদূর সম্ভবপর হয়েছে। অলোকসামান্য এই জীবন তথা তার দিব্য কার্যাবলীকে আমরা সাধ্যানুরূপ অবলোকনের প্রয়াস করেছি শাস্ত্র প্রমাণের আলোকেই,—তথাপি আমাদের শাস্ত্রজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছতা সে-নিরীক্ষণকে দোষযুক্ত করেছে বহুতরভাবে, এ-কথাও অকপটে স্বীকার্য। তবে একটি মহৎ সত্য প্রসঙ্গক্রমে আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে: শ্রীশ্রীমা সারদার জীবনানুধ্যানে যতোই অগ্রসর হয়েছি, ততোই আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, বিশ্ব-নিয়ন্ত্রী মহামায়া আদ্যাশক্তির ঈদৃশ আবির্ভাব আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাসে ইতঃপূর্বে আর কখনও সংঘটিত হয়নি। শ্রীশ্রীমা—এক ও অদ্বিতীয়া জগদ্বিধাত্রী মা।

পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে, শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকখানি পত্র এবং তাঁর কিছু অমৃত-কথা। প্রকাশিত পত্রমালায় ও কথা-সঞ্চয়নের মধ্যে আমাদের অনুধ্যানীয় মাতৃস্বরূপকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই দীপ্যমান দেখা যাবে। সংযোজিত

এই পরিশিষ্ট তাই মূল গ্রন্থের বোধ-সহায়িকা হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 'শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত-কথা' পরিবেশনের প্রাক্‌কালে যে নাতিদীর্ঘ মুখবন্ধটি সন্নিবেশিত হয়েছে, তাতে কিছু নবতর রসের সন্ধানও পাওয়া সম্ভব হতে পারে। যদিও অদক্ষ অরসজ্ঞ পরিবেশকের বহুবিধ জ্ঞানাভাবও সেখানে পদে পদে পরিব্যক্ত দেখা যাবে। প্রগল্‌ভ বালপ্রচেষ্টা বোধে মাতৃ-মর্মজ্ঞ রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকারা আমাদের সকল বাচালতা ও অবগুণকে স্নেহভরে উপেক্ষা করবেন, সে-ভরসাও রাখছি।

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ-চিন্তনের সামর্থ্য আমাদের নেই,—এ-কথা পুনঃ পুনঃ স্বীকার্য। তথাপি আমাদের এই অর্বাচীন প্রচেষ্টার ফলে. তাঁর অলৌকিক চরিত্রের সামান্য কিছু আভাসও যদি অঙ্কিত হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চিতই মাতৃ-মহিমার দ্যোতক— তাঁরই কৃপার স্মারক। আর এই দুরূহ চরিত-চর্চাতে যতো প্রকার অসম্পূর্ণতা ও অঙ্গহানিত্ব রয়ে গেছে, তা সবই আমাদের বুঝবার ও বলবার দোষেই হয়েছে,— সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা তা অনায়াসেই ধরে নেবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের চরিত-চর্চার দিক অনন্ত। তন্মধ্যে মাত্র চারটি দিকের অনুধ্যান-মালিকা রচিত হয়ে, শ্রীশ্রীমাতৃপদেই অর্পিত হল এখানে। প্রকাশিত চিন্তা-রশ্মিগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-লীলার বহু-বিচিত্র প্রকাশ দেখে পাঠক পাঠিকা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হবেন,—চমৎকৃত হবেন লক্ষ করে যে, অধ্যাত্ম-রাজ্যের উচ্চতম শীর্ষে অবস্থান করেও রক্ত-মাংসের দেহধারিণী এই মা, সমীপাগত জনের বাস্তবজীবন ও তার কঠিন বিপদসঙ্কুল সমস্যাবলী সম্পর্কেও কীরূপ সজাগ তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন! আরও স্তব্ধ হবেন এই দেখে, শরণার্থী ব্যক্তির জীবনের জ্বালাকে জুড়িয়ে দিতে, যন্ত্রণাকে মুছে দিতে মাতৃ-হৃদয়ের কী উদ্বেল ব্যাকুলতা—কতো তাঁর উন্নিদ্র প্রতীক্ষা! দেবী-কল্যাণী-জ্ঞানময়ী-জ্ঞানদাত্রী-স্নেহপাথার মাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম।

প্রসীদ দেবি সারদে জগতাম্বিকে শুভে।
আর্তিহন্ত্রী প্রপন্নানাং ত্বং প্রসীদ পরমেশ্বরী ॥

ইতি এষা সভক্তি বাঙ্‌ময়ী পূজা অর্পিতা শ্রীসারদা-চরণাব্জয়োঃ ॥

বিনত

অব্জজানন্দ

॥ তিন ॥

‘ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ’



॥ তিন ॥

' ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ '

জয়রামবাটী। একদিন বেলা দুপুর গড়িয়ে এসেছে। শ্রীসারদা দেবী ঘর-বার করছেন—অতিশয় চঞ্চলতা চোখের দৃষ্টিতে—বারে বারেই এসে এসে দেখছেন, যেন কারও আগমন-প্রত্যাশায় অধীর। পায়ে তখন বাতের ব্যথা বাড়ায়, চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল বুঝাই যাচ্ছিল। কিন্তু হায়, তবুও প্রতীক্ষা-ব্যাকুল অস্থির চরণের বিরাম নেই।

নিকটবর্তী সন্তান একজন—স্বামী গৌরীশানন্দ (নেপাল মহারাজ) শুনতে পেলেন মায়ের আক্ষেপ-উক্তি—ঘরের মধ্যে গিয়ে ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলছেন, "আজও দিনটা বৃথাই গেল! একজনও তো এল না! তুমি না বলেছিলে, 'তোমাকে নিত্যই কিছু না কিছু করতে হবে'?" সন্তানের দৃষ্টিও তৎক্ষণাৎ গৃহাভ্যন্তরে আকৃষ্ট হয়। দেখলেন—মা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে, অভিমানভরে করজোড়ে নিবেদন করছেনঃ "কই ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাবে?"

গৌরীশানন্দজীর স্মৃতি থেকে জানা যায়, পরের দিন সহসা তিনজন ভক্ত এসে মাতৃসমীপে কৃপাপ্রার্থী হলে মায়ের মুখে হাসি ফুটেছিল।

এমন তো মাত্র একদিনই নয়। কতোদিনই এমন কেটেছে মায়ের। সারাদিনের মধ্যে কেউ বাঞ্ছিত প্রার্থী না এলে, মাকে বিলাপ করতে শোনা যেতঃ "ভক্তেরা কেউ এল না।"

* * *

অপর একটি দৃশ্য। সেটিও জয়রামবাটীতে। সেবক জ্ঞানানন্দকে সেই ভোর হতে না হতেই, শ্রীশ্রীমা শুধুই শোনাচ্ছেন—"আজ একটি ছেলে আসছে।" কোথায় কোন্ ছেলে? সকাল ফুরিয়ে বেলা বেড়েই চলেছে। মা যথারীতি স্নানাদি সেরে পূজায় বসেছেন,—পূজাও তো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য এই—মা পূজা সাঙ্গ করেও, আসন ত্যাগ করছেন না—যেন কিসের অপেক্ষায় তখনও অবধি আসনেই বসে রয়েছেন—ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ ঠাকুরের প্রতিকৃতির দিকে।

ওদিকে বহির্বাটিতে আগন্তুক কে একজন প্রতীক্ষারত,—প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে তিনি কাউকেই কাছেপিঠে দেখতে না পেয়ে, সাহসে ভর করেই বাড়ির ভিতরের দিকে পা বাড়ালেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাত ব্যক্তি,—কোনরকম খবরাখবর না দিয়ে, কাউকে চিঠিপত্রাদি না লিখেই চলে এসেছেন জয়রামবাটীতে। তাই ভয়, সঙ্কোচ ও দ্বিধা ছিল তাঁর চোখের চাহনিতে ও পদক্ষেপে। সাড়া পাওয়া গেল অবশেষে। জ্ঞানানন্দের প্রশ্ন: "কে?" সরল উত্তর: "আমি।"

জ্ঞানানন্দকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই, সপ্রতিভ নির্দেশ পেলেন আগন্তুক: "যাও যাও, শীগ্‌গির স্নান করে এস। মা সকাল থেকে বলছিলেন, আজ একটি ছেলে আসছে। মা পূজা শেষ করে আসনে বসে আছেন।"

উল্লেখ বাহুল্য, আগন্তুক যথা আদেশ তক্ষুণি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে উঠেই, কাপড় ছেড়ে মায়ের কাছে চলে যান সটান। মা-ও তাঁকে কৃপা করে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন।

আগন্তুক ব্যক্তির পরিচয় পরে জানা গিয়েছিল—তাঁর নাম রমণীমোহন চৌধুরী—নিবাস ঢাকা। কাউকে কিছু না জানিয়ে—কারও দ্বারা চালিত বা প্রেরিত না হয়েই একাকী চলে এসেছিলেন জয়রামবাটীতে। অন্তরে একটিই সুপ্ত ইচ্ছা ছিল—মাত্র মাকে দর্শন। কিন্তু সে-দর্শন যে এমন দিব্যদর্শন হবে, তা' তাঁর স্বপ্নেরও অতীত ছিল।

* * *

উল্লিখিত দু'টি চিত্রই শ্রীসারদা দেবীর জীবনে সুবিদিত এবং অনুরূপ আরও চিত্রমালা তাঁর জীবনচরিতে কিছু বিরল নয়। ভক্তদের জন্য তাঁর আকুল প্রতীক্ষা—অধীর অপেক্ষাই ঘটনাচিত্র দু'খানির উপজীব্য। শুধু মাত্র দু'চারবারই নয়, ভক্ত সন্তানদের জন্য মায়ের এমন ব্যাকুলতার ছবি কতোবারই আমাদের দৃষ্টিপথে এসে যায়। স্মরণ করায় শ্রীম-অঙ্কিত সেই হৃদয়স্পর্শী চিত্র—যেখানে বরাহনগর মঠে একান্তে বসে শ্রীনরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণার বর্ণনা দিচ্ছেন। "নরেন্দ্র ও মাষ্টার দুইজনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া অবধি অনেক পূর্বকথা মাষ্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্দ্রের এখন বয়স ২৪ বৎসর ২ মাস হইবে।...

"নরেন্দ্র—'তিনি বললেন, ওরে আমি কুঠীর উপর চেঁচিয়ে বলতাম, ওরে কোথায় কে ভক্ত আছিস্ আয়,—তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা বলেছিলেন, ভক্তেরা সব আসবে,—তা দেখ্, সব তো মিলছে।"

'আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম।'"

—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/পরিশিষ্ট/১ পৃঃ ২৬৭-৬৮)

'ভক্তেরা সব আসবে'।—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতীক্ষাই স্পষ্টতর প্রকটরূপ ধারণ করেছে শ্রীসারদা দেবীতে।—'তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়'—সেই প্রাণান্তক বেদনাই তো পুনঃব্যক্ত হয়েছে : 'কই ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাবে?' আর ঐ যে সেই ডাক, দক্ষিণেশ্বরের কুঠীবাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাক—'ওরে কোথায় কে ভক্ত আছিস্ আয়'—তারই অনুরণন এই জয়রামবাটীর কুটিরে—সকাল থেকেই প্রত্যাশা : 'আজ একটি ছেলে আসছে'। আর সেই উন্মুখতা নিয়েই তো অমন আসন পেতে বসে থাকা—পথ চেয়ে থাকা।

* * *

"এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায় ;
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়?"

—এ গান গাইতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গাইতে গাইতে শ্রীমা সারদা দেবীকে সজাগ করে দিতেন, "শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায়।"

আরও একদিনের কথা মনে পড়ে যায়। কাশীপুরে একদিন ঠাকুর শ্রীমার মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে কী দেখছিলেন। মা তাতে বলেছিলেন—"কিছু বলবে? বলই না।" ঠাকুর অনুযোগমাখানো কথায় উত্তর দিয়েছিলেন : "হাঁ গা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে) এ-ই সব করবে?" মা সারদা অসহায়ভাবে জবাবে বলেছিলেন—"আমি মেয়েমানুষ। আমি কী করতে পারি?" শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন : "না, না,—তোমায় অনেক কিছু করতে হবে।"

ততোধিক করুণ দৃশ্য : সেই কাশীপুর উদ্যানভবনেই। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে সারদা দেবীর পা মচকে যাওয়াতে, বাধ্য হয়েই ঠাকুরের সেবা থেকে বিরত হয়ে তিন দিন বিশ্রাম নিতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু শ্রীপ্রভুর সেবা ছেড়ে থাকাও তাঁর পক্ষে দুর্বিষহ। অগত্যা থাকতে না পেরে, ঠাকুরের পথ্য সহ উপরে উঠে যান আবার সিঁড়ি বেয়েই। কিন্তু গিয়ে দেখেন ঠাকুর চোখ বুজে শয্যায় শায়িত। মা ডাকলেন—"এখন খাবে যে, ওঠো।" ঠাকুর মায়ের দিকে ফিরে তাকালেন, যেন দূরদেশাগত—মাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন; "ছাখো কলকাতার লোকগুলো যেন অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে। তুমি তাদের দেখো।" মা তাতে সঙ্কুচিতা হয়ে জবাব দিয়েছিলেন—"আমি মেয়েমানুষ! তা কেমন করে হবে?"

ঠাকুর তখন নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে জোর দিয়ে বলেন—"এ আর কি করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে।" মা তথাপি ঠাকুরকে খাওয়াবার জন্মই যেন একটু আপত্তির সুরে জানিয়েছিলেন: "সে যখন হবে, তখন হবে। তুমি এখন খাও তো!" যা' হোক, ঠাকুর তখন উঠে আহার গ্রহণ করেছিলেন।

'অন্ধকারে কিলবিল করছে' যারা, তাদের দেখার ভার স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই সমর্পণ করে গেছেন সারদা দেবীকে। 'কলকাতার লোকগুলো' কথাটি নিতান্তই উপলক্ষণ—সমগ্র নরলোকই উপলক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তিতে। বলা বাহুল্য—'কলকাতা' তাই নেহাতই একটি প্রতীকী পদ এখানে। 'অন্ধকারে কিলবিল' করার দ্যোতনা হচ্ছে অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকা। 'তুমি তাদের দেখো'—এই নির্দেশে, অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবকে অবাধে জ্ঞানালোক বিতরণের অনুজ্ঞাই ঠাকুর দিয়েছেন মাকে। অর্থাৎ তিনি শ্রীসারদার জ্ঞানদা গুরুমূর্তিখানিকেই প্রতিষ্ঠার ভবিষ্য-সূচনা করে দিলেন উপরোক্ত ঘটনায়।

শ্রীসারদা দেবীর ভাবী লোকপাবন মোক্ষদা-মূর্তি বা গুরুভাব সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস আমরা অন্যত্র আরও পেয়েছি। যেমন একদিন শ্রীযুক্তা গোলাপ-মাকে তিনি বলেছিলেন, "ও সারদা—সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয়, তাই এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" জানা যায় ঠাকুর ভাগিনেয় হৃদয়কেও এমন কথা বলেছেন, "ওরে, ওর নাম সারদা—ও সরস্বতী।"

* * *

"সারদা—সরস্বতী; জ্ঞান দিতে এসেছে।" দেবী সারদার এই-ই হচ্ছে স্বরূপ,—তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্য। অন্ধকারে যারা অহর্নিশ কিলবিল করছে—তাদের 'দেখাই' তো তাঁর কাজ। তাঁর এই জ্ঞানদায়িনী স্বরূপটি কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে গোচর না হয়ে,—তাঁর মা-রূপটিই মাত্র উদ্‌ভাসিত সকল নয়নে। তবুও এটাই সত্য যে, শ্রীসারদা-চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলিকে আমাদের অনুধ্যানের সুবিধার জন্য বিভক্ত রূপে অঙ্কনের চেষ্টা করলেও, সেগুলি কিন্তু একই অখণ্ড মহাশক্তির বিচিত্র প্রকাশ। সেই অখণ্ড শক্তির বিশ্লেষণ আমাদের অসাধ্য। আমাদের খণ্ড দৃষ্টিতে তাই তাঁকে কখনও দেখি দেবী—কখনও শান্তি-বিধাত্রী শান্তিস্বরূপা—কখনও ভাবি তাঁকে মোক্ষদায়িনী জ্ঞানদা গুরুমূর্তিতে—আবার সকল কিছুকে ছাপিয়ে তিনি আমাদের হৃদয়ে বিরাজিতা শুধুমাত্র করুণাপাথার মা রূপে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশই

আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, দেবী, শান্তিদায়িনী, গুরু ও জননী এই চতুর্বিধ রূপই শ্রীশ্রীসারদায় নির্ভিন্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে সন্নিবিষ্ট। আপাততঃ এখানে তাঁর অমোঘ জ্ঞানদায়িনী মোক্ষদাত্রী গুরুরূপের প্রতিই আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হব। দেখব আমাদের এই প্রয়াসের পথেও বারে বারেই স্নেহময়ী মা-ই এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন—কিংবা কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্তে তিনি অনুভূত হবেন, স্বমহিমায় ভাস্বর ভগবতীরূপে—অথবা কখনও পাব তাঁকে যেন ব্যথার ব্যথী মূর্তিমতী শান্তি। পরম্পরাপেক্ষ শ্রীসারদার এই চতুর্ধা ভাবের মধ্যে কোন্‌টির সূচনা কোথায়, কোথায় কোন্‌টির বিলয়, তা' আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়,—জানার প্রয়োজনও কিছু নেই। আমাদের উদ্দেশ্য সারদানুচিন্তন—শ্রীশ্রীমায়ের অনুধ্যান। সেই উদ্দেশ্য-পথে চলতে বিশ্লেষণের আলোক-সহায়তা আমাদের নিতেই হবে,—যদিও জানি শেষে গিয়ে সবই একাকার একরূপ।

'অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে' মানুষ। জীবদুঃখাসহিষ্ণু শ্রীরামকৃষ্ণ তাদেরই জন্য নিযুক্ত করে গিয়েছেন শ্রীসারদাদেবীকে,—বলেছিলেন, 'তুমি তাদের দেখো'। বাস্তবিকপক্ষে এ-কথার দ্বারা তিনি মা-সারদাকে লোক-গুরুর আসনেই সংস্থাপনা করেছিলেন।

* * *

বিশ্বসারতন্ত্রোক্ত শ্রীশ্রীগুরুগীতাতে আছে ঋষিদের দ্বারা পৃষ্ট হয়ে মহর্ষি সূত শ্রীগুরুতত্ত্ব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলছেন ঃ

"গু-শব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাৎ রু শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুঃ ইতি অভিধীয়তে॥"

'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার, 'রু' শব্দে বুঝায় সেই অন্ধকারের নিরোধক। অন্ধকারকে নিরোধ করেন যিনি, তিনিই হচ্ছেন গুরু।

অন্ধকার থেকে যিনি আলোকে নিয়ে যান—কিংবা যিনি অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে থাকেন তেজ বা জ্যোতিঃ-সাহায্যে, তিনিই গুরু। অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন বলেই তাঁর এই গুরু-খ্যাতি। প্রশ্ন উঠবে, অজ্ঞান কি? উত্তরও অতি সহজ—আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান না থাকাই অজ্ঞান। জীব স্বরূপতঃ শিব—জীবের সত্যকার স্বরূপ হচ্ছে বৃহৎ—ব্রহ্ম। সে লঘু নয় কোনও কালেই। কিন্তু অনাদি অজ্ঞানবশতঃ জীব আপনার সর্বব্যাপক বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপকে যেন হারিয়ে ফেলেছে—এবং অজ্ঞানান্ধকারেই আপনার হারানো বৃহত্তম সত্তাকে খুঁজে মরছে—অনুসন্ধান করে চলেছে। নিজেকে তাই সে খুবই ক্ষুদ্র ও লঘু ভেবে ভেবে, কেবলই সে সর্ব-ব্যাপারে

বেড়ে উঠতে চায়,—বড় হবার জন্যই তার দুর্নিবার প্রবৃত্তি। এই কারণে, এ-কথাও বলা চলে যে, যিনি জীবের ঐ লঘুত্বকে ঘুচিয়ে তাকে পুনরায় 'বড়' হতে সাহায্য করেন,— তাকে গুরুত্বে বা ব্রহ্মপদে উন্নীত করেন—তিনিই প্রকৃত অর্থে গুরু।

জীব নিজে জানে না, কি উপায়ে প্রকৃত বড় হওয়া যায়,—তাই তার গুরুর প্রয়োজন। মানুষ নিজের ছোট পরিচয়কে, ক্ষুদ্র 'আমি'-কে বা অহঙ্কারকে গৌরব দান করতেই সদা ব্যস্ত,—ফলে আপন বৃহৎ সত্তার অবমাননাই সে করে থাকে পদে পদে—স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপটিকে কালক্রমে সে সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয় হারিয়ে ফেলে নিজ পরিচিতিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন—"পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" ছোট 'আমি'-কে নিয়েই জীবের সংসার-যাতনা -শোক-তাপ-দুঃখভোগ। কিন্তু তার বড় 'আমি' বা আত্মা-বস্তুটি নিত্য জন্মমৃত্যুহীন, দুঃখবিরহিত, নির্বিকার, সর্বব্যাপক, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব অদ্বয় আনন্দই কেবল। কিন্তু এমন নিত্যমুক্ত আনন্দ-স্বভাব মানুষও যখন আপন স্বরূপ বা পরিচিতি ভুলে যায়, তখন সে খণ্ড দেহ মন বুদ্ধি প্রভৃতিতে অভিমানবশে যেন বদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নানা অনাত্মবস্তুতে জড়িয়ে থেকে তাদের ক্ষয়বৃদ্ধিতে আপনার ক্ষয়বৃদ্ধি মনে করে বিচিত্র দুঃখের জালে আটকা পড়ে এবং হা-হুতাশ করে মরে। এমনই দুস্তর অজ্ঞান-অন্ধকারের প্রভাব! এই অজ্ঞান অনাদি, কিন্তু আত্মস্বরূপের জ্ঞান দ্বারা এর অন্ত বা নাশ হয়ে থাকে। গুরু শিষ্যকে ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান অর্থাৎ, 'জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই'—এই জ্ঞানালোক প্রদানের দ্বারা তার অজ্ঞান-অন্ধকারকে বিনষ্ট করেন। শ্রীশ্রীগুরুগীতা-মুখে মহর্ষি সূতও সেই গুরুর মহিমাকে পুনঃ পুনঃ জানিয়েছেন আমাদের। যেমন—

"গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুকারস্তেজঃ উচ্যতে
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥"

গুরু-শব্দের 'গু'-অংশটি অজ্ঞান-অন্ধকারের বাচক, আর 'রু' অংশটি হচ্ছে তার ধ্বংসক তেজ। গুরুই তবে হলেন অজ্ঞাননাশক চৈতন্য—ব্রহ্ম, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

"গুকারঃ প্রথমো বর্ণো মায়াদি-গুণভাসকঃ।
রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়া-ভ্রান্তিবিমোচকঃ ॥"

গুরু-শব্দের প্রথম বর্ণ 'গু' বুঝায় মায়াকে ও তার বহু-বিচিত্র গুণরাশিকে,—এবং দ্বিতীয় বর্ণ 'রু' হচ্ছে মায়ারূপ ভ্রান্তির বিমোচক ব্রহ্মেরই দ্যোতক। লক্ষণীয় যে গুরুকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মই বলা হয়েছে শাস্ত্র-পুরাণাদিতে। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবও সনাতন গোস্বামীকে বলেছিলেন ঃ

কৃষ্ণ সূর্যসম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২২)

ভাবটি হচ্ছে এই,—এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমপাবনী গুরুশক্তিরূপে তত্ত্ববিদ্ কোনও ব্যক্তির শরীর মনকে আশ্রয় করে মুমুক্ষু জীবের কল্যাণার্থ প্রকটিত হয়ে থাকেন—এবং গুরু নামে অভিহিত হন্। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাই বলতেন: সচ্চিদানন্দই গুরু।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠাকুরকে—"মহাশয়! ব্রাহ্মসমাজে যে উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?" শুনে ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন:

"মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই গতি নাই। যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন করে?"

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/৪/৫)

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও পেয়ে থাকি, সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু ভক্তি-তত্ত্বোপদেশ প্রসঙ্গে বলছেন:

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে॥"

(—চরিতামৃত, মধ্য / ২২)

শুদ্ধ-চরিত্র কোনও ব্যক্তি-দেহকে আশ্রয় করেও সেই সচ্চিদানন্দ অন্তর্যামী ঈশ্বরই গুরুরূপে কাউকে সাহায্য করতে পারেন করেনও বটে। এই ভাবে মানুষ-গুরুই সাক্ষাৎভাবে শিষ্যকে জ্ঞানালোক প্রদানের নিমিত্ত হলেও, জানতে হবে ঐ মনুষ্য মূর্তির বেশে স্বয়ং ব্রহ্মই শিষ্যকে কৃপা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই স্পষ্টই বলেছেন বার বার—গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়…। এমনকি, এ-কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি,—'যদি মানুষ গুরুরূপে চৈতন্য করে তো জানবে যে, সচ্চিদানন্দই ঐ-রূপ ধারণ করেছেন। সমীপাগত ভক্তদের উদ্দেশে তাঁর কথামৃত:

"... গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে তবে হয়। তাই বৈষ্ণবেরা বলে, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব।"

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫/৬/৩)

কথামৃত-পাঠকের জানা আছে যে, শ্রীভগবান নিজে বারে বারেই আশ্বাস দিয়ে আসছেন—যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধন-ভজনের প্রয়োজন মনে করে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি (ঈশ্বর) তার সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা করবার দরকার নাই।

স্বামী বিবেকানন্দও এ-কথাই বলেছেন: "...প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয় তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে—আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্মলাভের আগ্রহ প্রবল হয়, তখনই ধর্মশক্তিসঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন। যখন গ্রহীতার ধর্মালোক আকর্ষণ করিবার শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট আলোকশক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।"

(—স্বামীজীর বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২৭)

উল্লেখ বাহুল্য, উক্ত 'আকৃষ্ট আলোকশক্তি' কোনও মানুষ গুরুকে অবলম্বন করেই এসে থাকেন। কথাটা মোটামুটি পরিষ্কার এই যে, গুরু কোনও ব্যক্তি হলেও, তাঁর শক্তি সেই পরমেশ্বরেরই;—অথবা, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই ঐ বিশেষ ব্যক্তিতে ভর করে মুমুক্ষু জীবকে আলোক বিকিরণের উদ্দেশ্যে প্রকট হয়ে থাকেন। বিধাতার ব্যবস্থাটাই এ-রকম। জগদ্‌গুরু বিবেকানন্দ এই গুরু শিষ্য প্রসঙ্গটি অতি সহজ কিন্তু বলিষ্ঠ প্রত্যয়ান্বিত ভাষায় বুঝিয়েছেন আমাদের। তিনি বলেছেন—

"...এই সঞ্জীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে এই শক্তি লাভ করিতে পারে, আর কিছু হইতেই নয়।... আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে গ্রন্থরাশি পর্যাপ্ত নয়। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক।

"যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে, এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'শিষ্য' বলে।"

(—স্বামীজীর বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২৩)

* * *

শ্রীভগবানই গুরু। তাঁর পরম পাবনী গুরুশক্তির বিচিত্র লীলা মানুষের বিচার-বুদ্ধির অগম্য। এক ভূমা পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় বিবিধ বিচিত্র বহু ধরণের

জীব সেজে, ততোধিক বৈচিত্র্যময় শরীর-মন প্রভৃতি উপাধি স্বীকার করে সংসারে বিচরণ করছেন—পাপ-পুণ্যাদি কর্মে জড়িয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বৃহতের ক্ষুদ্র হওয়া, —ক্ষুদ্রত্বের বিড়ম্বনায় অতিষ্ঠ হয়ে ত্রাহি ত্রাহি করা! বেশ মজার কাণ্ডই বটে! আবার সেই তিনিই গুরুরূপে শিষ্যে শক্তি-সঞ্চারণাপূর্বক—অজ্ঞানের অন্ধকার ঘুচিয়ে, মিথ্যা ভব-বন্ধন খণ্ডন করে দিয়ে তাকে আবার স্ব-স্বরূপে ফিরিয়ে আনছেন। এ-লীলার রহস্য ভেদ করবে কে?

ব্রহ্ম নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয়, ইচ্ছা-দ্বেষহীন। কিন্তু তাঁর গুরুশক্তি—সগুণ, সক্রিয় এবং করুণায় বিগ্রহবান্। এ শক্তি তাঁরই বিভূতি। ঈশ শক্তিই গুরুশক্তি। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই অশেষ কল্যাণনিধান জীবদুঃখাসহিষ্ণু অবতার-রূপে নরের মাঝে নরোত্তম হয়ে অবতীর্ণ হন। জীবদুঃখে তিনি এতোই কাতর হন যে, তাদের দুঃখকষ্টকে নিজের শরীরে মনে আকর্ষণ করে নিয়ে, অবিকল একজন ব্যক্তির মতোই সব যাতনাকে ভোগ করতে থাকেন—জীবকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্য করুণায় বিগলিত, প্রেমে উন্মদ হয়ে ওঠেন। অনন্ত গুরু-শক্তির সান্ত ব্যক্তিত্ব-স্বীকার কেবল এই উদ্দেশ্যেই। ব্যক্তি-শরীরের মৃত্যু আছে, অন্তর্ধান ঘটে,—কিন্তু গুরুশক্তি অমর অব্যয়, তার মৃত্যু নেই, তিরোধান নেই।

শ্রীভগবান স্বয়ং বলেছেন—"আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ…।" জ্ঞানী-ভক্ত উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হবার প্রাক্কালে এই কথাই জানিয়ে গিয়েছিলেন:

"আচার্যং মাং বিজানীয়াৎ ন অবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

(—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭।২৭)

আচার্যকে জানবে আমিই। কখনও তাঁকে অবজ্ঞা দেখাবে না। মানুষবুদ্ধিতে তাঁর উপর কখনও দোষদৃষ্টি আনবে না। গুরু হচ্ছেন সর্বদেবময়।

ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে মহর্ষি পতঞ্জলি সহজ কথায় ব্যক্ত করেছেন—ঈশ্বর হচ্ছেন পূর্ব পূর্ব সকলেরই গুরু, যে হেতু তিনি কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নন্। "স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদাৎ॥" (—পাতঞ্জল দর্শন ১।২৬)

গুরু-শিষ্যধারার আদি উৎস সেখানেই—সেই ঈশ্বরেই।

অবতীর্ণ ঈশ্বর বা অবতারকেও আমরা লোকগুরুরূপেই সমধিক পেয়ে থাকি। জীবকে অনুগ্রহ করার জন্যই দুর্বার ব্যাকুলতা—'ভূতানুজিঘৃক্ষা' নিয়ে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে এসে রূপধারী হন—তাঁর ঈশ্বরত্বকে এতোটুকুও না ছেড়েই আসেন। স্বামিজী তাই অবতারগণ সম্পর্কে বলেছেন—"তাঁহারা গুরুরও গুরু—স্বয়ং ঈশ্বর

মানবরূপে অবতীর্ণ।...তাঁহাদের শক্তিতে হীনতম অধম ব্যক্তিগণও মুহূর্তের মধ্যে সাধুতে পরিণত হয়।...ইহারা গুরুরও গুরু—মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।"

(—স্বামিজীর বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ১২৪)

আচার্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে লিখেছেন,—পরমেশ্বর জীবের দুর্বলতাকে, তাদের দুঃখরাশিকে বুঝেন,—তিনি ব্যথিত হয়ে তাদের অনুগ্রহ করার জন্যই আপন ইচ্ছাতেই মানুষরূপ ধারণ করে প্রকট হয়ে থাকেন। "স্যাৎ পরমেশ্বরস্য অপি ইচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।"

(—শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২০)

আমরা দেখলাম, মাত্র বিশ্বাস-ভক্তির রাজ্যেই নয়, জ্ঞান-বিচার-যুক্তির ক্ষেত্রেও গুরু সমান মহিমাতেই পূজিত,—এক কথায় অধ্যাত্ম জগতের সর্বস্তরেই গুরুর আসন সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। বেদ-শাস্ত্র পুরাণাদিতে একই সত্য পুনঃ পুনঃ কথিত হয়েছে—গুরু এক সচ্চিদানন্দ; মানুষ-গুরুর মধ্যেও তাঁরই শক্তি। আরও অধিক চমকপ্রদ সংবাদ উদ্‌ঘোষিত: অবতার নররূপী ঈশ্বর,—গুরুশক্তির পূর্ণ-আধার তিনি; গুরুভাবের আত্যন্তিক প্রকাশ তাঁর মধ্যে যেন অনুক্ষণই উপচে পড়ে!

অবতার মনুষ্য-শরীরধারী হলেও তাঁতে অসীম অনন্ত বৃহত্তেরই দ্যোতনা থাকে—ক্ষুদ্র, সসীম কোনও কিছুই তাঁতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই সাধারণ মানুষে সুলভ 'ছোট আমি' বা কাঁচা আমিত্বটি সেখানে নিঃশেষেই অবলুপ্ত দেখা যায়। অবতারের 'আমি' হচ্ছে 'বিশ্বব্যাপী আমি'। লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দের ভাষায়—"..ঠাকুর 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগদম্বার শক্তিপ্রকাশের মহান যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন।...ঠাকুরের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার লোকগুরু, জগদ্গুরু ভাবটির এইরূপ অপূর্ব বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের গুরুভাব পূর্বার্ধ খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫) লীলাভাষ্যকার সারদানন্দজী লিখেছেন:

"'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বর:'—ইত্যাদি স্তুতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত মন্ত্রদীক্ষাদাতা 'গুরুর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি। কে-ই বা তখন বুঝে যে, কোন কোন মানবশরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও, গুরুভাবটি মানবীয় ভাবরাজ্যের অন্তর্গত নহে।—কে-ই বা তখন জানে যে, শরীররক্ষার উপযোগী জলবায়ু, আহার প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় বস্তু সমস্তের ন্যায়, মায়াপাশে বদ্ধ ত্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জ্বালা নিবারণ ও শান্তি লাভের উপায়স্বরূপ হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ংই ঐ ভাব ও শক্তিরূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ,

অহমিকাশূন্য মানবমনের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছেন? এবং কে-ই বা তখন ধারণা করে যে, যাহার মন যতটা পরিমাণে অহঙ্কার ত্যাগ বা 'কাঁচা আমি'-টাকে ছাড়িতে পারে ততটা পরিমাণেই সে ঐ ভাব ও শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়! সাধারণ মানবমনে ঐ দিব্যভাবের যৎসামান্য 'ছিটে ফোঁটা' মাত্র প্রকাশ, তাই আমরা ততটা ধরিতে ছুঁইতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, শঙ্কর যীশু প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব যুগাবতার সকলে এবং বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ দিব্যশক্তির ঐরূপ অপূর্ব লীলা যখন বহুভাগ্যফলে কাহারও নয়নপথে পতিত হয়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া থাকে যে, এ শক্তিপ্রকাশ মানবের নহে—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের। তখনই ভবরোগগ্রস্ত পথভ্রান্ত জিজ্ঞাসু মানবের মোহ মলিনতা দূরে অপসারিত হয় এবং সে বলিয়া উঠে—'হে গুরু তুমি কখনই মানুষ নও—তুমি তিনি!'

"অতএব বুঝা যাইতেছে, শ্রীশ্রীজগদম্বা যে ভাবরূপে মানবমনের সকল প্রকার অন্ধকার মলিনতা দূর করেন, সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুরুশক্তি।"

* * *

'মানবমনের সকল প্রকার অন্ধকার মলিনতা দূর করেন' তাই প্রকৃত অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিমান গুরুশক্তি 'শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ' অভিধায় জগদ্‌বন্দিত। আমরা জানি শ্রীসারদা দেবী হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি। তিনি স্বয়ং ই এ-কথা বহুবার ঘোষণা করে জানিয়েছেনঃ "ও আমার শক্তি।" দেবী সারদার স্বমুখের স্বীকৃতিও এখানে স্মরণীয়ঃ "বার বার আসা—এর কি শেষ নেই? যেখানে শিব, সেখানেই শক্তি—শিব শক্তি একত্তরে, বার বার সেই শিব, সেই শক্তি। নিস্তার নেই। তবু তো লোকে বোঝে না…!" ('প্রকৃতিং পরমাং', প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১৩১ দ্রষ্টব্য)

তন্ত্রে আছে শিব-পার্বতীর সংলাপ। যেন ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা বার্তা! শিব শ্রীপার্বতী দেবীকে সম্বোধন করে জানাচ্ছেন—হে তারিণী, তোমাকে ব্রহ্মময়ী পরা-গীতা শোনাচ্ছি, অবধারণ কর। তুমিই সর্বশাস্ত্রের জ্ঞানদাত্রী গুরু, আমি হচ্ছি প্রকাশক মাত্র। গুরুরূপে তুমিই জীবের ত্রাণকারিণী—গয়া গঙ্গা কাশী প্রভৃতি মোক্ষদায়িনী সবই তো তোমারই রূপ।

"…শৃণু তারিণী বক্ষ্যামি গীতাং ব্রহ্মময়ীং পরাং। গুরুস্ত্বং সর্বশাস্ত্রাণামহমেব প্রকাশকঃ॥ ত্বমেব গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী। গয়া গঙ্গা কাশিকা চ ত্বমেব সকলং জগৎ॥…
(—কঙ্কালমালিনীতন্ত্র)

সারদা—জ্ঞানদা মোক্ষদা। তিনি জ্ঞানময়ী এবং জ্ঞানদাত্রী। ঠাকুর তাঁর পরিচয় জ্ঞাপিত করেছেন: "ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।" তাঁর এই করুণা-বিগলিত গুরুমূর্তি দর্শন করেই জ্ঞানতাপস অভেদানন্দ তাঁকে স্তুতি করেছেন: "লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।" তাঁর জ্ঞানদায়িনী আচার্যরূপকে স্মরণ করেই অভেদানন্দজী প্রণতি নিবেদন করেছেন:

"তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্ ॥"

মনে পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণেরও গুরুরূপ দর্শন করে শ্রীম-(মাষ্টার মশায়) বিস্ময়ানন্দে লিখেছিলেন:

"যাঁহার জীবন বেদময় - যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য বেদান্তবাক্য—যাঁহার শ্রীমুখ দিয়া শ্রীভগবান কথা কন—যাঁহার কথামৃত লইয়া বেদ, বেদান্ত, শ্রীভাগবত গ্রন্থাকার ধারণ করে, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু পুরুষ গুরুরূপ ধারণ করিয়া কথা কহিতেছেন।"

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।৭।৩)

গুরুভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণকে মাত্র দ্বিতীয়বার দর্শনান্তেই শ্রীমহেন্দ্রনাথ—শ্রীম'র হৃদয়-তারে বুঝি স্বতঃই তাই এই প্রণাম-মন্ত্রটি ঝঙ্কৃত হয়েছিল:

"সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারস্বরূপকঃ।
নমোঽস্তু রামকৃষ্ণায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।২।৫)

লোকগুরুরূপে অবতীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণের অভিন্ন শক্তি শ্রীসারদা দেবীও আবির্ভূতা জ্ঞানদাত্রী ও বিদ্যাদায়িনী মূর্তিতে। ঐ যে সেই "না, না তোমায় অনেক কিছু করতে হবে"—ইত্যাদি ভারার্পণসূচক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়েছিলেন সারদাদেবীকে—তারও নিহিতার্থের সন্ধান এখানেই মিলবে। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন যে গুরুভার অর্পণ করেছিলেন,—মা সারদাও সাগ্রহে ও সাদরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাকে, তাতে আর সংশয়ের কোনও লেশই নেই। তাঁর উত্তর-জীবনই আমাদের এ-কথার উজ্জ্বল সাক্ষ্যস্বরূপ। শ্রীমা পরে এক সময়ে নিজমুখেই বলেছেন—"যখন ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল, আমিও যাই। তিনি দেখা দিয়ে বললেন, 'না তুমি থাক; অনেক কাজ বাকী আছে'। শেষে দেখলুম, তাই তো, অনেক কাজ বাকী আছে।"

(—স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'শ্রীমা সারদা দেবী'—পৃষ্ঠা ১৫৭)

শ্রীমা সারদা দেবীকে এখন আমরা দেখতে চেষ্টা করব, তাঁর অনন্ত অনবদ্য লোকপাবনী গুরুমূর্তিতে,—জ্ঞানদায়িনী ভব-সন্তাপহারিণী মোক্ষদাত্রীরূপে।

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥'

* * *

"তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া' দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে, বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়।—সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে—চণ্ডীতে মধুকৈটভ বধের সময়ে ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন।(শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে, অবিদ্যা মুগ্ধ করে। অবিদ্যা—যা থেকে কামিনীকাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম—ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।")—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে আমরা পড়েছি এ-কথা,—মাষ্টার মশায়কে একদিন খুবই একান্তে বলেছিলেন ঠাকুর।

প্রকৃত অর্থে গুরু মহামায়া। অবিদ্যারূপে যেমন তিনি সংসার-বন্ধনের কারণ,—বিদ্যারূপিণী গুরু হয়ে সেই তিনিই সংসার-বন্ধন মোচনকারিণী। শাস্ত্রে-পুরাণে তাই গুরুরূপিণী মহাশক্তির আরাধনার কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। বিদ্যাই গুরুশক্তি—যা থেকে আত্মসম্বিদ্। এই আত্মসম্বিদ্ বা ব্রহ্মজ্ঞান সর্বদাই গুরুমুখী,—কদাপি স্বতন্ত্র নয়। এ-সম্পর্কে শ্রুতি-প্রমাণও অজস্র পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে কেনোপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকাকে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

সামবেদের অন্তর্গত এই উপনিষদের তৃতীয়-চতুর্থ খণ্ডে আছে, দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তি প্রভাবেই দেবতারা বিজয়ী হয়েছিলেন, এই সত্যকে না জেনে দেবতারা বৃথাই আত্মগৌরব খ্যাপন করছিলেন এবং অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে পড়ছিলেন। অহঙ্কৃত দেবকুলকে সম্বিদ্ প্রদানের জন্য স্বয়ং ব্রহ্ম সগুণ সরূপ হয়ে তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হন,—কিন্তু দেবতারা কেউই তাঁকে চিনতে পারেন নি। অবশেষে দেবরাজ ইন্দ্র ঐ আবির্ভূত জ্যোতির্ময় পুরুষকে চিনবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু হায়, গর্বিত ইন্দ্রকে যেন উপেক্ষা প্রদর্শন করতেই ঐ রূপ তিরোহিত হয়। দেবরাজ ইন্দ্র সচকিত হয়েছিলেন তাতেই— তাঁর অহঙ্কারের মেঘ সরে গিয়ে উদিত হয়েছিল শ্রদ্ধার ও আত্মবিচারের। তিনি প্রতীক্ষারত থাকলেন,—অপরাপর

দেবতাদের মতো হতাশায় ফিরে যাননি। ব্রহ্মধ্যানপর ইন্দ্রের ভক্তিতে প্রসন্না স্বয়ং বিদ্যা উমারূপে তাঁর নয়নপথে প্রকট হন—এবং তত্ত্বোপদেশ সহকারে বুঝিয়ে দেন যে, ব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁরা জয়লাভ করেছেন—ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত কোথাও কারও পৃথক শক্তি নেই—যার যতো অহঙ্কার সব তাঁরই, তাঁকে নিয়েই। অন্য অহঙ্কার বৃথা আস্ফালন মাত্র। ইন্দ্র তখন ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন।

ভাষ্যকার ভগবান শঙ্কর লিখেছেন—পরম বন্দনীয় ব্রহ্মের প্রতি ইন্দ্রের তাদৃশ ভক্তি দর্শনে উমারূপা তত্ত্ববিদ্যা স্ত্রীমূর্তিতে প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন। "তস্য ইন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা।" (শাঙ্করভাষ্য)

উল্লিখিত শ্রুতি-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য আরও যা লিখেছেন, তার মর্মার্থ আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ভাষ্যকার এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, দেবী উমাই যেন ইন্দ্রের গুরু হয়ে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদান করেছিলেন। গুরুরূপিণী উমার উপদেশেই ইন্দ্রের ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সে-উপলব্ধি স্বতন্ত্রভাবে ঘটেনি—অর্থাৎ নিজে নিজেই তিনি তা জ্ঞাত হননি। ভাষ্যকার যেন এখানে বেশ স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছেন যে, কেউ আপন খেয়াল বা মর্জিমতো চলেই অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় না—গুরু বা আচার্যের সাহায্য ছাড়াই কেউ কখনও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। শাঙ্করভাষ্যের ভাষা এইরকম:

"ততঃ তস্মাৎ উমাবাক্যাৎ হ এব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ইন্দ্রঃ অবধারণাৎ ততো হ এবেতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ"।—অর্থাৎ, সেই উমা-বাক্য থেকেই ইন্দ্র বুঝেছিলেন যে, ঐ যক্ষ হচ্ছেন ব্রহ্ম—কিন্তু স্ববুদ্ধি-বলে তা বুঝতে সমর্থ হন নি।

শ্রীভগবান যাঁকে অনুগ্রহ করেন, তাঁকে এমনিভাবেই গুরুলাভ করিয়ে দেন,—অথবা যে-কোনও মূর্তি ধারণ করে বা যে-কোনও রূপের মাধ্যমে নিজেকে প্রকটিত করে, যোগ্য অধিকারীকে আপন স্বরূপ জ্ঞাত করিয়ে থাকেন। তবে এ-কথাও সত্য যে, তিনি যে-কোনও রূপে বা গুরুবেশে এলেও, মাতৃরূপ—তথা সেই মাতৃ-রূপিণী গুরুমূর্তিতে তাঁর আবির্ভাব অনেক কারণেই অধিক হৃদয়স্পর্শী, অনেক বেশি ভাবদ্যোতক।

আমরা সঙ্কল্পবদ্ধ পরমাপ্রকৃতি দেবী সারদার গুরুভাবের মূর্তি চিত্রণে, কিন্তু তাঁর স্নেহঘন জননীরূপই আমাদের সমগ্র প্রয়াসকে ছাপিয়ে ফুটে উঠবে। যে-হেতু আদ্যা বিদ্যাশক্তিই কৃপায় অবতীর্ণা হয়েছেন জ্ঞানদায়িনী গুরুশক্তিরূপে—জীবের অজ্ঞান-জাড্য বিনাশের জন্য,—তাই লৌকিক দৃষ্টিতে এই গুরুরূপিণী সারদাকে

দেখতে চেষ্টা করলে আমরা কিন্তু বারে বারেই হোঁচট খাব মাত্র। সাধারণ মানুষ-গুরুর স্বভাব, ব্যবহার, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির বহুল ব্যতিক্রম এখানে চোখে পড়বে তো বটেই,—নব নব জিজ্ঞাসারও উদয় হবে মনে: জাগতিক গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থানকারিণী কে ইনি? ইনি কি মানবী না দেবী? গুরু বা জননী? বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী মোক্ষদায়িনী সারদা? কিংবা জীবদুঃখকাতরা স্নেহপাগলিনী ঘনীভূতা অখিল মাতৃশক্তি? অথবা একাধারে গুরু ও মাতা—'গুরুমাতা'? পুঁথিকার শ্রীঅক্ষয় সেন তাই কি স্তুতি করেছেন ঐভাবে?

"জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী।
রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী চৈতন্যদায়িনী॥"

'চৈতন্যদায়িনী',—তাই সঠিক তাৎপর্যার্থেই চক্ষুরুন্মীলনকারিণী অজ্ঞানতিমিরান্ধ-নাশিনী গুরু তিনি। 'রামকৃষ্ণভক্তিদাত্রী' সারদা,—মূর্তিধারিণী রামকৃষ্ণভক্তি—রামকৃষ্ণভাবপ্রবাহিনী গঙ্গা যেন। গঙ্গা দ্রবীভূতা হিমালয়,—সারদা গলিত রামকৃষ্ণ।

হৈমবতী উমা যেমন ব্রহ্মকেই প্রকাশ করার জন্য আবির্ভূতা হয়েছিলেন,—ইন্দ্রকে উপলক্ষ করে ত্রিভুবনের দেব-নর সকলের উদ্দেশেই তিনি বলেছিলেন: ইনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মেরই বিজয়ে তোমরা মহিমান্বিত। তাতেই ইন্দ্র চৈতন্যলাভ করেছিলেন—ব্রহ্মকে জেনেছিলেন। "সা ব্রহ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বম্ ইতি। ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি॥" (—কেন, ৪।১)

"ঠাকুর আছেন। ঠাকুর আছেন। ঠাকুর আছেন।" গুরুরূপিণী সারদাও অনুক্ষণ এই এক দেশনাকে ত্রিসত্য করে প্রদান করেছেন। স্বামী প্রেমেশানন্দজীর মুখে শুনেছিলাম, তিনি যখন একবার কলকাতায় উদ্বোধনে মাকে নিবেদন করেছিলেন—" . ঠাকুরের কতো ভক্ত আছে, সকলে তো আসতে পারে না। তুমি আশীর্বাদ কর মা।" মা তাতে তাঁকে তিনবার ঐ একই কথা বলেছিলেন—"বাবা, ঠাকুর আছেন।"

অনন্ত নগপতিকে স্পর্শ করা, তাঁর সন্নিকর্ষলাভ, তাঁকে ধারণায় আনা সাধারণের অসাধ্য। কিন্তু তাঁর সর্বাবগাহী জাহ্নবীরূপের সন্নিধিলাভ চির অবাধ—যেন সবারই আমন্ত্রণ সেখানে। হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গিণী—তাঁর প্রতি কণায় হিমালয়, প্রতিটি বিন্দুই তো হিমমুক্তা! তাই তো অযুতকণ্ঠে এই আর্তি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে যুগ যুগব্যাপী:

"রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতী কুমতিকলাপং।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে॥"

ভগবতী গঙ্গে, তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতিরাশিকে ধুয়ে মুছে দাও। ত্রিভুবনের সারস্বরূপা, ধরণীর কণ্ঠহাররূপিণী, তুমিই আমার একমাত্র গতি।

গুরু—গঙ্গা। সারদা—জ্ঞানদা।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনী গঙ্গা। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা সারদা। গুরুরূপিণী সারদাই তো অন্তহান সুদুর্দর্শ শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষের বোধের সীমায় এনে দিয়েছেন—বিদ্যুতের চমককে, একটি আকস্মিক আবির্ভাবকে বিশ্বভুবনের সকল অঙ্গন-প্রাঙ্গন-প্রকোষ্ঠে স্থায়ী আলোক-বর্তিকারূপে বিনিবেশিত করেছেন।

কেনোপনিষদে আছে, দেবী উমা ইন্দ্রকে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ বুঝাতে গিয়ে বলছেন—এই যে বিদ্যুৎ চমকায়, যেন অনেকটা ঐ রকমই—অথবা চোখের যে নিমেষ পড়ে, যেন তেমনই। “যদেতদ্ বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্ আ, ইতীন্ ন্যমীমিষদ্ আ...।” (—কেন, ৪।৪)

তাই তো শুদ্ধব্রহ্মের নরশরীর ধারণ করে ধরার মাটিতে নেমে এসে দাঁড়ানো, —তা’ও তো অমনই এক বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো কাণ্ড, কিংবা চোখের পাতায় পলক পড়ার মতোই আমাদের হিসাব-নিকাশ বা ধরা-ছোঁয়ার বাইরের ব্যাপারই হয়ে থাকত, যদি না আমরা রামকৃষ্ণ-চৈতন্যদাত্রী সারদাকে পেতাম। ‘বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদ্’ যে-প্রকাশ, তার কথা তবে কে আর জানতে পারত? জনাকতক দেব-মানব বা ঋষিমুনি তাঁকে জানতেন,—নরেন্দ্র-রাখাল-বাবুরাম-হরি-শরৎ-তারক প্রমুখ ঈশ্বর-মানব কয়েকজন, আর নাগমশায়-মাষ্টারমশায় গিরিশ-বলরাম এবং যোগীনমা-গোলাপমা-গৌরীমা-লক্ষ্মীদিদি-গোপালের মা প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কিছু সাধক-তাপস ও ভক্ত যোগিনীদেরই ধ্যানগত হয়ে থাকতেন তিনি। শ্রীসারদা দেবীই শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবকে বিদ্যুতের ক্ষণিক চমক থেকে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন প্রাণসঞ্চারী বায়ুপ্রবাহে,—ঋষিমুনি-দেব-মনুষ্য, মঠ মন্দির-গৃহ, পুণ্যবান-পাপাত্মা, নারী-পুরুষ, ত্যাগী-গৃহী, জ্ঞানী-মূর্খ সকলেরই জন্য যা জীবন। ক্ষণকে করে দিয়েছেন তিনি চিরন্তন,—নিমেষের আকস্মিকতাকে রূপায়িত করেছেন সত্যের সুস্থির বিগ্রহে। একটা অভাবনীয় আচমকা দৃষ্টিপাতকে—‘সকৃৎ-বিজ্ঞান’-কে দেবী সারদা তাঁর অনুপম গুরুশক্তি দ্বারা আপামর সকল জীবনের উপযোগী স্থায়ী দীপ্তিতে—স্বাভাবিক উপলব্ধিতে বা বোধেতে পরিণত করে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে করে দিয়েছেন তিনি আমাদের বাঁচার জন্য অপরিহার্য উপকরণ-স্বরূপ

—যেমন অন্ন, জল, বাতাস, আলো। রা-ম-কৃ-ষ্ণ। অন্ন-জল-বাতাস-আলো। গুরু-মূর্তি সারদার মুখে বহুশ্রুত মন্ত্র: "ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আছেন।"

* * *

যিনি জ্ঞানদায়িনী, তিনিই গুরু। জ্ঞান দানই তাঁর স্বগুণ, তাই তিনি গুরু। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ংই ঘোষণা করে গেছেন: "ও সারদা—সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।" আরও বলেছেন, "ও জ্ঞানদায়িনী"। একাধিক প্রসঙ্গে এরূপ আরও শোনা গেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে—"ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরস্বতী" ইত্যাদি। বর্তমান অনুধ্যানের প্রাগ্‌ভাগে আমরাও সে-কথার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করেছি। শুধু যে-কথাটি এখনও পর্যন্ত বলা হয়নি, সেই গভীর ইঙ্গিতবহ ঘটনাটিরই উল্লেখ করতে দুঃসাহসী হচ্ছি এখানে।

সারদা জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী—বিদ্যা বিতরণের জন্যই এবারে তাঁর আবির্ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিরূপে, এই তথ্য এখন আর অজানা নেই কারও কাছে। সংবাদ হিসাবে বহু-কথিত হলেও এর তত্ত্বাংশ বোধ হয় এখনও অবধি ততো আলোকিত হতে পারেনি—আমাদের অনুমান। তাই স্বল্পালোকিত সেই দিকটির প্রতিই আমাদের মনন-দৃষ্টিকে ফিরাতে প্রয়াসী হচ্ছি।

জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী সারদাই যে গুরুমূর্তিতে প্রকট,- এ-কথার পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ংই যে তাঁকে এই জ্ঞানদাত্রীর আসনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন,—বোধ হয় এই ঘটনাটিই আমাদের অনেকের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে, তাই সেই প্রসঙ্গটিকেই এখানে ইঙ্গিতে নির্দেশ করা যাচ্ছে। উদ্দেশ্য—মনন-তৃষ্ণার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি।

দক্ষিণেশ্বর দেবালয়। ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা-রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক দেবী সারদাকে পূজা—জ্ঞানদায়িনী মূর্তিমতী বিদ্যাকে অর্চনা ও জগদ্ধিতায় তাঁর প্রতিষ্ঠা—বিশ্ব-কল্যাণে তাঁকে শ্রীবিদ্যারূপিণী গুরুর আসনে সংস্থাপনা দ্বারা ঐ অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। 'ষোড়শী-পূজা' নামে বহুল খ্যাত এই ঘটনাটিকে সচরাচর ভক্ত জনসাধারণ ফলহারিণী কালীপূজার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেবী আরাধনার পক্ষে একটি পুণ্য উপলক্ষ জ্ঞান করে থাকে। অথবা, তারা সন্তুষ্ট থাকে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সকল সাধনার পরিসমাপ্তি হয়েছিল ঐদিন রাত্রে দেবী সারদার শ্রীপদে তাঁর জপমালাটিকে পর্যন্ত সমর্পণের মাধ্যমে। আবার এমনও কেউ কেউ ভাবেন যে, আপন ধর্মপত্নীকে পূজা করে শ্রীরামকৃষ্ণ অখিল স্ত্রীজাতিকেই মাতৃত্বের মহিমায় মহনীয় করে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবর্তিত যুগধর্ম

চক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রীবিদ্যা-বিগ্রহ দেবী সারদাকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল ঐ বিশেষ তিথিতে ষোড়শী পূজার মধ্য দিয়ে, -ভগবান শঙ্করাচার্য যেমন শৃঙ্গেরী-মঠাধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিদ্যাকে কামাক্ষী ত্রিপুরাসুন্দরীরূপে কাঞ্চিপুরমে সংস্থাপনা করেছেন দেবীর ষোড়শী মূর্তির পূজা প্রবর্তনা দ্বারা। উল্লেখ্য শৃঙ্গেরী মঠেও শ্রীযন্ত্রের উপরেই জ্ঞানদায়িনী বিদ্যার অর্চনা হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের ষোড়শী পূজার এ-রকম তাৎপর্যার্থও হতে পারে অনেকগুলি সঙ্গত কারণেই। কেননা শ্রীরামকৃষ্ণ-সমারব্ধ ধর্মপ্রবাহের উৎস তো শৃঙ্গেরী মঠেই। তাই শৃঙ্গেরী মঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাক্ষী ত্রিপুরাসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যাই যে এখানেও প্রতিষ্ঠাপ্য তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়? যে-ভাব থেকে, যে-দৃষ্টিতেই দেখা হোক ঐ ষোড়শীপূজার অধ্যায়কে,—আমরা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ' পাঠে যতোটুকু ধারণায় আনতে সক্ষম হয়েছি, তাতে এ-সত্যটিও কিন্তু বেশ উজ্জ্বলভাবে আমাদের চিত্তাকাশে উদিত যে. বিদ্যাস্বরূপিণী সারদা দেবীকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ সেই পুণ্য দিবস থেকেই, জগৎগুরুর সহস্রদল কমলাসনে সমারূঢ়া করিয়ে দিয়েছেন আনুষ্ঠানিক পূজা-বরণাদি সহকারে। শ্রীসারদা দেবী অখিল জীবের চৈতন্যদায়িনী গুরুমাতা রূপে অধিষ্ঠিতা হলেন সেই ফলহারিণী কালিকা পূজার পবিত্র নিশাকাল থেকেই ;—এখানে অধিষ্ঠাপক স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।

ফলহারিণী কালিকা পূজার রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বর দেবায়তনে সেই রহস্যপূর্ণ অধিষ্ঠাপন অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই : ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যার দিন রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এক অপূর্ব প্রেরণাবশে সহসা মনস্থ করেন, জগন্মাতার পূজায় ব্রতী হবেন। সেবক হৃদয়রাম এবং দীনু পূজারীর সহায়তায় দেবীর সর্বাঙ্গসুন্দর পূজার আয়োজনাদি সমাধা করতে রাত ন'টা বেজে গিয়েছিল। সারদা দেবীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বেই অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলেন। তদনুসারে তিনিও যথাকালে উপস্থিত হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজকের আসনে বসে যথাবিধি দেবীর অর্চনায় নিযুক্ত হন।

পূজার কৃত্যাদি দর্শন করতে করতে আরাধ্যা সারদা ক্রমেই অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে পূজকের দক্ষিণদিকে আলিম্পনভূষিত পীঠে উত্তরাস্যা হয়ে দেবী আসীনা ছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় :

"সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

('হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর; ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।')

"অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিতা হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

"কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৺দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

'হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্ম-নিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিবগেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।'

"পূজা শেষ হইল—মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনা পূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।"

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিতে এইভাবেই মানবী বিগ্রহ দেবী সারদাকে পূজা করেছিলেন,—কিন্তু লক্ষণীয় যে, তিনি কোন প্রতিমায় কিংবা ঘটে-পটে পূজা করেন নি,—যে পূজা করেছিলেন, তা'ও কালীপূজা ছিল না কোনও মতানুসারেই! 'মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনা' করেছিলেন তিনি। তিনি আরাধ্যা দেবীর সমীপে যে-প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তাতে সম্বোধন করেছিলেন: 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী'। প্রার্থনায় বলেছিলেন, 'ইঁহাতে (সারদা দেবীতে) আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।' এখানে তুলনীয় ভগবান শঙ্করাচার্যও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের সূচনাকালেই ত্রিপুরাসুন্দরী কামাক্ষী ষোড়শীদেবীর মূর্তি এবং শ্রীবিদ্যা,

যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ষোড়শী, ত্রিপুরাসুন্দরী, কামাক্ষী, শ্রীবিদ্যা, শারদা (সারদা-রই বানান ভেদ), রাজরাজেশ্বরী, ললিতাম্বিকা প্রভৃতি দেবী সরস্বতীর বিভিন্ন নাম। সরস্বতী দেবী হচ্ছেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী—অজ্ঞান-জাড্যনাশিনী। অর্থাৎ জ্ঞানদায়িকা গুরুশক্তির প্রকাশ মূর্তি জননীরূপে। ‘গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী’ এই দেবী সারদাকে শ্রীরামকৃষ্ণই জগতের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিতা করে দিয়ে গেছেন—একদা যেমন করেছিলেন ধর্মরক্ষার্থ শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রীবিদ্যাদেবীকে শৃঙ্গেরী মঠে ও দেবী কামাক্ষীকে কাঞ্চিপুরমে সংস্থাপনার মাধ্যমে।

*　　　*　　　*

“কটাক্ষে দয়ার্দ্রাং করে জ্ঞানমুদ্রাং,
　　কলাভির্বিনিদ্রাং কলাপৈঃ সুভদ্রাম্।
পুরস্ত্রীং বিনিদ্রাং পুরস্তুঙ্গভদ্রাং,
　　ভজে শারদাম্বামজস্রাং মদম্বাম্॥”

(—শারদাভুজঙ্গ-প্রয়াতাষ্টকম্, ২)

আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী শারদা দেবীর প্রতিষ্ঠা করে নিত্য অর্চনার ব্যবস্থা করেন এবং স্বয়ং এক সুমধুর স্তবও রচনা করেন দেবীর উদ্দেশে নিত্য যা আবৃত্তি হয়ে আসছে। ঐ স্তবের একাংশে তিনি বলেছেন,—কটাক্ষে যাঁর অনুক্ষণ দয়াই ঝরিত হয়—অর্থাৎ যাঁর দৃষ্টিপাতেই কৃপাকটাক্ষ, হাতে যাঁর জ্ঞানমুদ্রা,—যিনি সদাই জ্ঞানদানরতা, নৃত্য-গীতাদি কলায় যিনি সর্বদাই প্রসন্না, যিনি নিরলস কর্মরতা, পুরবধূবেশে প্রকটা- তুঙ্গভদ্রাতট-বিহারিণী, আমার জননী জগদম্বা শারদাকে আমি অজস্রভাবে বন্দনা করি।

একদা তুঙ্গভদ্রা-তীরে শঙ্করাচার্য যাঁকে সাক্ষাৎকার করে, সেখানেই স্থাপনা করেছিলেন ‘বহুজন-হিতায়’,—ইদানীং ‘সর্বকল্যাণ-সাধন’-এর জন্য তাঁকেই পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করেছেন জাহ্নবীতটে মহাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। পুরবধূরূপিণী অম্বা শারদাই শুভ্রবস্ত্রাবগুণ্ঠিতা মা সারদা,—তুঙ্গভদ্রাবিহারিণীই এখন জাহ্নবীতটচারিণী। ভগবান শঙ্করাচার্য-কৃত উক্ত স্তবের মাঝে যে সহজ-সরল মাতৃরূপের দ্যোতনা, শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর উদ্দেশে রচিত ও গীত যাবৎ স্তোত্রাদিতেও কি সেই একই ভাবের ব্যঞ্জনা আমাদের গোচর হয় না ?

দক্ষিণেশ্বরের মহাপীঠ থেকে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টিকে এবারে ফিরাতে চাই সেই অতীতের দিকে—আমাদের আদি পীঠ শৃঙ্গেরীতে। ষোড়শীপূজা থেকে

চলে যেতে ইচ্ছা করি শ্রীবিদ্যার অর্চনায়—মা সারদা থেকে শারদাম্বায়,—জ্ঞানদায়িনী গুরুশক্তি-সঞ্চারণার মূল উৎসে।

* * *

আচার্য শঙ্কর তাঁর মণ্ডলীসহ নানা স্থানে পরিব্রাজন-ব্যপদেশে তুঙ্গভদ্রা-তীরে এক নির্জন প্রদেশে এসে উপস্থিত হন। শ্রীবেলী থেকে অদূরে ঘন বনাকীর্ণ এই অঞ্চলটির লোকপ্রচলিত নাম শৃঙ্গেরী, ঐতিহাসিক নাম শৃঙ্গগিরি। রামেশ্বর তীর্থ পরিমণ্ডলের সন্নিহিত বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম ছিল—ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের নাম অনুসারেই ঐ স্থানের পরিচিতি শৃঙ্গগিরি। এই একান্ত বিজন বনাঞ্চলে বিবিক্তসেবী তপস্বিগণের তপস্যার বিরাম ঘটেনি কোনও কালেই। বালক শঙ্কর গৃহত্যাগ করে গুরুলাভের জন্য দুর্দম ব্যাকুলতা নিয়ে নর্মদার তীরে ওঙ্কারনাথ অভিমুখে যখন যাত্রা করেছিলেন, তখন পথে তুঙ্গভদ্রাতীরে শান্তরসাস্পদ এই স্থানেই এসে কিছুকাল বিশ্রাম নিয়েছিলেন,—এক বৃক্ষমূলে বসে থাকতে থাকতেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন। দেখেছিলেন, এক বিশাল শিলাখণ্ডের উপরে একটি সর্প ফণা বিস্তার করে পরম যত্নে কয়েকটি ভেক শাবককে আশ্রয় দিচ্ছে। অরণ্য-সঙ্কুল ঐ স্থানে খাদ্যখাদকের সহজ প্রকৃতিজাত হিংসার অভাব দেখে, তাঁর মন অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল—বুঝেছিলেন স্থান-মাহাত্ম্য কী প্রবল! শৃঙ্গগিরি যথার্থই ঋষি-মুনির তপস্যায় পূত ও তীর্থীকৃত। এখন প্রায় দ্বাদশ বর্ষ বাদে, ঠিক সেই স্থানে এসে উপনীত হয়ে,—সেদিনের সেই বৃক্ষতলে আসীন হয়ে শঙ্করাচার্য পুরাণ সেই স্মৃতিতেই যেন আত্মস্থ হয়ে যান। সমীপে যাঁরা ছিলেন—পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যদের কাছে আবেগভরে তিনি স্মৃতিচারণ করতে থাকেন। সঙ্গীরা সকলেই বিমোহিত হয়েছিলেন আচার্যের বর্ণনায়। ঐ তো সেই গাছটি আজও সাক্ষ্যদানের জন্য দণ্ডায়মান!

পদ্মপাদ-প্রমুখ অন্তরঙ্গ পরিকরগণ সকলেই তথায় একটি মঠ-স্থাপনার জন্য আচার্যদেবকে অনুনয় বিনয় করতে থাকেন,—এমন চিত্তানন্দকর ভজনানুকূল স্থানে সবারই আসন পাতবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দিল। বারে বারেই তাঁরা আচার্যকে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন। প্রথমে শঙ্করাচার্য শিষ্যদের অনুরোধ-উপরোধকে ততটা গ্রাহ্য করেন নি। পরে কিন্তু তিনি অনুমতি না দিয়ে পারেন নি। তিনি সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছিলেন—কিন্তু এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যে। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সারদাত্রী ভগবতী সারদা (শারদা) দেবীর যন্ত্র প্রতিষ্ঠার্থ একটি মঠ নির্মাণের জন্য সম্মতি প্রদান করেন—শিষ্যদের সকলকে কাছে ডেকে তিনি উদাত্ত

কণ্ঠে জানিয়ে দেন: "এই কার্যে বিষয়াসক্তি যেন তোমাদের মনকে কদাপি না মলিন করে। সন্ন্যাসীর নিজস্ব কোন সম্পত্তি বা বাসস্থান বাঞ্ছনীয় নয়। একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় করেই তরুমূল, গিরিগুহা বা দেবায়তনই সন্ন্যাসীর বাসস্থান হওয়া বিধেয়। এর বেশি করতে গেলে ত্যাগী আদর্শভ্রষ্ট হয়ে ক্রমে গৃহীর স্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষীণপ্রভ হয়ে পড়ে। পরার্থে জগৎ কল্যাণের উদ্দেশ্যে আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান গঠন করা যেতে পারে মাত্র—এবং সেটাই হবে মুখ্য উদ্দেশ্য। সারদা দেবী বিদ্যা ও জ্ঞানের চির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর আরাধনায় বিদ্যার স্ফূর্তি হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায়তা করে থাকে। সারদা দেবীর উপাসনার জন্য মঠ স্থাপিত হতে পারে। কেন্দ্রস্বরূপ এই মঠ থেকে সর্বত্র জ্ঞান প্রচারের দ্বারা মানবসমাজের কল্যাণ সাধিত হতে থাকবে।"

পরে পদ্মপাদকে একান্তে ডেকে নিয়ে, তাঁকে সস্নেহ ভর্ৎসনার স্বরে আচার্যদেব পুনরুক্তি করেন: "পদ্মপাদ! সাবধান হও আবার বলছি। বিষয়াসক্তি যেন তোমাদের কোনও ভাবেই না অভিভূত করতে পারে। সন্ন্যাসীর বাসভবন কেন? কেবল—কেবলমাত্র ভগবতী সারদা দেবীর জন্যই একটি গৃহমাত্র নির্মিত হউক। তোমরা তাঁর চারিপার্শ্বে অবস্থিতি করতে পার, এমনই কিছু একটা ব্যবস্থা কর,—এই-ই আমার অভিমত। তোমাদের জন্য পৃথক নিকেতনাদি যেন নির্মিত না হয়। বৃক্ষতল কিংবা গিরিগুহা অথবা দেবদেউলই হবে তোমাদের আশ্রয়স্থল। পদ্মপাদ, কঠোর হলেও তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, মঠ-স্থাপনের অনুরোধে তোমরা যেন অবশেষে গৃহবাসী হয়ে উঠোনা। তোমাদের আশ্রয় পরমাত্মা—একমাত্র শ্রীভগবান। তোমরা তাঁতেই পরমানন্দে বাস করবে।"

পদ্মপাদ স্বীয় আচার্যের অভিপ্রায় বুঝে নিয়ে অনুরাগী ভক্তগণের সাহায্যে অচিরেই দেবী সারদার জন্যই মাত্র একটি গৃহ নির্মাণের আয়োজন করে ফেলেন। সাধু-সন্ন্যাসীরা মন্দিরেরই অলিন্দে, বা কোথাও পর্ণকুটির বেঁধে নিয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন। ধনী ভক্তগণের—বিশেষতঃ আচার্যের আশ্রিত সন্তান কর্ণাট-উজ্জয়িনীর রাজা সুধন্বার আনুকূল্যে ও বদান্যতায় সারদা-মন্দিরের অদূরে মন্দিরকে বেষ্টন করে অবশ্য ক্রমে ক্রমে অরণ্যভূমিতে জনপদের সৃষ্টি হয়।

শুভদিনে শুভক্ষণে নবনির্মিত গৃহে শ্রীবিদ্যা-যন্ত্র স্থাপনাপূর্বক, ভগবান শঙ্করাচার্য শৃঙ্গগিরির অরণ্যমধ্যে শৃঙ্গেরী মঠের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। আচার্য যথাবিধি সারদা দেবীর পূজাদি নিজহাতে সম্পন্ন করে, সেখানেই একটি স্তব রচনা করে মাকে শুনিয়েছিলেন। ভগবতী সারদার বাঙ্ময়ী পূজা এইভাবেই সেদিন

নিষ্পন্ন হয়েছিল। সেই থেকে অদ্যাবধি এই ভাবেই পূজাবিধি অনুসৃত হয়ে আসছে। ভগবান শঙ্করাচার্যই সারদা-পূজার প্রথম প্রবর্তক—দেবীর জ্ঞানদাত্রী গুরুশক্তির প্রথম উদ্বোধক! দেবী সারদার পূজান্তে তিনি সমাগত শিষ্যগণকে আহ্বান করে বলেছিলেন ঃ

"তোমরা উপাসনার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। যতোদিন দেহে বাস করবে, ততোদিন উপাসনা করবে। উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। সংশয়, বিপর্যয় ও বিস্মৃতি বিনষ্ট হয়। চিত্তশুদ্ধির ফলে একাগ্রতা জন্মে, একাগ্রতাই যোগরাজ্যের দ্বার বিশেষ। সঞ্চিত কর্মের দুরিত ক্ষয় হয় এবং শুভাদৃষ্টের সূচনা হয়ে থাকে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার অভ্যাস অবশ্যই রাখবে। কোনও পরিস্থিতিতেই এর অবহেলা কোর না। আর সারদা দেবী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী। তাঁর উপাসনায় সুনিশ্চিত জানবে—বিদ্যাব স্ফূর্তি হয়। বিদ্যাস্ফূর্তি না হলে অজ্ঞান যায় না। অজ্ঞান নষ্ট হলেই জ্ঞানের উদয় হয়। আত্মজ্ঞানার্থী নিবৃত্তিমার্গী সন্ন্যাসীর পক্ষেও সারদাদেবীর উপাসনা তার অভীষ্টলাভের পরম সহায়।"

যা'হোক, শঙ্করের প্রার্থনায় দেবী সরস্বতী 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' চিরকাল সেই মঠে অধিষ্ঠিতা থাকতে স্বীকৃতা হন্। শৃঙ্গেরী মঠে জ্ঞান ও বিদ্যার অক্ষয় পীঠ এই ভাবেই চির সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শৃঙ্গেরী মঠ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়েরই পক্ষে এক মনোজ্ঞ জাগ্রত বিদ্যাতীর্থে পরিণত হয়। পরে শ্রীগুরুর সম্মতিক্রমেই উজ্জয়িনী-রাজ সুধন্বা মঠ থেকে অল্প দূরে নিজের বসবাসের জন্য একটি সুন্দর অনাড়ম্বর গৃহ নির্মাণ করে নিয়েছিলেন এবং তাঁরই দাক্ষিণ্যে আরও বহু কুটির সদৃশ আবাস তৈরী হয় যাতে জিজ্ঞাসু, ভজনশীল গৃহস্থ ভক্তগণ সেখানে থেকে সাধুসঙ্গ সাধন-স্বাধ্যায়াদি স্বাধীন আনন্দে করতে পারেন। এখানেও স্মরণীয় ঘটনা ঃ গৃহী কিন্তু তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্তগণের ভিড় যতোই মঠকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততোই তাদের বাসোপযোগী আশ্রয়স্থলের অভাব অনুভূত হতে থাকে। ধনী বা সঙ্গতিপূর্ণ ভক্তরা তাদের নিজেদের জন্য অথবা তাদেরই মতো আরও অনেকের অভাবমোচনের উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক আবাস-ভবন নির্মাণের জন্য পদ্মপাদাচার্যের মাধ্যমে ভগবান শঙ্করের কাছে অনুমতি প্রার্থনাসহ আবেদন করতে থাকেন ক্রমাগত। ভগবান তাদের আবেদন শুনে ঈষৎ হাস্যসহকারে পদ্মপাদকে বলেছিলেন ঃ "পদ্মপাদ, এই জন্যই সন্ন্যাসীর পক্ষে এক জায়গায় ঠাঁই বেঁধে বসা ক্ষতিকারক—পরিব্রাজক জীবনই ভাল। দেখ, এখন কী বিড়ম্বনা!—ক্রমেই এই সব গৃহস্থ ভক্তদের আগ্রহে এই নিরালা শান্ত স্থানও এক বড় নগরে পরিণত হতে চলেছে। কিভাবে ঠেকানো

যাবে এখন ? যা'হোক, এদের জন্য ঘর-বাড়ি মঠের খুব কাছাকাছি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়—একটু দূরেই হোক ভক্ত-আবাস।" কাল-প্রভাবে সেই শান্তপল্লী শৃঙ্গগিরি এখন বাস্তবিকই এক চিত্তাকর্ষক নগরীতেই রূপান্তরিত। তথাপি এই মহা জ্ঞানতীর্থ আজ বিশ্বের গৌরব—শৃঙ্গেরী মঠের সর্বত্রই বাগ্‌দেবী সারদার প্রভাব সমান সমুজ্জ্বল এখনও।

শ্রীশ্রীসারদার এক বরিষ্ঠসন্তান স্বামী প্রেমেশানন্দজীর মুখে বহুবার শুনেছি—ভগবান শঙ্করাচার্যের প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, 'দেবী সরস্বতীকে 'বহুজনহিতায়' শৃঙ্গেরী মঠে প্রতিষ্ঠা তাঁর এক অনবদ্য অবদান।" তিনি তাঁর 'শঙ্করচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন :

"শৃঙ্গেরী মঠে মা-সরস্বতী দেবী শঙ্করের তপস্যায় চিরবিদ্যমান। যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনই এই মঠের সাধু সম্প্রদায়ে ভগবান আবির্ভূত হইয়া ধর্ম রক্ষা করেন। পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মন্ত্রদাতা ঈশ্বরপুরী ও সন্ন্যাসদাতা কেশবভারতী শৃঙ্গেরী মঠের ভূর্বার সম্প্রদায়ভুক্ত। আবার যখন সমস্ত পৃথিবী ইহসর্বস্বতার অনলে দগ্ধ হইতে চলিল, তখন এই ভূর্বার সম্প্রদায়ের আচার্য তোতাপুরী গুরুপরম্পরাগত ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীমদ্‌ রামকৃষ্ণপরমহংসদেবকে প্রদান করিয়া মানুষের জন্য মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।"

'...মানুষের জন্য মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন' করতেই শ্রীমদ্‌ রামকৃষ্ণপরমহংসদেবও পুনরায় সেই দেবী সরস্বতীর আনুষ্ঠানিক অর্চনা দ্বারা তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন দক্ষিণেশ্বর দেবায়তনের সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে যেখান থেকে একদা অখিল মানবের মুক্তিপ্রদায়িনী জ্ঞানগঙ্গা নিয়ত সহস্রধারে প্রবাহিত হয়েছিল, এবং যে-প্রবাহ অনন্তকাল ধরেই অব্যাহত রহিবে যতোই তা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যাক না কেন। যুগধর্মপ্রবাহ এই রূপই। ফলহারিণীকালীপূজার রাত্রিতে সংঘটিত সেই নীরব নাটকটির পশ্চাতে মর্মরহস্য এই-ই কি না কে বলবে ?

শ্রীসারদা সরস্বতীর মানবপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'আচার্যানাং মহাচার্য', যুগধর্মসংস্থাপক শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। সরস্বতীই গুরুমূর্তির শুভ্রোজ্জ্বল জননীরূপ। লক্ষণীয় যে, শ্রীগুরুর বীজ ও সরস্বতীর বীজমন্ত্র অভিন্ন—দেবী সারদা, ত্রিপুরাসুন্দরী, শ্রীবিদ্যা এবং ষোড়শীরও তাই।

অতীতে শঙ্করাচার্য যেমন দেবী সারদার মহিমোদ্যোতক উক্তি তাঁর শিষ্য-পরিকরগণের কর্ণে বার বার শুনিয়েছেন, এবারে শ্রীরামকৃষ্ণও কি তেমনই শুনিয়ে যান নি ?

"ও সারদা, সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে...।"

"ও জ্ঞানদায়িনী, ও কি যে সে ? ও আমার শক্তি।"

* * *

"তুমি যোগেনকে এই মন্ত্র দাও।"

অশরীরী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে আবির্ভূত—সশরীরে প্রকট হয়ে দেবী সারদাকে নির্দেশ দিচ্ছেন বার বার—তিন বার। ঘটনাটির কাল শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল অদর্শনের পরে। বিরহ-কাতরা সারদা মাতাজী তখন বৃন্দাবনবাসিনী। প্রথম দু'দিন ঠাকুরের আদেশকে মা তেমন গুরুত্ব প্রদান না করে শুধু শুনে গেছেন। তৃতীয় দিনেও যখন আদিষ্ট হলেন, "তুমি যোগেনকে এই মন্ত্র দাও"—তখন মা অস্থির হয়ে উঠে মিনতি জানান ঠাকুরকে, "আমি যে তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না ; কি করে তাকে আমি মন্ত্র দিই ?"

রেহাই মেলেনি তাতেও। অমনি ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন মা, "তুমি মেয়ে যোগেনকে[১] বলো, সে থাকবে।" আরও জানিয়ে দিলেন কী মন্ত্র দিতে হবে।

সারদা দেবীকে যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই হাত ধরে নিয়ে গুরুর আসনে বসিয়ে দিচ্ছেন,—এ ঘটনায় সুস্পষ্ট। অধিষ্ঠাপন সমাপনান্তে এ-যেন পবিত্র অভিষেক। কৃতাভিষিক্তা দেবীও তখন থেকে স্ব-মহিমায় প্রকট হতে থাকলেন। যোগীন মাকে দিয়ে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন তিনি যোগীনকে—তার মন্ত্রদীক্ষা হয়নি কি ? যোগীনও সসঙ্কোচে মাতৃসকাশে নিবেদন করেন : "না, মা, বিশেষ কোন ইষ্টমন্ত্র ঠাকুর আমায় দেন নি। আমি নিজের রুচিমতো একটি নাম জপ করি মাত্র।" সকল জড়তা ত্যাগ করে তিনি আরও প্রকাশ করে ফেলেন ঐকালে যে, তিনিও ক্রমাগত ঠাকুরের আদেশ শুনছেন দীক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে। কিন্তু তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে মার কাছে এসে তা মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না।

মা সব শুনে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন—যোগীনকে তখন আর কিছুই বলেন নি। পরে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট ও দেহাবশেষের কৌটা সম্মুখে স্থাপনা করে মা পূজায় বসেছেন,—খানিকক্ষণ বাদেই তিনি ভাবাবেশের ঘোরে যোগীনকে ডাকেন। যোগীনকে ডেকে আনলেন যোগীন-মা। যোগীন নিকটে আগত দেখেই গুরুরূপিণী দেবী তাকে বসতে আদেশ করেন এবং ঐ ভাবাবস্থাতেই

১। যোগীন-মাকে। স্বামী যোগানন্দ ও যোগীন-মা উভয়েই ছিলেন শ্রীশ্রীমার কাছে যোগেন—একজন ছেলে যোগেন, আর একজন মেয়ে যোগেন।

সোচ্চারে তার কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করে তার দীক্ষানুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে দেন। যোগীন-মা একটু আড়ালে, পাশের ঘরেই ছিলেন। মা তখন এমনই এক উচ্চ-ভাবের স্তরে অবস্থান করছিলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বরও সেই কালে অসাধারণ উচ্চগ্রামে উন্নীত ছিল। মন্ত্র এতো স্পষ্ট ও জোরে উচ্চারণ করেছিলেন যে, যোগীন-মা তা দূরে থেকেও শুনতে পেয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ ঈশ্বরকোটি পুরুষ স্বামী যোগানন্দই গুরুমূর্তি শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সর্বপ্রথম মন্ত্রশিষ্য,—অবশ্য আনুষ্ঠানিক অর্থে। এই ভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর অখিল জীবের মোক্ষ ও জ্ঞানদাত্রী গুরুর আসনে শ্রীসারদা দেবীকে সু-অধিষ্ঠিত করে দিয়েছেন নিজেই।

'আনুষ্ঠানিক অর্থে' যোগানন্দই সর্বাগ্রণী শ্রীসারদাদেবীর সাক্ষাৎ কৃপালাভে— এ-কথা বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকটাবস্থাতেই দক্ষিণেশ্বরে তাঁর অপর লীলাসহচর ত্রিগুণাতীতানন্দকে সারদা দেবী মন্ত্রদানে ধন্য করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণেরই নির্দেশে, কিন্তু অতিশয় সংগোপনে সকলের অগোচরে,—এ-কথা আজ আর অবিদিত ঘটনা নয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ কৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা' দ্বিতীয় ভাগের পৃষ্ঠা ২ দ্রষ্টব্য—সেখানে রয়েছে ঃ

"দীক্ষাগ্রহণের জন্য ঠাকুর তাঁহাকে (সারদাপ্রসন্নকে অর্থাৎ ত্রিগুণাতীতানন্দকে) শ্রীশ্রীমার নিকট পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন,—'অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়। / কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়'।" বর্তমান লেখকের 'প্রকৃতিং পরমাং' প্রথম ভাগের পৃষ্ঠা ১২-১৩ দেখলে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা সেখানে পাওয়া যাবে। তাহলে স্বামী ত্রিগুণাতীতই তো মায়ের প্রথম মন্ত্রশিষ্য আমাদের সহজ দৃষ্টিতে। কিন্তু শ্রীশ্রীমা নিজমুখেই জানিয়েছেন. যোগানন্দ তাঁর প্রথম মন্ত্রশিষ্য,—শ্রীমৎ সারদানন্দজীও তাই-ই বলেছেন। এই কারণেই আমরাও অতিশয় গোপনে সংঘটিত দীক্ষাদানকে এখানে প্রকাশ্যে না এনে, ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানালোকে যা' ঘটেছে, তাকেই প্রথমে উল্লেখ করলাম 'আনুষ্ঠানিক অর্থে'-র প্রয়োগ সহ।

তবে একথাও সত্য যে স্বামী যোগানন্দই মাত্র নহেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পরিকরগণের মধ্যে আরও আছেন, যাঁরা শ্রীসারদাদেবীর কাছ থেকেও মন্ত্রপ্রাপ্ত হয়ে কৃতকৃতার্থ। স্বামী ত্রিগুণাতীতের মাতৃ-শরণ লওয়ার কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত ইতিহাস। অনুমিত হয়, স্বামী অভেদানন্দও কোনও সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে কিছু পেয়ে থাকবেন। এ-সম্পর্কে যতোটুকু তথ্য আমাদের জানা আছে তা থেকে আমাদের উক্ত অনুমানকে সত্য বলেই গ্রহণে কোনও বাধা থাকে না। 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৩৪) স্বামী অভেদানন্দ স্বয়ং লিখেছেন ঃ

"শ্রীমার স্তোত্র রচনা করিয়া আমি ঐ সময়েই শ্রীমাকে শুনাইয়াছিলাম এবং শ্রীমা শুনিয়া আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।' সেই সময় আমি শ্রীমার হস্ত হইতে জপের মালাও (রুদ্রাক্ষের) পাইয়াছিলাম।"

তা'ছাড়াও অন্য সূত্রে আমরা অবগত আছি যে, অভেদানন্দজী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর বিশেষ কৃপালব্ধ এবং তাঁর কাছ থেকেও মন্ত্রপ্রাপ্ত। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের 'জীবন-পরিক্রমা' গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় যা' তিনি লিখেছেন, তা'ও এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য। সেখানে রয়েছে ঃ

১৩৪৫ সালে আমি রেঙ্গুন যাই। অভেদানন্দ-শিষ্য ভুবন (হরচৈতন্য) সেই সময়ে রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনে থাকিয়া ঠাকুরপূজা করিতেন। আমাকে তিনি বলিয়াছেন ঃ "আমার গুরুদেব মায়ের শিষ্য ছিলেন, বৃন্দাবনে মা তাঁকে মন্ত্র দিয়েছিলেন। যোগীন মহারাজের দীক্ষার পরেই মার কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হন, আর 'ঠাকুর তোমাকে কিছু দিয়ে যান নি?'—মার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ঠাকুর আমার জিভে কিছু লিখে দিয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন, কিন্তু কি লিখেছিলেন জানি না। আমার যা' কিছু অনুভূতি, সবই ধ্যান করে হয়েছে।' ঘটনাটি তিনি নিজমুখে বলেছিলেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যজী প্রকাশিত উল্লিখিত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' সপ্তম সংস্করণে (পৃষ্ঠা ১১৮-১৯)। সেখানেও তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন ঃ "মা তাঁহাকে ইষ্টমন্ত্র দান করেন।" শ্রীশ্রীমার হাত থেকে রুদ্রাক্ষ-মালা জপের জন্য প্রাপ্তিও একটি বিলক্ষণ প্রমাণ যে অভেদানন্দজী মার কাছ থেকেই ইষ্টমন্ত্র লাভ করেছেন। মা তখন (১৮৮৮-৮৯) বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর উদ্যান ভবনে—যখন অভেদানন্দ স্বামী তৎকৃত স্তোত্র মাকে শুনিয়েছিলেন। কথাটা সহজেই বুঝা যাচ্ছে—বৃন্দাবনে মা তাঁকে দীক্ষা দিলেও, জপমালা দিয়েছিলেন পরে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে।

কথামৃতকার শ্রীম—মাষ্টার মশাই সম্পর্কেও আমাদের ঐরূপ অনুমান। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য-সংগৃহীত তথ্য থেকে অন্তত সেই অনুবোধই স্বাভাবিক। "শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য-পরিচয়" প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—

"তাঁহার (শ্রীম'র) সহধর্মিণীর নিকট যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা এইরূপ ঃ ঠাকুরের স্থূল লীলাবসানের পর একদা তাঁহারা উভয়ে জয়রামবাটী গিয়াছিলেন। রাত্রে আহারের পরে পুরুষভক্তেরা বহির্বাটীতে বিশ্রাম করিতেছেন

এবং স্ত্রীলোকেরাও সবেমাত্র শয়ন করিয়াছেন এমন সময় মার একটি দর্শন উপস্থিত হয়। তিনি দেখিলেন, শ্রীম ন্যাংটা ছোট বালকমূর্তিতে জয়রামবাটীর অলিগলি দিয়া ছুটিতেছেন আর ঠাকুর তাঁহাকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া মাকে বলিতেছেন, ‘দাও, দাও, একে দাও।’ ‘ঠাকুর কি ছেলেকে কিছু দিয়ে যান নি?’—বলিয়াই মা ছেলেকে ডাকাইয়া আনিয়া অন্তের অশ্রুতভাবে তখনই তাঁহাকে কিছু বলিয়া দেন।”

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর নিজের একটি উপলব্ধি সম্পর্কে একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন: “তখনও মাকে দেখিনি, দেখতে গিয়েছি। মা উপরে রয়েছেন, আমি নিচের তলায় বসে—আমার হৃৎপদ্ম ফুটে উঠল।”—এ-উক্তিই কি যথেষ্ট নয় যে, শ্রীমা সারদার অলৌকিক গুরুশক্তির কিরণজাল স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে স্পর্শ করেছিল? [—অক্ষয়চৈতন্য-প্রণীত ‘শ্রীশ্রীসারদা দেবী’ দ্রষ্টব্য]

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণের মতো বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-পরিকরগণের মধ্যেও বেশ কয়েকজনই ছিলেন শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত—যথা বিরজানন্দ, বিমলানন্দ, প্রকাশানন্দ, বোধানন্দ ও আত্মানন্দ-প্রমুখ বরিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ভাগেও এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। ঠাকুরের সন্তান, স্বামিজীর সন্তান,—কিন্তু মায়ের সন্তান সকলেই। শ্রীশ্রীমায়েরই আশ্রিত—কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য কি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। এ-এক অপূর্ব সমাহার এবারকার ভাবরাজ্যে।

তত্ত্বতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ এক ও অভিন্ন,—ঐশ্বরিক স্বরূপে তাঁরা অভেদ। ঠিক মানুষ গুরুর দৃষ্টিতে বিচার করলে, তাই দিশাহারা হতে হবে ঠিকই,—প্রচলিত গুরুকরণ প্রথা বা শিষ্য-নির্বাচন প্রণালীর স্বাভাবিক রীতি-নীতির সঙ্গে অতীব অমিল কিংবা ব্যতিক্রম চোখে পড়বেই। এই ব্যতিক্রম ও স্বাতন্ত্র্যই তো তাঁদের মহিমা—অনন্যসাধারণ অতিলৌকিক মাহাত্ম্য। এক ইষ্টবস্তু পরমেশ্বরেরই তিন মূর্তি প্রকট এখানে,—আবার যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু হয়ে নিত্য সাহচর্য দান করে চলেছেন!! এ বড় মধুর ও গম্ভীর তত্ত্ব। তাই-ই তো পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি মহাদেবীকে গুরুমূর্তিতে ভাবনায় এতো আধ্যাত্মিক রসানুভূতি লাভ হয়ে থাকে,—আবার সেই গুরু-মাতাকেই স্বীয় ইষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারায় এমন দিব্য আনন্দ-উপলব্ধিতে হৃদয় ভরে যায়। শ্রীশ্রীসারদার গুরুভাবের অনুধ্যান তাঁরই দিব্যভাবের বোধিকামাত্র,—অথবা গুরুভাবের তরঙ্গবাহিত হয়ে তাঁর দিব্য-ভাবে অগ্রসরণ।

শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত মায়ের মন্ত্রশিষ্য। তাঁর কিন্তু প্রবল ঝোঁক, ইষ্টমূর্তির

(শ্রীরামকৃষ্ণের) ধ্যান অপেক্ষাও শ্রীশ্রীমায়েরই রূপ-ধ্যানের দিকে। ইষ্টধ্যানই প্রশস্ত,—সচরাচর গুরু সেই উপদেশই প্রদান করে থাকেন। গুরুমূর্তি ধ্যানের বিধি আছে,—কিছুক্ষণ সহস্রারে শ্রীগুরুর প্রসন্নমূর্তিকে ধ্যান করেই গুরুমূর্তিকে ইষ্টে লয় করে দিতে হয়—অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে আর গুরুমূর্তির ধ্যান অনাবশ্যক। কিন্তু হৃৎপদ্মে গুরুনির্দিষ্ট ইষ্টমূর্তিকেই অধিক সময় ধ্যান করার বিধান। ইষ্টধ্যানে তন্ময়তা লাভই ধ্যান ভজনের উৎকর্ষতা প্রাপ্তি। বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যাকুল সন্তানের আর্তি শ্রীশ্রীমা কিন্তু মিটিয়েছিলেন এক অনবদ্য অনুপম সহজ পন্থায়,—যেখানে তাঁর স্বকীয় অসাধারণত্ব বা স্ব-স্বরূপটি আর কোনও মতেই গোপন থাকে নি। তাঁর গুরুভাবের যে অলৌকিক বৈশিষ্ট্যকে আমরা বুঝাতে চেষ্টা করছিলাম, সেটিই মায়ের উক্তিতে সুব্যক্ত হয়েছে। মানদাশঙ্করকে তাঁর গুরুরূপিণী দেবী সারদা চিঠিতে এই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন:

"কল্যাণবরেষু,

"...জপ সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা শুধু কমের পক্ষে ১০৮ বার,—আর অতিরিক্ত যত করিতে পার ততই ভাল। যদি আমার ধ্যান করিতে তোমার বেশী ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই করিবে। কারণ আমি ও ঠাকুরে কোন পার্থক্য নাই,—শুধু রূপের পার্থক্য। যিনি ঠাকুর, তিনিই এই দেহে আছেন।...ইতি—

"আশীর্বাদিকা তোমার মা।"

শ্রীসারদা স্বয়ং ভগবতী গুরুরূপধারিণী—একাধারে গুরু ও ইষ্ট দুই-ই। জগদ্‌-গুরুশক্তির এই ভাবেই প্রকাশ হয়ে থাকে।

* * *

মন্ত্রজপই শ্রেষ্ঠ সাধন। সাধারণ জীবের পক্ষে এর চেয়েও উৎকৃষ্ট ও সহজ সাধনা আর নেই। "যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি"—শ্রীভগবান গীতামুখে বলেছেন, যাবতীয় যজ্ঞাদির মধ্যে আমি হচ্ছি জপযজ্ঞ। দস্যু রত্নাকর এই জপপ্রভাবেই মহাকবি বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন,—'জপাৎ সিদ্ধি' এই কারণেই শাস্ত্র বহুমুখে বলে আসছেন। যা' মনন করলে বা মনে মনে জপ করলে জীব অজ্ঞান থেকে ত্রাণলাভ করে, তাকে বলা হয় মন্ত্র। গুরু সাধারণতঃ মন্ত্রপ্রদানের ভিতর দিয়েই শিষ্যকে ত্রাণের পথ নির্ণয় করে দেন। গুরু যে বীজমন্ত্র দিয়ে থাকেন, ভক্তি সহকারে তা' পুনঃ পুনঃ মনে মনে আবৃত্তি করার নামই জপ। নিরন্তর জপ করতে পারলে, কালে তা' থেকেই সিদ্ধি সুনিশ্চিত হয়ে থাকে,—ইষ্টমূর্তির

সাক্ষাৎকার ঘটে। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ লুকানো থাকে, বীজমন্ত্রের মধ্যেও যেন ঐরকমই ইষ্ট-দেবতা লুকিয়ে থাকেন। ভক্তিবারি সেচন দ্বারা ঐ বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে মোক্ষফল প্রদান করে—অথবা ইষ্টদর্শনের ফলে জীবের জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে ও তখন সে মুক্তির অধিকারী হয়। অবোধ শিশুকে বর্ণমালা শিক্ষাদান কালে, শিক্ষক 'ক'—একটি বর্ণমাত্র লিখে দেন,—শিশু ঐ অক্ষরের উপর কলম বুলাতে বুলাতে ক্রমে সে উত্তম লিপিকার হয়ে ওঠে। অনেকটা যেন এই ভাবেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রজপ করতে করতে ক্রমশঃ চিত্ত নির্মল হয়ে ওঠে—মন্ত্র ও মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীর স্বরূপ আপনিই পরিমার্জিত নির্মল চিত্তে ফুটে ওঠে। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় জ্ঞান বিতরণ—অজ্ঞানের নিবৃত্তি আদি কার্য-প্রবাহ এই শাস্ত্রীয় পন্থাতেই চলে আসছে। গুরু-শিষ্যের মাঝে এইরূপই ধারা চির-প্রবহমান,—সাধারণ বা প্রচলিত বিধান এই-ই।

(কিন্তু জগদ্গুরুশক্তির ক্ষেত্রে এই বিধানে বহুল পার্থক্য,—বিস্তর ব্যতিক্রম আমাদের কাছে অত্যন্ত তাজ্জব ব্যাপার বলে প্রতীত হয়। শ্রীশ্রীসারদা দেবীর গুরুভাব বিকিরণের বেলাতেও ভূয়িষ্ঠ উদাহরণ আমাদের দৃষ্টিপথে ভাসমান, যাতে উল্লিখিত কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হবে। কেবলমাত্র মন্ত্রপ্রদানের দ্বারাই অবতীর্ণ গুরুশক্তি তাঁর জীবত্রাণ-কার্য সমাধা করেন না—গুরুভাবের প্রকাশ করেন না। তাঁর দৃষ্টিপাতে, করস্পর্শে, আশীর্বচনে, কিংবা মাত্র ইচ্ছাতেই সমীপাগত বা দূরস্থ মানুষের পরম মঙ্গল সাধিত হয়েছে, পরাগতি প্রাপ্ত হয়েছে—মা-সারদার লীলাবৃত্তের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত অগণন।)

মুখে একটি কথাও বলেন নি—মাত্র প্রসন্ন অভয় দৃষ্টিপাতে একজনের সকল ভার, এমন কি 'বকলমা' পর্যন্ত গ্রহণে কৃতার্থ করেছেন তাকে,—জ্ঞানদা অখিলগুরুমূর্তি সারদার জীবনলীলায় এমন চিত্রও বিরল নয়। উল্লেখযোগ্য একখানি স্মৃতি-চিত্র: বরিশালের অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত কলকাতায় এসেছেন এক বন্ধুর সঙ্গে। উদ্বোধনের বাড়িতে মাকে দর্শন করতে গেছেন সেবারেই প্রথম—এবং সেইবারেই শেষ! মুখ ফুটে মাকে কিছু জানননি তিনি,—মা-ও তাকে এক বর্ণও কিছু বলেন নি। অথচ, দেওয়া-নেওয়ার সব ব্যাপারই সংসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ঐ ক্ষণিকের একটি মৌন প্রণাম নিবেদন আর সুপ্রসন্ন নয়নপাতের মাধ্যমেই। অন্নদাচরণের নিজের কথা—

"ঠাকুরের যে-সকল কথা পড়িয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র গিরিশবাবুর বকলমা নেওয়ার ঘটনাটি আমার মনের মতো হইয়াছিল ও প্রাণে গাঁথিয়া গিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, মার কাছে আমার কেবল ঐ একটি জিনিসই চাহিবার

আছে—তাঁহাকে বলিব, 'মা, আপনি আমার বকলমা গ্রহণ করুন।' আমার মনে মন্ত্র নেওয়ার কোনরূপ ইচ্ছা ছিল না।...

"গঙ্গাস্নান করিয়া মার বাড়িতে গেলাম ও কোন কথা না বলিয়া শরৎ মহারাজকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া মাকে দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে উপরে যাইয়া দেখি, মা আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার শ্রীমুখ দেখিতে না পাইয়া, আমরা কি করিব ঠিক কবিতে না পারিয়া পরস্পব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? প্রণাম করে নিন।' আমি মার পাদপদ্মের উপর একটি আপেল রাখিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম, 'মা, আপনি আমার বকলমা গ্রহণ করুন।' মাথা তুলিয়া উপরের দিকে চাহিবামাত্র দেখি,—মার আবক্ষ ঘোমটা মাথার উপরে উঠিয়াছে ও সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন; তাঁহার মুখে এক অপূর্ব, স্নেহমাখা, মৃদুমন্দ হাসি! তাঁহার সস্মিত মুখেই আমার প্রার্থনার উত্তর পাইলাম; মুখ ফুটিয়া আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন বোধ হইল না। মাকে স্থূলচক্ষে আমার এই প্রথম ও শেষ দেখা। সেই দিন হইতে অন্তর চিরকালের জন্য অভী হইয়া গিয়াছে।

"অনেকদিন পরে একবার মনে হইয়াছিল, মা আমাকে এখনও মনে রাখিয়াছেন কিনা কে জানে! ইহার কয়েকদিন পরেই কলিকাতার জনৈক আত্মীয়ার কাছে শুনিলাম, মা তাঁহাকে 'বরিশালের অন্নদা'র কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।"

[—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' পৃষ্ঠা ১৭৮-১৭৯]

মন্ত্রদীক্ষাদান না করেও এ ভাবে কৃপা বিতরণ বা ভার-গ্রহণের ঘটনা আরও কতোই রয়েছে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনলীলায়। মনে পড়ে শ্রীহট্ট জেলার ভুলালি পরগণার সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের[১] কথা। সুরেন্দ্রনাথ নিজ বিষয়াসক্ত পিতার জন্য একদিন কাতরে শ্রীশ্রীমার কৃপা ভিক্ষা করেন। পিতৃভক্ত পুত্রের আর্তিতে মা বিচলিত হন সত্যই। অবশেষে পুত্রকে আদেশ প্রদান করেন, কোনপ্রকারে তার পিতাকে একবার নিয়ে আসতে মায়ের কাছে। বাস্তবিকই সুরেন্দ্রনাথ পিতাকে মাতৃচরণ সকাশে আনয়ন করেছিলেন। আশ্চর্য এই যে সুরেন্দ্রের পিতা বৈকুণ্ঠনাথ গুপ্ত মায়ের দর্শনমাত্র লাভেই ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর বিষয়াশক্তির ভাবও সেই থেকেই শিথিল হতে শুরু করে। আমূল পরিবর্তিত জীবনের

১। উত্তরকালে স্বামী সৎসজানন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য।

শেষ প্রান্তে বৈকুণ্ঠনাথের মুখে প্রায়ই শোনা যেত—"মা যদি দেবতা না হন, তো দেবতা আর কে?" অন্তিমে তিনি মুখে 'মা', 'মা' উচ্চারণ সহ সংসার-নাটকের যবনিকা-পাত করেছিলেন।

অবতীর্ণ জগদ্‌গুরুর জ্ঞানদা শক্তি যখন জীবোদ্ধারকার্যে নিরত হন, তখন আমাদের কল্পনাতীত বিচিত্র সব উপায়ে ও কৌশলে দূরদূরান্তের মোক্ষার্থী মানুষকে আকর্ষণ করে আনেন,—অথবা আপনিই কোন্ অলক্ষ্য পন্থায় তার সমীপবর্তী হয়ে সন্নিধি প্রদান করে থাকেন—তাকে পূর্ণকাম করেন বা মনোভীষ্ট প্রদান করে থাকেন। সাধারণ গুরু-শিষ্যের ক্ষেত্রে যা' নিতান্তই অভাবনীয় ও অবাস্তব,—কিংবা অসম্ভব। আধ্যাত্মিক রাজ্যের এতো সব নিগূঢ় ইতিহাস মানবের কাছে চির অজ্ঞাতই থেকে যেত, যদি না এই মাত্র সেদিন এই পৃথিবীর মাটিতেই তাঁকে মূর্তিধারিণী দেখা যেত।

মন্ত্র অনুপস্থিত—মন্ত্রদান-সূত্র অদৃশ্য। তথাপি মুক্তি-প্রদান—ভবসমুদ্র-পারের ব্যবস্থা!! হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শৈশবে কুলগুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত বলে অনুমিত। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখা যেত বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতৃ-সন্দর্শনে আসতেন—কিন্তু মার সঙ্গে তেমন কিছু কথাবার্তা বলতে তাঁকে কেউই কখনো দেখেননি। তবে আসা-যাওয়ার কারণে সাধু-ব্রহ্মচারীরা কেউ কেউ চিনতেন তাঁকে। অনেকে তাঁকে পরামর্শও দিতেন যাতে তিনি মাতাঠাকুরানীর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। হারাণচন্দ্র কিন্তু নিশ্চল ছিলেন বরাবর। কিন্তু লক্ষ করা যেত, তাঁর ভগবদ্‌ভাবে তন্ময়তা যেন উত্তরোত্তর বাড়ছে। মায়ের চরণপ্রান্তে এসে পতিত হতেন—নীরবে উঠে বাড়ি চলে যেতেন। কেউ কিছু বললে, মৃদু হেসে সামান্য দু'এক কথায় জবাব সেরে দিতেন। দীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও ঐ একই ভাব দেখা যেত। কখনও বা এমন একটা ভাবের প্রকাশ লক্ষ করে সকলে অবাক হতেন,—তার বক্তব্য ছিল যেন এই: 'দীক্ষা আমার হয়ে আছে বলেই তো এতোদিনে ইষ্টদর্শন করতে পারছি!' অবশেষে একদিন সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিলেন মা নিজেই,— সকলেই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন সেদিন। হারাণচন্দ্র এসে মাতৃপদে লুণ্ঠিত হয়েছেন—অন্তর্যামিনী সারদা স্মিতমুখে শেষ কথাটিকেই আশীর্বাণীস্বরূপ শুনিয়ে দিলেন: 'বাবা, এই তোমার শেষ জন্ম'। হারাণচন্দ্রের উত্তর জীবন মোক্ষপ্রদায়িনী দেবীর শ্রীমুখের কথারই সজীব ব্যাখ্যা বলে মনে হ'ত সবার কাছে।

অনুরূপ আরও একজনের কথা প্রসঙ্গতঃ মনে আসছে। জয়রামবাটীর অদূরে

কোয়ালপাড়া গ্রামের হরিপদ মাঝি তাঁদের কুলগুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত। শ্রীশ্রীমা তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন,—একদিন সহসা এক অদ্ভুত আদেশ করে বসলেন, "তোমার ইষ্টমন্ত্রটি উচ্চারণ করে শুনাও তো আমাকে।" হরিপদ অসঙ্কোচে মায়ের আদেশ পালন করা মাত্রই—সম্মুখে দাঁড়ানো দেবী সারদাকে দর্শন করলেন, অশেষমহিমান্বিতা শ্রীদুর্গারূপে। ইষ্ট সাক্ষাৎকার অমন আচম্বিতে হওয়া মাত্রই তিনি মায়ের শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করেন।

আর একটি আশ্চর্যজনক কিন্তু অত্যন্ত ভাবদ্যোতক ঘটনা, আমরা জেনেছি 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' গ্রন্থ থেকে। বরিশালের শ্রীপ্রেমানন্দ দাশগুপ্ত—শ্রীশ্রীমার কথা কিছুই জানতেন না, কারও কাছে শোনেনও নি—তাঁর কোন ছবি পর্যন্ত দেখেন নি। অবশ্য ছবি তখন খুবই দুষ্প্রাপ্য বাইরে কোথাও প্রকাশিতই হয়নি তখনও পর্যন্ত। বরিশালে আছেন শ্রীদাশগুপ্ত। একদিন গভীর রাত্রে একটা স্বপ্নের প্রবল প্রভাবে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাপারটি তখন বুকের মধ্যে আলোড়ন তুলছে—যেন তখনও পর্যন্ত একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তাঁর কানে বেজেই চলেছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন—কোনও এক মানবীরূপিণী দেবী তাঁকে ডেকে বলছেন, 'তুই এখনও বসে আছিস? তোর যে বয়স হয়েছে! এখন শুভ সময়। আমি কত কষ্ট করে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসেছি—আয়, আমার সঙ্গে চলে আয়!'

কিছুদিন পরেই পূজার ছুটিতে দাশগুপ্ত মশাই বেড়াতে বেড়াতে মায়ের বাড়ির সদর দরজায় গিয়ে হাজির হতেই দেখেন, এক নারীমূর্তি স্নানে যাচ্ছেন। হতচকিতের মতো ঐ মূর্তির সম্মুখে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন এবং লজ্জা-সম্ভ্রমহীন অপলক দৃষ্টিতে তিনি স্বপ্নদৃষ্ট সেই মানবীমূর্তিখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপরিচিত এক আগন্তুক পুরুষকে দেখে, মা কিন্তু কিছুমাত্র বিস্ময় বা সঙ্কোচ প্রকাশ তো করলেনই না, পরন্তু অত্যন্ত স্নেহমধুর কণ্ঠে, যেন চিরপরিচিত এবং বহু-অপেক্ষিত আত্মীয়জনের উদ্দেশে বলে ওঠেন: "বাবা এসেছ? আমি তোমারই জন্য অপেক্ষা করছিলুম। যাও যাও, এখুনি স্নান করে এই ঘরে এসে বোস। আমিও স্নান করে আসছি—পরে তোমাকে ডেকে নেব!" প্রেমানন্দ দাশগুপ্তকে মা এমনই এক অভিনব প্রণালীর মধ্যে আকর্ষণ করে টেনে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

আমরা শুনেছি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মুখে—শ্রীশ্রীমা যখন উদ্বোধনে খুবই অসুস্থ, কাউকেই দর্শন করতে দেওয়া হচ্ছেনা—দর্শনাদি একেবারেই বন্ধ, তখন

একদিন এক পারসী যুবক এসে উপস্থিত—দর্শনার্থী। যুবকটি নিচে বসে থাকলেন—তাঁকে দোতলায় যেতে দেওয়া হল না। মায়ের কাছে যুবকের আগমনসংবাদ জানানোর কোন প্রশ্নই ছিল না—তাই কিছু জানানো হয়ও নি। এদিকে আশ্চর্যের কথা—মা সহসা একজনকে ডেকে বললেন, নিচে একটি ছেলে বসে রয়েছে বহুক্ষণ ধরে তাকে উপরে নিয়ে আসতে। "আমার কাছে এনে দাও তাকে।" যুবকটিকে মায়ের পদপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হ'ল,—কিন্তু স্বামী সারদানন্দ তখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেন নি। যুবকটিকে মা একাই কাছে পেতে চাইলেন,—অপর সকলে ঘরের বাইরে সরে গেলেন। যুবক কিছুক্ষণ বাদে নিচে নেমে যাওয়াতে, তাঁর মুখশ্রীর ও চেহারার অদ্ভুত উজ্জ্বলতা দেখে সকলেই স্তম্ভিত ও বিস্মিত তখন। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, যুবকের সুপ্ত মনোবাঞ্ছা মা পূর্ণ করে দিয়েছেন,—পার্সী যুবকটি মার চরণাশ্রয় লাভে ধন্য হয়েছেন। মা তাঁকে এই ভাবেই মন্ত্রদীক্ষা দান করেছিলেন। সেদিনের সেই পার্সী যুবকটি আর কেউই নন্,—চিত্রজগতের সুপ্রসিদ্ধ নট ও প্রযোজক, বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা সোরাব মোদি। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পরে এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য করেছিলেন—"মার যদি এক পার্সী শিষ্য করার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তা'হলে আমার আর কি বলার আছে?"

সেদিনের সেই পার্সী যুবক—উত্তরকালের প্রবীণ চিত্র-প্রযোজক শ্রীসোরাব মোদি একবার চক্ষুচিকিৎসার্থ যখন বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন, তখন মিশন-আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। ঘনিষ্ঠতা সূত্রেই সোরাবজী ভাই-র কাছে নিরাময়ানন্দজী তাঁর দীক্ষালাভের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার সুযোগ পেয়েছিলেন একদিন। সোরাব মোদি আবেগভরে সেই অতীত দিনের পুণ্য স্মৃতিচারণ করেছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দের কাছে। তিনি যা' বলেছিলেন, আমরা নিরাময়ানন্দজীর মুখে তা'ই শুনেছিলাম। নিরাময়ানন্দজীকে তিনি বলেছিলেন:

"যদিও মা আমার ভাষা বুঝতেন না, এবং আমিও মায়ের ভাষা জানতাম না,—কিন্তু আমার আন্তরিক জিজ্ঞাসা ও আকুতি তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। ভাষা আমার দীক্ষার সময়ে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মা বাংলাতেই যা বলার বলেছিলেন। আমার তা' বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি এবং আমার বক্তব্যও মায়ের বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি দেখেছি। কারণ তিনি ছিলেন অন্তর্দর্শিনী। আর তাঁর ভালবাসার কথাই বা কি বলব! মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার

সময় আমি মাকে বলেছিলাম, 'যাই মা'। আমাকে অবাক করে দিয়ে মা বলেছিলেন, 'যাই বলতে নেই বাবা, আসি বলতে হয়।' মায়ের এই ছোট্ট কথাটি শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কী অদ্ভুত ভালবাসা মাখানো কথা! বস্তুত মাকে আমার মনে হয়েছিল মা Wonderful and Beautiful।"

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, সোরাবজীর ইংরেজী কথাকেই নিরাময়ানন্দজী তাঁর মুখের ভাষায় পুনরুক্তি করেছেন। তবে 'Wonderful and Beautiful' কথাটিকে ভাষান্তরিত তিনি করেন নি।

শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত লিখিত 'শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী' গ্রন্থে দু'টি বালকের কথা আছে, যারা শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য বলে অবশ্যই পরিগণিত হবে। একটি বালক বছর বারো বয়স হবে—একদিন উদ্বোধনে এসে মাকে প্রণাম করেই কাঁদতে শুরু করে। কাঁদছ কেন? কাঁদছ কেন? সবাই জানতে চাইছে। এক উত্তর 'মায়ের কৃপা চাই'। সকলেই ভাবল—ছেলেমানুষী। হাতে মিষ্টি দিয়ে বিদায় করে দিল তাকে। পরের দিন খুব ভোরে এসে উদ্বোধনের বাইরের দিকে রোয়াকে একা একা বসে আছে ছেলেটি। মাকে কিন্তু কেউই সে-কথা জানায়নি, —বা সকলের চোখেও পড়েনি ছেলেটিকে। মা কিন্তু রাধুকে চুপি চুপি বললেন: "নিচে গিয়ে দেখবি, রাস্তার ধারে রোয়াকে বসে আছে একটা ছেলে। তাকে আমার কাছে নিয়ে আয় সঙ্গে করে"। রাধু যথা আদেশ পালন করে। ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে শ্রীশ্রীমা মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন অতি গোপনে। কিন্তু সামান্য ঐ এক রতি বালককে মন্ত্র দেওয়াতে গুঞ্জন উঠল মায়ের বাড়িতে। অনুযোগ শুনে মা জবাব দিয়েছিলেন: "তা যা' হোক বাপু, ছেলেমানুষ—কাল তো অমন করে পায়ে ধরে কাঁদলে! কে ভগবানের জন্য অমনটি কাঁদছে বল দেখি? এ মতি ক'জনের হয়?"

একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময়ে রাঁচি থেকে একটি বালক জয়রামবাটী এসেছিল কারও সঙ্গে। পূজার মধ্যে মা খুবই ব্যস্ত থাকায় বালকটিকে কেউই সাহায্য করতে পারেন নি মার সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে বা আলাপ করিয়ে দিতে। পূজা হয়ে গেলে সকলেরই ফেরার পালা। চলে যাবার দিন খুব ভোরেই ভক্তেরা একে একে মার ঘরে গিয়ে তাঁর চরণ-বন্দনা করে আসছিলেন। সবার শেষে সেই বালক একাকী মার ঘরে ঢুকে যায়—এবং মায়ের পাদপদ্মে মাথা রেখে অশ্রুজল ফেলতে থাকে। মার পা ভিজে গেল বালকের চোখের জলে। মা তার হাত ধরে উঠিয়ে বললেন, "কাঁদছ কেন বাবা? কি চাও—মন্ত্র নেবে?" বালক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তখনও

কাঁদছে—মুখে কোনও কথা বলতে পারছিল না। মা কিন্তু তার কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করেই, তক্ষুণি সকলকে ঘরের বাইরে চলে যেতে আদেশ দেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন মা নিজ হাতেই। বালকের নয়নবারি মুছিয়ে, কাছে টেনে বসিয়ে তার কানে মহামন্ত্র দিয়ে দিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত বালক পরমানন্দে নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—কোনও দিকে আর তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

জগৎকে ত্রাণই যাঁর কর্ম, তিনি কোন্ বিধিনিয়মের অনুসরণ করবেন? তাই তাঁর গুরুশক্তি প্রকটনের ব্যাপারেও এমন সব বৈচিত্র্য সমুজ্জ্বলতা আমাদের দৃষ্টিকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে—রুদ্ধবাক্ করে তোলে। স্থান-কাল-ভাষা-জাতি-পরিস্থিতি কিছুই অন্তরায় হতে পারে না এই দুর্বার গুরুভাব সঞ্চারণার পথে।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে দেবী সারদা কোনও রেল ষ্টেশনে এসে পৌঁছেছেন মাত্র,—ট্রেনের কামরায় মা উঠে বসেছেন। এমন সময় দক্ষিণ ভারতীয় কোনও ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে এসে কামরায় দেবীর কাছে কৃপাপ্রার্থী হন। বাইরে তখন বৃষ্টি হচ্ছে, ট্রেন ছাড়তেও বড় বেশী সময় আর বাকী নেই। কৃপার সমুদ্র তখন উদ্বেল। সবলেই সবিস্ময়ে দেখলেন, শ্রীশ্রীমা কখন্ নেমে গিয়ে, বৃষ্টির জলে নিজ করকমল দু'টি ধুয়ে নিয়েই রেল ষ্টেশনে দাঁড়িয়েই তড়িত বিদ্যুতের গতিতে সেই আগন্তুক ভক্তটিকে দীক্ষা প্রদান করলেন। কৃতকৃতার্থ ভক্তটি ঐ বৃষ্টিসিক্ত প্লাটফর্মেই মায়ের চরণে আভূমি দণ্ডবৎ পতিত হলেন!

এ-ছাড়াও আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয়া ভানুপিসী-প্রদত্ত তথ্য আছে: শ্রীশ্রীমা একবার জয়রামবাটীতে পাশাপাশি শায়িত অবস্থাতেই একটি গ্রাম্য মেয়ে—তাঁর বাল্যসখীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী—প্রভু মহারাজের মুখেও এই ঘটনাটি শুনেছি আমরা। তাঁর স্মৃতি: "...একবার একটি মহিলা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এই মহিলাকে ছোটবেলা থেকেই মা চিনতেন, একসঙ্গে খেলাধুলোও করেছেন। দুপুরবেলা খাওয়ার পরে একসঙ্গে মায়ের ঘরে পাশাপাশি শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। এই অবস্থাতেই মা তাঁকে দীক্ষা দিলেন।"

একবার জয়রামবাটীতে ছাঁচতলায় দণ্ডায়মান—অকস্মাৎ এক নবাগত ভক্ত এসে মার চরণে পতিত হ'ন। মা তাঁকেও ঐ ছাঁচতলায় দাঁড়িয়েই মন্ত্র দিয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য: 'শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী'—মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত)

স্বামী ঈশানানন্দ—বরদা মহারাজ-কথিত একটি অক্ষয়-স্মৃতি। দেবী সারদার অভয়া ও জ্ঞানদা রূপের যুগপৎ সম্মিলন একটি মাত্র ঘটনা-চিত্রেই। কোয়ালপাড়া

জগদম্বা আশ্রম থেকে বেরিয়ে শ্রীশ্রীমা একদিন খুব ভোরেই যাত্রা করেছেন রাধুর বাড়ির দিকে। সঙ্গে সেবক ব্রহ্মচারী বরদা। মাঠের পথে মা চলেছেন। সহসা ঐ মাঠের মাঝেই দেখা সুরেশ চৌধুরী নামে একটি ছেলের সঙ্গে—পুলিসের নজরবন্দি থেকে সত্ত ছাড়া পাওয়া। স্বদেশী যুগে এ-রকম ছেলেদের প্রতি পুলিশের কড়া নজর থাকত। ছেলেটি ভীত সন্ত্রস্ত পদে মায়ের পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে—করুণ মিনতি, তাঁকে যেন মা কৃপা করে দীক্ষা প্রদান করেন। মা ছেলেটির মিনতি শুনেই করুণায় অধীর হয়ে পড়েন। সেবককে মা আদেশ করলেন, কাছের ঐ পুকুর থেকে একটি গেলাসে করে একটু জল আনতে। জল আনা হলে, ব্রহ্মচারী সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, "আসন এনে দেব কি?" মা বললেন "না থাক্। আর যেতে হবে না। দু'টো খড় দাও, আমরা দু'জনে বসি।" সেবককে একটু দূরে সরে থাকতে নির্দেশ দিয়েই মা একটি খড়ে নিজে ও অপরটিতে সেই ছেলেটিকে বসতে বললেন। পরে আচমনান্তে শ্রীশ্রীমা তাকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষান্তে মায়ের আদেশে মায়ের বাড়ি থেকে একটু মিছরি এনে দেওয়া হলে, মা তা ঠাকুরকে নিবেদন করে, পরে ওতে নিজের জিহ্বা স্পর্শ করে প্রসাদ করে ছেলেটির হাতে দিলেন। দীক্ষান্তে যুবকটি শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বিদায় নেয়।

শ্রীশ্রীসারদা দেবী যখন স্থূলদেহে প্রকট ছিলেন, তখন তাঁর এবম্প্রকার গুরুশক্তির প্রকাশব্যঞ্জক ঘটনাবলী বহুবিদিত না হলেও বিরল বা স্বল্প-জ্ঞাত ছিল না। তাঁর লীলাবসানের পরেও কিন্তু মানবসন্তানের প্রতি দেবীর দক্ষিণামূর্তিতে আবির্ভাব বা প্রকাশ মোটেই স্তব্ধ হয়ে নেই। "কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" জগৎপাবনী গুরুশক্তি নিত্য,—দেবী সারদার জ্ঞানদা গুরুমূর্তিও তাই শাশ্বতকালের জন্যই ভাস্বর। কেন, কোন্ যুক্তিতে, এ-সব প্রশ্ন অবান্তর এখানে,—যা ঘটে চলেছে তাকে বরণ করে লওয়াই শ্রেয়ঃ। যুক্তি-তর্কের যেখানে অবসান—আধ্যাত্মিকতার সূচনা সেখান থেকেই। "End of philosophy is the beginning of religion."—আপ্তবাক্য এই-ই। এখনও অবধি সারা পৃথিবীতে এমন কতো ঘটনাই অহর্নিশ ঘটছে, যাতে উপলব্ধির বাকী থাকে না যে শ্রীশ্রীমা গুরুরূপে রক্ষাকর্ত্রী,—জ্ঞানদায়িনী মূর্তিতে সদা জাগ্রতা। এখনও কতো ভাগ্যবান-ভাগ্যবতী মার অশরীরী কণ্ঠে মন্ত্রদীক্ষাও পাচ্ছেন—শোকে সান্ত্বনা লাভ করছেন, সঙ্কটে পথের নির্দেশ পেয়ে বিপন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন।

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যজীর কাছে জানা গেছে এমনই একটি উদ্দীপনাকর

সংবাদ। প্রসিদ্ধ মণীষী অধ্যাপক পি. বি. জুন্নারকর বোম্বাই থেকে ঢাকা এসেছিলেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কর্মে ব্রতী হয়ে। তিনি মাঝে মাঝেই এক অপরিচিতা মাতৃমূর্তির সাক্ষাৎকার পেতেন স্বপ্নকালে। জানতেন না ঐ স্বপ্নচারিণী কে,—বুঝতে পারতেন না ঐ মাতৃরূপধারিণীকে। অধ্যাপক জুন্নারকর একদিন ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে আগমন করেছেন। মঠের মন্দিরে স্থাপিত বেদীতে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর প্রতিকৃতিখানিকে দর্শন করেই চমকিয়ে উঠেছিলেন জুন্নারকর। তাঁর এতোদিনের ঘোর কেটে যায় ঐ এক পলকের দর্শনেই। তাঁর বুঝতে বাকী থাকে নি যে, মন্দিরে সংস্থাপিত এই মা-ই এতোকাল যাবৎ তাঁকে সাক্ষাৎকার দান করে, তাঁকে অপার্থিব আনন্দের অধিকারী করেছেন। চিনলেন তিনি তাঁর স্বপ্নে-দেখা মাতৃমূর্তিকে।

ঘটনাটি কিন্তু শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর স্থূল অপ্রকট হবার অনেক পরের।

* * *

অখিল গুরুশক্তি এবং বিশ্বমাতৃত্ব এই উভয় ভাবের সম্মিলিত উপাদানে গড়া তনু শ্রীসারদা দেবীর। তাই-ই তো এখানে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ এবং মাতা-সন্তান সম্পর্ক,—এই দুই সূত্রেই গ্রথিত হয়েছে পারস্পরিক নির্বন্ধ,—পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসে যা অভিনব ও অভূতপূর্ব তো বটেই—গভীর ভাবদ্যোতকও। সন্তান কথা বলেন এক ভাষায়, মায়ের অন্য ভাষা,—কিন্তু একটি আশ্চর্য দিব্যভাষা তথাপি বিদ্যমান ও ক্রিয়াশীল, যার সাহায্যে সন্তান তার সকল অনুভূতিকে ও ধারণাকে মায়ের কাছে ব্যক্ত করছেন, মা-ও সন্তানের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিচ্ছেন তাঁর বক্ষ-উৎসারিত প্রতিটি আশিস্‌-কণাকে। তৃতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত—অনুবাদক বা দোভাষী কেউই নেই। তবুও মাতা-পুত্রের আদান-প্রদান অবাধ ও অব্যাহত দেখা গেছে সর্বত্র। এ-ও এক অঘটন-ঘটনকুশলতা নয় কি দেবী সারদার? তাঁর সর্বব্যাপী ও সর্বাবগাহী জ্ঞানদা গুরুশক্তি তথা মাতৃত্বেরই পরিচায়ক অবশ্য অবধার্য।

কর্ণেলিয়াস্‌ হেরম্‌—হল্যাণ্ডের এক তরুণ—আমেরিকা প্রবাসী—১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বারে ভারতে এসে প্রায় বছর ছয়েক ছিলেন। ঐ কালের মধ্যে ১৯১১-র কোন সময়ে তিনি কলকাতায় শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর কাছে মন্ত্রদীক্ষালাভে ধন্য হন। উত্তর জীবনে ইনিই শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলের বহুমানিত সন্ন্যাসী স্বামী অতুলানন্দজী—গুরুদাস মহারাজ। খুবই উচ্চকোটীর মহাত্মা—একজন সুউন্নত

বৈদান্তিক বলে তিনি অত্যন্ত ভক্তিভাজন ছিলেন সকলের কাছে। পুরাতন স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মাতৃচরণে স্থানলাভের কথা আবেগজড়িত কণ্ঠে বলতেন। শ্রীশ্রীমা তাঁকে মন্ত্রদানের পরেই বলেছিলেন, "ছাখো বাবা, মন্ত্র সব সময়েই মনে মনে জপ করতে পারা যায়। তবে জপের ঠিক ঠিক ফল পেতে হলে, সময় করে নিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসে ইষ্টের ধ্যান এবং মন্ত্রার্থ ভাবনা সহ ইষ্টমন্ত্র জপ তোমাকে করতেই হবে।"

গুরুদাস মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, দীক্ষাকালে তাঁর কীরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল? বিশেষ করে তিনি বাংলা বুঝেন না এবং দীক্ষাদাত্রী মা ইংরেজী বলতে পারেন না,—কীভাবে সেই দেওয়া-নেওয়ার অনুষ্ঠানটি নির্বাহ হয়েছিল? প্রশ্নের জবাবে গুরুদাস মহারাজ যা' বলেছিলেন, প্রণিধানযোগ্য কথা সেটাই.— আমাদের উল্লিখিত মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি হবে তাতেই। তিনি উত্তরে জানিয়েছিলেনঃ 'একটি শিশু যখন মায়ের কোলে বসে, তখন দুজনে কোন্ ভাষায় কথা হয়? ঠিক অমনটিই ছিল আমার দীক্ষাকালের অভিজ্ঞতা—আমার বোধ হচ্ছিল সারা জগৎ-সংসার কোথায় বিলীন হয়ে গেছে—আমি যেন মায়ের কোলে ছোট্ট একটি শিশু। আমি তখন একটা ভাবের ঘোরে ছিলাম—কোনও রকম সংশয় আমার ছিল না।' "When a child sits on it's mother's lap, in which language do they converse? Similarly I felt at that time as though the whole world were dissolved, and I was a small baby sitting on the lap of my mother. I felt inebriated and I had no doubts". [—'With the Swamis in America and India'—Swami Atulananda, pp. 10]

একটি চিরন্তন সত্যের পুনরুচ্চারণ শোনা গেল গুরুদাস মহারাজের উক্ত সরল কথাগুলিতে—মা-ছেলের সহজ আত্মিক সংযোগের কাহিনী। মায়ের চোখের দৃষ্টিপাতই সন্তানের পক্ষে অনাহত বেদবাণী,—সন্তানের অস্ফুট স্বরই মায়ের কাছে সোচ্চার স্তবগাথা। সুতরাং এই অব্যক্ত ভাষার শক্তি অমেয় এবং অনির্বচনীয়।

জনসন নামে জনৈক মার্কিন যুবক শ্রীশ্রীমা যখন মাদ্রাজে তখন তাঁর চরণাশ্রয় লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ইনি পরে অমৃতানন্দ নামে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পরিচিত ছিলেন। তা' ছাড়াও ড. হ্যালক ও কুমারী গ্রে (পরে শ্রীমতী হ্যালক) নামে আরও দু'জন আমেরিকান শ্রীশ্রীমার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তের কথা জানা যায়। কেবলমাত্র অভারতীয়দের ক্ষেত্রেই নয়, বঙ্গভাষাভাষী নয় এমন কত শত এতদ্দেশীয় ভক্তের

জীবন থেকেও আমাদের এই জ্ঞানই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে যে, দেবী সারদা সত্য সত্যই সর্বমানবের মাতা—সবারই মা।

'Vedanta Kesari', December 1973-তে প্রকাশিত ভগিনী সুনন্দাদেবীর "Reminiscences of Sri Sarada Devi" নিবন্ধটি আমাদের উক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করে। লেখিকা মহীশূর রাজ্যের বিশিষ্ট ভক্ত ড. পি. বেঙ্কটরঙ্গম-এর কন্যা এবং স্বয়ং শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষিতা। কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে ১৯১৮-র জুন মাসে তিনি মাতৃচরণে আশ্রয় পেয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্যা এই সুনন্দাদেবীর লেখা থেকে জানতে পারা যায়, শ্রীশ্রীমা যখন দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিলেন, তখন মাদ্রাজ থেকে ব্যাঙ্গালোরেও তাঁর আগমন হয়েছিল এবং সেখানে বাসভনগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ঠাকুরঘরেই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেটা ছিল ১৯১১-র মার্চ মাস। প্রতিদিনই বহু দর্শনার্থীর ভীড় হত সেখানে এবং শ্রীশ্রীমাও সকলকে আশীর্বাদ জ্ঞাপন করতেন। সুনন্দা দেবীর গর্ভধারিণী, শ্রীমতী বেঙ্কটরঙ্গমও একদিন মাতৃ-দর্শনে এসেছিলেন এবং বেশ কিছু সময় তিনি মায়ের সন্নিধানে কাটিয়েছিলেন। তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স্কা বালিকা সুনন্দাও তাঁর নিজ জননীর সঙ্গে ছিলেন তখন। সুনন্দা তাঁর স্মৃতিচারণায় সেই অবিস্মরণীয় দিনটিকে উল্লেখ করতে ভোলেননি। তিনি যা লিখেছেন,তাকে হুবহু ভাষান্তরিত করে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

"আমার পরিষ্কার মনে আছে, শ্রীমা এবং আমার মায়ের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল। আমার মা বাংলা জানতেন না, শ্রীমাও তামিল জানতেন না। তবুও দু'জনেই বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে গেলেন; মাঝে মাঝে হাসি কৌতুকও করছিলেন। যেভাবে তাঁরা কথা বলছিলেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, দু'জনেই দু'জনের কথা বুঝতে পারছেন—ভাষার বাধাটা তাঁদের কাছে কোন সমস্যা নয়।"

পরে আর একদিন, সুনন্দার মা-বাবা দু'জনেই এসেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের চরণ-দর্শনে। ভক্ত-দম্পতি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁদের উভয়ের মনোবাসনা নিবেদন করে বলেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের দুই কন্যাকেই শ্রীশ্রীমাতৃপদে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। এ-প্রসঙ্গেও সুনন্দাদেবী লিখেছেন ঃ

"উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেন, তাঁর অনুসরণ করবার পক্ষে আমরা তখন খুবই অল্পবয়স্ক; আমরা যখন বড় হব, তখন যেন তাঁর কাছে আসি।"

হ্যাঁ, অবশ্যই সুনন্দা বড় হয়ে ঠিকই এসেছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে নিবেদিত

হতে,—শ্রীশ্রীমাও তাঁকে আশ্রয়দানে ধন্য করেছিলেন। সুনন্দা স্বীকার করেছেন, ততোদিনে তিনি কাজ চালাবার মতো বাংলা বলতে শিখে গিয়েছিলেন।

মার সন্তান জগৎ-জুড়ে। স্থান-কাল-পাত্রে ভেদ, জাতি-ভাষা-ভাবনার ভিন্নতা মার চোখে নিতান্তই অবাস্তর ও অর্বাচীন। শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত সন্তানের জীবনের শ্রেয়ের বিন্দুতে,—তার পারমার্থিক সত্তাতেই মাত্র। তাই তিনি বাহ্যিক কোনও পরিস্থিতিকে বা পরিস্থিতিকে—পারিপার্শ্বিকতাকে বা ঘটনাবলীকে কখনও মুখ্য স্থান দিতেন না। অখিল জগৎগুরুশক্তির অতি সাধারণ লৌকিক আচরণের মধ্যেও একটা অনন্যসাধারণ অলৌকিকত্ব ব্যক্ত হয়ে পড়তে বাধ্য,—দেবী সারদার প্রত্যেক আচার বিচার ও ব্যবহারেও এই সত্যই পরিস্ফুট। অবশ্য সর্বপ্রকার অসাধারণত্ব ছিল সারদা দেবীর মধ্যে অত্যন্ত স্বতঃ ও স্বগত—যেন একান্তই সাধারণ। যতোপ্রকার অতিলৌকিকত্ব তাঁর জীবনে প্রকট ছিল যেন নিতান্তই সহজ—অতি লৌকিক। তাঁর দৈনন্দিন চরিতবৃত্তকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে—এ-ও এক কারণে।

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে সদ্য আগত উচ্চ শিক্ষিত যুবক কর্ণাটকের পাণ্ডুরঙ্গ প্রভু সর্বপ্রথম বেলুড় মঠ দর্শনে এসেছেন। তিনি ঐকালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরবর্তী কালে নিজ মুখে যা' বলেছেন, তার নিষ্কর্ষ হল এই :

"যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। আমি প্রথম বেলুড় মঠে আসি। দু'মাস মঠে থাকার পর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে জয়রামবাটী যাই। এক ভদ্রলোক জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন। স্বামী প্রেমানন্দজী আমাকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে একখানা চিঠিও লিখে দিলেন তিনি। আমরা জয়রামবাটীর পথে বেরিয়ে পড়লাম। হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন রেলে চেপে আমরা চাঁপাডাঙ্গায় পৌঁছালাম।...মনে আছে হাওড়া থেকে বিকেল তিনটে বা সাড়ে তিনটের ট্রেনে চেপেছিলাম, আর চাঁপাডাঙ্গায় পৌঁছেছিলাম রাত সাড়ে আটটা নাগাদ।...সে রাতটা আমরা চাঁপাডাঙ্গা স্টেশনেই কাটালাম।...পরদিন সকালে জয়রামবাটীর পথে হাঁটতে শুরু করলাম।...বেশ গরম ছিল। আমার মনে পড়েনা, দুপুরের খাওয়ার জন্য অথবা বিশ্রামের জন্য আমরা পথে কোথাও থেমেছিলাম কিনা। যা' হোক, আমরা যখন দ্বারকেশ্বর নদ পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে রাতে আর কামারপুকুরে যাবার সময় ছিল না। সে রাতটা আমরা দ্বারকেশ্বরের পাড়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম। অনেক

গাড়োয়ানকেও দেখলাম, বালুর চড়াতে শুয়ে থাকতে। তারা গাড়ি থেকে গোরুগুলোকে খুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

"পরের দিন খুব ভোরে উঠে আমরা কামারপুকুরের দিকে রওনা হলাম। কামারপুকুরে পৌছাতে দশটা বেজে গেল।...আমরা হালদারপুকুরে স্নান করে খেয়ে নিলাম এবং একটু বিশ্রামের পর জয়রামবাটী রওনা হলাম। আমরা যখন জয়রামবাটীতে পৌছালাম তখন বিকেল চারটে কি সাড়ে চারটে।...মায়ের নতুন বাড়ির সংলগ্ন বৈঠকখানা ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হ'ল। মা তখন থাকতেন তাঁর পুরানো বাড়িতে। আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বাড়ির উঠানে ঢুকে দেখি মা বারান্দায় বসে রাত্রের রান্নার জন্য তরকারি কাটছেন। আর কেউ তখন সেখানে ছিল না। পুরুষরা আসছে বলে হয়তো মেয়েরা সব সরে গিয়েছিল। আমরা মাকে প্রণাম করলাম। আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি মাকে স্বামী প্রেমানন্দের চিঠির কথা বললেন। মা একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন চিঠিটা তাঁকে পড়ে শোনাতে। চিঠি পড়া হলে মা বললেন: 'বেশ, কালই ওদের দীক্ষা হবে।' আমরা নতুন বাড়ির বৈঠকখানায় ফিরে এলাম।

"পরদিন আমরা দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। মা সকালবেলা ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষার জন্য আমাদের এক এক করে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের দীক্ষা হয়ে গেল। মা সাধারণত ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষা দিতেন। তবে এ-বিষয়ে তাঁর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না।...

"·কেউ আধ্যাত্মিক উপদেশ-প্রার্থী হয়ে এলে মা তাকে কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। যে এসেছে সে-ই পেয়েছে।"

একটি স্বচ্ছ সরল বিবৃতি। দীক্ষার্থী এক তরুণ ভক্তের আত্মস্মৃতি-কথন,—কোথাও কোন বিস্ময়কর বা কৌতূহলী জিজ্ঞাসার অবকাশ নেই এখানে। সহজ ঘটনার বিবরণ ততোধিক সহজ কথায়। তবুও একটি সূক্ষ্ম বিপ্রশ্নিকা আমাদের মনের কোণে জেগে থাকে। উক্ত বিবৃতিতে ব্যক্ত হয়েছেঃ দীক্ষার জন্য মা প্রার্থীদের একসঙ্গে কাছে ডাকেন নি,—ডেকেছেন 'এক এক করে তাঁর ঘরে'। বিবৃতিকার সেদিনের সেই তরুণ বাংলা জানেন না তখন—ইংরেজী মাধ্যমেই তাঁকে সব বুঝতে ও বুঝাতে হয়। তাহ'লে মার সন্নিকটে যখন তিনি একা উপস্থিত,—তখন কী উপায়ে তিনি মাতৃদত্ত মন্ত্রসহ সাধনোপদেশকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন,—আর মা-ই বা সন্তানের সকল আবেদন-নিবেদনকে বুঝে নিয়ে তাঁকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করেছিলেন? এর উত্তরে যা আমরা জেনেছিলাম—

তা'ও কিন্তু ছিল অতিশয় প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী। মা তাঁর সন্তানের প্রতিটি বক্ষস্পন্দনের ভাষাকে জেনে লন ও তার সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেন চোখের পলকে ;—সন্তানও জননীর প্রত্যেকটি ইশারাকে মুখর শুনতে পান, মায়ের দৃষ্টিও যে তার কাছে প্রোজ্জ্বল বাণীরূপে ফুটে ওঠে। "বুঝে প্রাণ বুঝে যাব"।

সেদিনের মাতৃশরণপ্রাপ্ত সেই যুবক পাণ্ডুরঙ্গ প্রভুই উত্তরকালে রামকৃষ্ণ-মঠাধীশ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ—প্রভু মহারাজ। প্রভু মহারাজ স্বয়ং লোকগুরুর আসনে বৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর দীর্ঘ নবতিপর জীবনে মাতৃময়তা ছিল এক অসাধারণ বিভাব। পরে তাঁর মুখে স্বচ্ছ সুন্দর সরস বঙ্গভাষাও যেন দেবী বাগ্‌বাদিনী সারদারই বরে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যখন তিনি মাতৃ-সকাশে শরণার্থী,—তখন তিনি সম্পূর্ণই অনভ্যস্ত ও অনভিজ্ঞ বাংলা ভাষার আদান-প্রদানে। সে-জন্য তাঁর দুঃখেরও অন্ত ছিল না,—এমন কি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মনের খেদও প্রকাশ করে পত্র লিখেছিলেন। মা তাঁকে উত্তরে লিখেছিলেন (জয়রামবাটী, ৪ জুন, ১৯১৭):

"কল্যাণবরেষু,

"বাবাজীবন প্রভু, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমাকে আমার খুব মনে আছে, বাবা। তুমি সাধু হইয়াছ এবং আমার প্রিয় সন্তান রাখালের[১] কাছে ব্রহ্মচর্য পাইয়াছ জানিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। …রাখালের আদেশ পালন করিয়া চল। আমি বিশ্বাস করি তাঁহার[২] কৃপায় তুমি সমস্ত অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবে। তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে কৃপা করিবেন। প্রত্যহ নিয়মিত ধ্যান জপ করিবে। তাহা হইলে অধ্যাত্ম জীবনে ক্রমশই আগাইয়া যাইবে। কখনও হতোদ্যম হইও না, বাবা।…

"আমি ভাল আছি। তোমাকে স্নেহাশীর্বাদ করিতেছি। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে আমাকে পত্র লিখিবে। বাংলা জাননা বলিয়া দুঃখ করিও না।

"তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং মঠস্থ আমার সকল ছেলেদের আশীর্বাদ জানাইবে। ইতি

"আশীর্বাদিকা

"মাতাঠাকুরানী

"পুনশ্চ: তুমি ইংরাজীতেই পত্র লিখিও— তবে লেখা যেন পরিষ্কার হয়।"

১। স্বামী ব্রহ্মানন্দের। ২। শ্রীশ্রীঠাকুরের।

শ্রীশ্রীমা পত্রখানি কারও হাতে ইংরেজীতেই লিখিয়েছিলেন—আমরা তার হুবহু ভাষান্তরিত রূপ প্রকাশ করলাম এখানে।

(দ্রষ্টব্য : 'উদ্বোধন', ৮৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

দেবী সারদার অপরিমেয় মাতৃত্ব এবং লোকাতীত গুরুশক্তির এক জীবন্ত উদাহরণ আমাদের সম্মুখেই জাজ্বল্যমান দেখলাম। প্রভু মহারাজ তাঁর স্বানুভূতিকে ব্যক্ত করেছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে—তাঁর জীবনের যে 'অদ্ভুত রূপান্তর' সংঘটিত হয়েছিল মাতৃচরণ-স্পর্শে, সে-কথাটিকেও কী মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেখানে। তিনি অত্যাশ্চর্য মাতৃ-বন্দনা রচনা করেছেন,—কিন্তু তা বাস্তবিক পক্ষে হয়ে পড়েছে মাতৃকৃপালব্ধ এক কৃতী সন্তানের সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত! এক অনবদ্য 'অদ্ভুত রূপান্তর' কাহিনী,—গুরুমূর্তি সারদারই দিব্য মহিমা-বৃত্তান্ত। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী লিখেছেন :

"এই লোকোত্তর আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট যাঁহারা স্থিরভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন যে, তাঁহাদের কঠিন জটিল ব্যাধি—বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণা বহুল পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রিয়সুখ যেন বিস্বাদ মনে হইয়াছে—জীবন অতঃপর এক নিরুদ্দেশ যাত্রা না হইয়া একটি গভীর উদ্দেশ্য ও মূল্য বহন করিয়া আনিয়াছে। যে আত্মা নিদ্রায় অচেতন ছিল উহা যেন জাগিয়া উঠিয়া অনন্তের সুদূর অথচ সপ্রেম আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া উহার নিকট পৌঁছিতে ব্যাকুল হইয়াছে। কী অদ্ভুত রূপান্তর।"

('উদ্বোধন', শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যা, পৃঃ ২৩৫)

* * *

"কেউ আধ্যাত্মিক উপদেশপ্রার্থী হয়ে এলে মা তাকে কখনও ফিরিয়ে দিতেন না। যে এসেছে, সে-ই পেয়েছে"—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ যেমন বলেছেন, আরও অনেকের কাছ থেকেও তেমনই শোনা গেছে। কিন্তু এ-কথার মানে এই নয় যে, মা প্রার্থীকে তক্ষুণি তক্ষুণি কৃপা করেছেন সর্বক্ষেত্রেই। মায়ের কৃপাদান পদ্ধতিও যেমন সকলের জন্য ঠিক একই রকম ছিল না,—কৃপা লাভের জন্য প্রার্থীকে কতোক্ষণ বা কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে, তা'ও তিনিই নির্ধারণ করতেন জনে-জনে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে। এ-সম্পর্কেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন প্রার্থীর অভিজ্ঞতা

অভিনিবেশযোগ্য দৃষ্টান্ত হবে এখানে। এদিক থেকে অবলোকন করলেও, শ্রীসারদাদেবীকে সাধারণ গুরু-পর্যায়ভুক্ত মনে তো হবেই না,—সুদুর্বিজ্ঞেয়া স্বতন্ত্র ঈশ্বরী বলেই উপলব্ধি হবে। তিনি কোনও তন্ত্রাধীনা বা কার্য-কারণ-নিয়মানুগতা একজন মনুষ্য-গুরু ছিলেন না, এ কথাটিই অনুভূত হবে বার বার। আবার এমন ঘটনাও বিরল নয় যে, আপাতঃদৃষ্টে বা সাধারণ লোকচক্ষে যাকে অনুপযুক্ত বা অনধিকারী বলেই সবাই মনে করে, এ-রকম কেউ সহসা এসে মায়ের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। কখনও কখনও মাকে এ-জন্য সমালোচনাও শুনতে হয়েছে—কিন্তু মা নির্বিচলা থেকেছেন তাঁর কৃপা বিতরণে। ততোধিক বিস্ময়ের ব্যাপার লক্ষ করা গেছে,—প্রার্থী না হয়েও বস্তুলাভে ধন্য হয়ে ফিরে গেছে কেউ, কিংবা মা দিতে চাইলেও প্রত্যাখ্যান করছে বার বার—প্রত্যাখ্যাত হয়েও মা অযাচিতভাবে তাকেই ইষ্টলাভ করিয়ে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে স্তুতি করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ 'স্বতন্ত্রমীশ্বরম্' এই অভিধাসহ,—দেবী সারদাকেও সেই একই আখ্যায় প্রণতি নিবেদন করতে হয়:

"সারদাং সদা বন্দে স্বতন্ত্রমীশ্বরীম্'।

স্বামী সৎস্বরূপানন্দ—সুকুমার মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে একজন বিদ্বান বিদগ্ধ সন্ন্যাসী। তাঁর দেহাবসানের মাত্র কিছুদিন আগে শয্যাগত অবস্থাতেই তিনি যে স্মৃতি অনুধ্যান করেছিলেন—যা' 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে প্রকাশিত (পৃষ্ঠা ১২৮-১৩১), তা' থেকে কিয়দংশ এখানে উৎকলিত হচ্ছে, আমাদের উল্লিখিত মন্তব্যের নিহিত ভাবকে কথঞ্চিৎ অবধারণের প্রয়াসরূপে।

"আমার এই ক্ষুদ্র জীবন জ্যোতিঃস্বরূপিণী সারদার শতরূপের একটি রশ্মিতে কৃতার্থ। জীবন-সায়াহ্নে সেই ভাস্বর জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতম চিন্ময় সত্তারূপে আজও অম্লান। অব্যক্তা যিনি, অচিন্ত্যা যিনি, ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করার দুর্বল প্রয়াস আমার।

"আমার তখন প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স। কাটিহারে স্কুলে শিক্ষকতা করি, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। একটি মেসে থেকে স্কুলে যাতায়াত করতাম।...সম্প্রতি ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কাটিহারে এসেছেন.. তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়...তাঁর নাম স্বামী জ্ঞানানন্দ, জ্ঞান মহারাজ বলেই পরিচিত। তিনি জয়রামবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদামণি দেবীর সেবা করেছেন অনেকদিন। তাঁর কাছেই শুনলাম শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অনেক অন্তরঙ্গ কথা! মায়ের স্নেহকরুণা কতভাবে ভক্তজনের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। সেইসব কথা শুনতে

শুনতে আমারও ইচ্ছা হ'ল একবার মাকে দেখতে। জ্ঞান মহারাজকে সেকথা বলতে তিনি উৎসাহিত হয়ে সামনের পূজার ছুটিতেই জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন করবার কথা বললেন।

"জ্ঞান মহারাজ নিজে সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন জয়রামবাটীতে, ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পূজার ছুটির সময়। মা তখন তাঁর নতুন বাড়িতে ছিলেন। সেখানেই বাড়ির বাইরের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হ'ল। মনের মধ্যে অনেক কল্পনার ছবি এঁকে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম। জ্ঞান মহারাজ বাড়ির ভিতরে গিয়ে খবর দিয়ে আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। রামময় মহারাজ তখন মায়ের সেবক হিসাবে সেখানেই ছিলেন।…তিনিই আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মা তখন তাঁর ঘরে চৌকিতে বসে ছিলেন পা ঝুলিয়ে। আমি মাকে প্রণাম করলাম। …তাঁর মধ্যে তখন কোনও দেবীভাব আমি বুঝতে পারিনি · তিনি নিজে ধরা না দিলে, নিজের স্বরূপ নিজে না প্রকাশ করলে তাঁকে বোঝে কার সাধ্য? 'মায়য়া বহুরূপিণী'। নিজের স্বরূপ মায়ায় আবৃত করে রেখেছেন। আর আমার দৃষ্টি ও বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করেছেন। তখনও সময় হয় নি বোধ হয় আমার।

"শুনলাম মায়ের শরীর অসুস্থ। জ্ঞান মহারাজের ইচ্ছা ছিল সেই বারই মায়ের কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিই। কিন্তু মা বললেন: 'বাবা, এখন শরীরটা ঠিক নেই, পরে হবে।' আমার মনও হয়তো দীক্ষার জন্য ঠিক তৈরী হয়নি। তাই ছলনাময়ী মা অসুস্থতার ছল করে আমাকে তখন গ্রহণ করলেন না। সেবার কয়েকদিন ছিলাম। মাকে ঘরোয়া পরিবেশে, সংসারের নানা কাজকর্মে দূর থেকে অনেকবার দেখলাম। কিন্তু মনে সত্যি কোনও উচ্চ ভাবের অনুভূতি টের পেলাম না। তবু মা যে স্নেহময়ী, করুণাময়ী, নিকটতম কোন আত্মীয়ার মতো—এই বোধটুকু হয়েছিল। বিদায় নেওয়ার সময় যখন প্রণাম করে চলে আসছি…মা তখন পূজার আসনেই বসে ছিলেন।…ফিরে এলাম কর্মস্থলে। কিন্তু মন মাঝে মাঝে জয়রামবাটী ছুটে যেত।

"জ্ঞান মহারাজ কিন্তু আশা ছেড়ে দেননি। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সেই বছরই বড়দিনের ছুটিতে আবার জয়রামবাটী গেলাম। এবারও নতুন বাড়ির বাইরের ঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। রামময় মহারাজই আবার আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। মাকে প্রণাম করার পরেই এবার কিন্তু তিনি এমন একটা মনের ভাব প্রকাশ করলেন, যেন আগের বারে তাঁর অসুস্থতার জন্য দীক্ষা হ'ল না, এবার তা হয়ে গেলেই ভাল। অপ্রত্যাশিত মায়ের ইচ্ছা আমার মনে দারুণ আলোড়ন

সৃষ্টি করল। আমি সানন্দে আমার বাসনা মাকে নিবেদন করতে, পরদিনই তিনি দীক্ষার দিন স্থির করলেন। পরের দিন সকালে পুণ্যপুকুরে স্নান করে অনাস্বাদিত-পূর্ব বিচিত্র এক অনুভূতি হৃদয়ে নিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলাম। দীক্ষার জন্য আমার কোনও প্রস্তুতি ছিল না। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যাই নি। অকিঞ্চন আমাকে মা তাঁর ঘরে, তাঁর পাশে বসিয়ে মহামন্ত্র দান করলেন। দীক্ষাব পরে আমাকে দিয়ে তিনবার জপ করিয়েও নিলেন। ঠিক সেই সময়ে আমার চোখের সামনে থেকে একটা অদ্ভুত পর্দা সরে গেল। 'মোক্ষদ্বার-কপাট পাটনকরা' করুণাময়ী মা কি করলেন জানি না। কিন্তু আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই আমার ইষ্টমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তাঁর মধ্যে দেখলাম। তিনবার দেখলাম। আমাকে অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মা বলে উঠলেন ঃ 'কি দেখছ বাবা ? যা দেখছ ঠিকই দেখছ।' কৃপাসুমুখী মা আমার চোখের আবরণ সরিয়ে দিয়ে নিজের স্বরূপটি মেলে ধরলেন। অনন্তরূপা সারদার বরাভয়া মূর্তি আমার সামনে প্রকাশিত হল। সর্বাঙ্গ শিহরিত, বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ আমাকে মা বললেন: 'বাবা, দক্ষিণা দাও।' আমার সঙ্গে তো কিছুই ছিল না। তখন মা=ই দেখিয়ে দিলেন ঘরের কোণে কয়েকটি ফল রয়েছে। তার থেকেই একটি তুলে এনে তাঁকে দিতে বললেন। যন্ত্রচালিতবৎ সেই ফল তাঁকে নিবেদন করলাম। এ জীবন কৃতার্থ হল। এই মানুষজন্ম সার্থক হল! প্রণাম করে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম: এ কি হল ?

"সেদিন দুপুরে সব ভক্তদের সঙ্গে মায়ের ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেতে বসেছি। আমি নবাগত, একটু লাজুক স্বভাবের, তাই পঙ্‌ক্তির একেবারে শেষেই বসেছি। পরিবেশন শুরু হতেই দেখলাম, মা এসে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়ালেন। একটা হাত চৌকাঠের উপর। কত স্নেহভরে তিনি তাকিয়ে আছেন, সকলকে খাওয়াচ্ছেন। দীক্ষার সময়ের মতো এখনও মাকে সেই বরাভয়া মূর্তিতেই আবার দেখলাম। আমি মাথা নিচু করেই খাচ্ছিলাম। হঠাৎ একজন এসে আমাকে একবাটি পায়েস দিয়ে বললেন: 'মা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।' মুখ তুলে দেখি, মা মৃদুস্বরে বলছেন: 'খাও বাবা, সবটুকু খাও।' তখন আমার খাওয়ার মতো অবস্থা নয়। মায়ের ঐ অপার্থিব স্নেহ, অযাচিত করুণায় আমার চোখ ঠেলে জল আসছিল। আবেগ-উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ, আর সকলের মাঝে আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় আমি সঙ্কুচিত। ধীরে ধীরে প্রসাদ সবটুকু নিঃশেষ করলাম। জীবনের সেই স্মরণীয় দিনের অবিস্মরণীয় ঘটনাটি আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আজও উজ্জ্বল।

"সে-যাত্রা জয়রামবাটীতে আরও কয়েকদিন ছিলাম।…যে-কদিন ছিলাম দু'বেলাই মাকে কখনও তাঁর ঘরে, কখনও বারান্দায় প্রণাম করতে যেতাম। জয়রামবাটী থাকাকালীন মাকে খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবেই দেখি। দেখি তাঁর মানবী ভাবটিই। করুণামিশ্রিত তাঁর জননীভাবই জয়রামবাটীতে প্রকট ছিল।…চলে আসার দিন তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি মাথায় হাত দিয়ে মৃদুস্বরে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন: 'ভাল থাকো বাবা।' সেই স্বর এখনও কানে বাজে।

… … … …

"আমি একটু শুষ্ক-মনের মানুষ। ব্রহ্মশক্তি জগন্মাতৃরূপে এই শরীরকে অবলম্বন করে লীলা করছেন, সাধু-ভক্তদের মুখে শুনেছিলাম, বিশ্বাসও করেছিলাম। কিন্তু নিজের অনুভূতি তখনও তেমন কিছু হয়নি। শুধু মায়ের স্নেহ, আর কি যেন এক অপার্থিব ভাবে পরিপূর্ণ মায়ের মুখখানি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই মুখ সচরাচর দেখা যায় না—এইটুকু মনে হত।…যতবারই মায়ের মুখখানি দেখবার অবকাশ হয়েছিল, শুধু মনে হয়েছিল: এ-মুখ কি মানুষের হয়!

মানুষের শরীরে মানুষের চালচলন নিয়ে যিনি আবির্ভূতা, তাঁর ভিতর অ-মানুষী, অপার্থিব ভাব, দু'একবার ছাড়া বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলেও, তাঁর মুখের সেই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য যে তাঁর আন্তরসত্তার বহিঃপ্রকাশ—এটুকু বুঝতাম।

"আজ জীবনের অন্ত্যলগ্নে জীবন-তরণী ভেসে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণ পারাবারের অভিমুখে। এ-নৌকার হাল ধরে বসে আছেন যিনি, তাঁর মাথার ঘোমটা মাঝে মাঝে সরে গেলে আজও দেখতে পাই সেই মুখখানি। আর সেই ভরসাতেই নিশ্চিন্তে পড়ে আছি তাঁরই মুখ চেয়ে।"

দেবী সারদার 'অ-মানুষী অপার্থিব' গুরুভাবকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্যলাভ করেছেন, তাঁদেরই একজনের মুখে অন্তরঙ্গ স্মৃতি এই রকমই শোনা গিয়েছিল—যাতে প্রকাশিত শ্রীসারদার দিব্য গুরুশক্তির সঙ্গে 'করুণামিশ্রিত তাঁর জননীভাব'-এর অপূর্ব সংমিশ্রিত রূপ। তাঁর সেই রূপ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণেরই গুরুভাবের পূর্ণতম প্রকাশ—যা তাঁর সমগ্র দেহ-মনে স্থির বিদ্যুতের মতোই দীপ্তিমান ছিল।

* * *

অন্ত আর এক চিত্র।

"তোমার দীক্ষা হয়েছে ?"

"না।"

"দীক্ষা নেবে ?"

"ও-কথা জানিনা, ভাবিও না।"

"তবে নাও।"

বিচিত্র কথোপকথন—আশ্চর্য জিজ্ঞাসার আশ্চর্য জবাব! ততোধিক আশ্চর্য-জনক সমাধান—সর্বসংশয়ের নিরসন: "তবে নাও"। অর্থাৎ, বাছা তুমি দীক্ষা গ্রহণ কর—আমি দিচ্ছি তোমাকে। অযাচিত এক মহতী দান দিয়ে অপ্রার্থীর হৃদয়-পাত্রকে ভরে দিয়েছিলেন। এমন সন্তানও আছে, যে কণ্ঠস্বরে জানায়না মাকে, তার স্তন্য-পিপাসার কথা। মা নিজেই বুঝে নিতে পারেন সন্তানের সকল তৃষা, সকল অভাব। আপনিই সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে যেন নিজেরই স্তনভারকে লাঘব করেন। খগেনকেও জননী যেন আপন গরজেই সেদিন কোলে তুলে নিয়েছিলেন—মহামন্ত্র-স্তন্যদানে তাকে কৃতকৃতার্থ করে দিয়েছিলেন।

দুই বন্ধু—জিতেন ও খগেন মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন—কখনও কখনও সেখানে পঞ্চবটীতে কিংবা ঠাকুরের শয়নকক্ষেই রাত্রিযাপন করতেন। রামলালদাদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় তাঁর মুখে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা তাঁরা প্রায়ই শুনতেন—শুনে শুনে ঠাকুরের আবির্ভাব-ক্ষেত্র কামারপুকুর দর্শনের জন্য উত্তরোত্তর তাঁরা আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। একদিন রামলাল-দাদারই কোনও ফরমায়েশসহ খগেনকে যেতে হয়েছিল বরাহনগরে শ্রীমহেন্দ্র কবিরাজের গৃহে। মহেন্দ্র কবিরাজ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা করতেন—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গেও তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন। মহেন্দ্রবাবুর গৃহে ঠাকুরঘর ছিল। খগেনকে তিনি তাঁর ঠাকুরঘরে নিয়ে যান অত্যন্ত সমাদর সহকারে। মহেন্দ্রবাবুর পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ঠাকুরঘরে দু'খানি চিত্রপট দেখে খগেন অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। কিন্তু একখানি চিত্র—তিনি চিনতে পারেন নি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্রের পার্শ্বেই স্থাপিত মাতৃ-মূর্তির পটখানি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত অজানা। মহেন্দ্রবাবুকে কৌতূহলী বালক খগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, "ইনি কে ?" মহেন্দ্রবাবু বলেন—"ইনি আমাদের মা"। খগেনের পুনরায় প্রশ্ন—"ইনি কি জীবিতা রয়েছেন"? "এখন ইনি কোথায় ?" মহেন্দ্রবাবুর কাছে উত্তর পেলেন "ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী—জয়রামবাটীতে আছেন"।

খগেন—উত্তরকালে যিনি স্বামী শান্তানন্দ, তাঁর সেই অতীত দিনের স্মৃতি-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন: "ইতিপূর্বে মায়ের ছবি আমি কোথাও দেখিনি বা তাঁর কথাও কোথাও কারও কাছে শুনি নি।...কিন্তু একবার রাত্রে ঠাকুরের ঘরে এঁকেই আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, কিন্তু 'মা' বলে তখন জানতাম না। আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্তির সঙ্গে মায়ের ছবিখানি অবিকল মিলে যাওয়ায় আমি খুবই আশ্চর্যান্বিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝতে পারলাম।"

শান্তানন্দজীর মুখে আমরা আরও শুনেছি: "এর পর থেকেই মাকে চাক্ষুষ দেখবার জন্য মন খুব ব্যাকুল হতে লাগল। কিছুকাল পরে আমরা উভয়ে জয়রামবাটী ও কামারপুকুর যাব মনস্থ করে দিন স্থির করলাম।"

জিতেন ও খগেন এইভাবেই জয়রামবাটীর উদ্দেশে প্রথম যাত্রা করেন। জিতেনই পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। ওঁরা দুই বন্ধু মিলে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী গিয়েছিলেন—ট্রেনে বর্ধমান, পরে সেখান থেকে গোরুর গাড়িতে উচালন—উচালনের চটিতে রাত্রিযাপন করে পরের দিন কামারপুকুরে। কামারপুকুরে সেই দিন কাটিয়ে পরদিন সকালে জয়রামবাটীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। শান্তানন্দজীর স্মৃতি:

"মা তখন প্রসন্ন-মামার পুরানো ঘরের দাওয়ায় রান্না করছিলেন। যতদূর মনে পড়ে আমরা আলাদা আলাদা এক একজন করে দর্শন করতে তাঁর কাছে গেলাম। আমি যেতে মা আমার সঙ্গে পূর্বপরিচিতের ন্যায় আলাপ করতে লাগলেন, এবং অনেককাল পরে নিজের ছেলেকে কাছে পেলে যেমন আনন্দ হয়, মা ঠিক সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। কী যে স্নেহমাখা স্বরে তিনি আলাপ করলেন তার আর তুলনা মেলে না। আমরা মায়ের জন্য একটি কাপড় এবং বর্ধমান থেকে কিছু মিহিদানা নিয়ে গিয়েছিলাম। মা খুব আনন্দের সঙ্গে সে-সব গ্রহণ করলেন।...পূজনীয় জিতেন মহারাজ মার কাছে দীক্ষা নেবেন এরূপ সঙ্কল্প নিয়েই জয়রামবাটী গিয়েছিলেন। আমার কিন্তু মাকে দর্শন করার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোনও অভিপ্রায় ছিল না। মা একদিন আমাকে বললেন, 'তোমার দীক্ষা হয়েছে?' বললাম 'না'। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দীক্ষা নেবে?' বললাম, 'ও কথা জানি না, ভাবিও নি'। মা বললেন, 'তবে নাও'। পরদিন সকালে পূজার ঘরে পূজার পরে মা আমায় মন্ত্র দিলেন। আনন্দে শরীরটি যেন অন্যরকম হয়ে গেল। পূজনীয় জিতেন মহারাজকেও মা ঐদিনই দীক্ষা দিয়েছিলেন।

দীক্ষান্তে আরও কয়েকদিন জয়রামবাটীতে বাস করে, এবং তারকেশ্বরে তারকেশ্বরকে দর্শন করে আমরা সেবার কলকাতায় ফিরলাম।"

(উদ্বোধন, ৫৩ বর্ষ, ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

পূজনীয় শান্তানন্দজীর দিনলিপিতে লেখা আছেঃ "সন ১৩১৩, ইং ১৯০৬, ১ পৌষ, ১৬ ডিসেম্বর রবিবার আমি ও জিতেনদা দীক্ষা লাভ করেছিলাম।"

জিতেন ও খগেন—ভাবীকালের বিশুদ্ধানন্দ ও শান্তানন্দ দুই আবাল্য সখা সুবিশাল শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবমন্দিরের দু'টি বিশিষ্ট দীপাধার—বিচ্ছুরিত যাঁদের জীবনালোকে শত-সহস্র মানুষের অধ্যাত্ম যাত্রাপথকে সুনির্দিষ্ট করেছে—তাঁরা উভয় একই সঙ্গে মাতৃচরণাশ্রয় লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু দুই স্বতন্ত্র প্রণালীতে। একজন 'মার কাছে দীক্ষা নেবেন এরূপ সঙ্কল্প নিয়েই জয়রামবাটী গিয়েছিলেন' —অপর জনের কিন্তু 'মাকে দর্শন করার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোনও অভিপ্রায় ছিল না।' যিনি দীক্ষা চেয়েছিলেন, তিনি তো পেয়েছিলেনই,—যিনি চান নি, দীক্ষার কথা জানতেন না, ভাবতেন না, তিনিও সমানভাবেই মাব কৃপা পেয়েছিলেন, দীক্ষালাভে ধন্য হয়েছিলেন। দেবী সারদার মোক্ষ-বিতরণ ধারার বিশিষ্টতা এখানেই—তাঁর গুরুভাবের অসামান্যতা বা বৈলক্ষণ্যও এই-ই।

* * *

আবার একটু সহজতর গুরুমূর্তিতে দেবী সারদাকে আমরা দর্শন করেছি অনেকবার। যেমন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ জনদের কেউ বলে দিয়েছেন বা নির্দেশ করেছেন কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে, তিনিও যথা আদেশ সরাসরি চলে গিয়েছেন গুরুসকাশে,—জ্ঞানদা সারদাও অকৃপণ হস্তে কৃপার্থীর মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। এখানে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বামী অভয়ানন্দের—ভরত মহারাজের,- উত্তরকালে যিনি বেলুড় মঠের সঞ্চালক-রূপে বহুমানিত—বহুজনের আশ্রয়স্থল।

কলকাতায় বলরাম মন্দিরে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিন সন্ধ্যায়। সহসা বাবুরাম মহারাজ আদেশ করলেন বেলুড় মঠে সম্প্রতি আগত অতুলকে— ছাখ্, ও যখন আজ এসেছে তোকে একটা কাজ করতে হবে। ছেলেটি কলকাতা শহরের কিছু চেনে না, কাল আবার মা-ঠাকরুনের কাছে ওর দীক্ষা হবে। তুই ওকে সকালে নিয়ে যাবি। প্রথমে উদ্বোধন-বাড়ির সামনে গঙ্গার যে ঘাট আছে-

সেখানে গিয়ে গঙ্গাস্নান করবি, ওকেও করাবি। তারপর উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের কাছে ওর দীক্ষার কথা বলবি। পারবি তো ?" অতুলের তাৎক্ষণিক জবাব হ'ল—"হ্যাঁ মহারাজ, কেন পারব না।" ভরতেরই বাড়ির নাম ছিল অতুল।

অতুল রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবুরাম মহারাজ অতুলের নাম ধরে ডাকছেন ভোর হতে না হতেই: 'উঠে পড়্, মুখ-টুখ ধুয়ে নে।' যে-ছেলেটিকে নিয়ে যাবার কথা উদ্বোধনে, তাকেও আগেই ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে দিয়েছেন তিনি। অতুল ও সেই ছেলেটি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে যাত্রা করেছে—নামবার সিঁড়ি তখনও অন্ধকার। উভয়ে সিঁড়িতে পা বাড়িয়েছেন,—সহসা পিছন থেকে আবার ডাক অতুলকে। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের কণ্ঠস্বর: "শোন্ দাঁড়া একটু। হ্যাঁরে, তোর দীক্ষা হয়েছে ? তুইও দীক্ষা নে।" অতুল অমন আচমকা পিছন ডাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। একটু থেমেই বাবুরাম মহারাজ ফের বলতে থাকেন: "আমার কথা শুনবি ? আমার কথা মানবি ?"

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই সবিনয় উত্তর হ'ল—"কেন মানব না ? বলুন। মহারাজ ?" বাবুরাম মহারাজ সস্নেহে তখন বলেন: "শোন্, তুই মায়ের কাছে দীক্ষা নে।"

ভরতের (তখনকার অতুলের) দ্বিধাজড়ানো জবাব শোনা গেল—"কিন্তু মায়ের কাছে আমি দীক্ষা নেব কেমন করে ? তিনি তো আমাকে ভাল করে চেনেনই না। আমি যাই, প্রণামটি করে চলে আসি।" এবার প্রেমানন্দ স্বামী বেশ জোরেই জানিয়ে দিলেন: "না, মা তোকে ঠিক চেনেন ও জানেন।" ভরত তখন জিজ্ঞাসা করেন—"তা'হলে কি বলব আমি ?" সুস্পষ্ট নির্দেশ পেলেন: "তুই শরৎ মহারাজের কাছে যাবি, তাঁকে গিয়ে বলবি। সারদানন্দ স্বামী তো তোকে চেনেন।" ভরত সঙ্কুচিত। উত্তর দিয়েছিলেন—"হ্যাঁ মহারাজ, তিনি আমাকে চেনেন।" নিবেদন করলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী যখন অসুস্থাবস্থায় উদ্বোধনে ছিলেন, তখন তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকাকালে, সারদানন্দ মহারাজ নিশ্চয়ই দেখেছেন ও জেনেছেন। বাবুরাম মহারাজ শুনে প্রীত হন—বলেন—"হ্যাঁ, শরৎ মহারাজের খুব ভাল ধারণা তোর প্রতি—শশী মহারাজকে তোর সেবা দেখে, তিনি খুবই সন্তুষ্ট।" ভরত উত্তরে জানান—"সে আমি জানি না।"

স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ অতঃপর ভরতকে আদেশ করেছিলেন: "যাই হোক, ওই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যা। আর তোর নিজের জন্য একখানা নতুন কাপড় দিচ্ছি—এটা তুই নে। দু'জনে গঙ্গাস্নান করে উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের সঙ্গে দেখা করবি, বলবি, 'বাবুরাম মহারাজ আমাদের পাঠিয়েছেন ; আপনাকে

বলেছেন মা-ঠাকরুনের কাছে আমাদের দীক্ষার কথা নিবেদন করতে—আর সেই মতো সব ব্যবস্থা করে দিতে'।"

উত্তরকালে পূজনীয় ভরত মহারাজ এই দীক্ষার প্রসঙ্গে বলতেন: "...বাবুরাম মহারাজ এমন ভাবে জোর করেছিলেন যে, আমার আর অন্যথা করার উপায় ছিল না। তিনি আমায় বলেছিলেন—'আমার উপর তোর বিশ্বাস নেই? তুই আমাকে ভালবাসিস না? ত্যাখ, তোর ভালর জন্যই বলছি, তুই মায়ের কাছে দীক্ষা নে।' এই কথার উত্তরে আমি কি বলব? বুঝেছিলাম যা স্থির হয়েছে, তা'ই আমাকে মেনে নিতে হবে এবং মেনে নেওয়াই উচিত। তাঁর আদেশ অমান্য করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব।"—সম্ভবতঃ ভরত মহারাজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিছু অন্যরূপ ছিল, তাঁর উল্লিখিত উক্তি থেকে এ-রকম একটা আঁচ করে লওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এ রকম অনুমান বা কল্পনা যে ভিত্তিহীন নয়, এ-কথাও একেবারে অঠিক হয়তো নয়। ভরত মহারাজ নিজেই এক সময়ে বলেছেন—"স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে আমি পথনির্দেশের প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। আনুষ্ঠানিক দীক্ষার প্রার্থনা অবশ্য জানাইনি। তবে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্য তাঁর উপদেশ সর্বদাই চাইতাম। তা' ছাড়া এই মঠে তাঁরই সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাই তাঁর নিকট দীক্ষালাভের একটি আকাঙ্ক্ষাও মনে থেকে গিয়েছিল।" যাই হোক্, "যে যাঁর সে তাঁর...।" শ্রীশ্রীমায়ের চিহ্নিত সন্তান স্বামী অভয়ানন্দ যথাকালে যথানিয়মে মাতৃপদপ্রান্তে উপনীত হয়ে তাঁর নির্দিষ্ট অভয়-আশ্রয়ই প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আত্মপ্রচারকুণ্ঠ, সংযতবাক্, মিতভাষী ভরত মহারাজ পরবর্তী কালে একদা স্বমুখেই সে-কাহিনী ব্যক্ত করেছিলেন। হুবহু তাঁর মুখের ভাষাই উৎকলিত হচ্ছে এখানে:

"যথাসময়ে উদ্বোধনে গিয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে সব কথা নিবেদন করলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় হবে।' তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে আমি যে পূজনীয় শশী মহারাজের সেবা করেছি সে-কথাও বললেন। শ্রীশ্রীমা সব কথা শুনে বললেন: 'হ্যাঁ বাবা, তোমার দীক্ষা হবে। যাও বাবা নিচে গিয়ে বোস, পরে ডেকে নেব'।

"...প্রথমে আমার সঙ্গীর ডাক এল, তারপর আমার। মা ছিলেন উদ্বোধনের যে-ঘরে এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হয়, সেই ঘরটিতে। শ্রীশ্রীমা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতেন সব সময়ে। আজ কিন্তু ঘোমটা ছিল না। আসন পাতা ছিল। ঘরে ঢুকে সেই আসনে বসলাম। আসনে বসবার কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীমা আমাকে

কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। যতদূর মনে পড়ে, আমার ইষ্ট সম্বন্ধে বা ঐ রকম কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি বলেছিলাম—'আমার কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে না, তা তো আমি নিজেই জানি না। আপনার যা ভাল মনে হয়, তা'ই আমাকে দিন, মা।' মা বললেন—'তা'ই হবে।' এরপর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান করলেন, তারপর আমাকে মন্ত্র দিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, এতদিন যে-ভাব নিয়ে আমি আছি ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী তিনি মন্ত্র দিয়েছেন। আমি তো শ্রীশ্রীমাকে আমার পছন্দ অপছন্দের বিষয়ে কিছুই জানাই নি। তাঁর ইচ্ছামতো মন্ত্র দিতেই অনুরোধ করেছিলাম। আমার পছন্দ তো কতো রকমেরই হতে পারে, কিন্তু কী আশ্চর্য, বিশেষ যে-ভাবটি নিয়ে এতদিন অগ্রসর হচ্ছিলাম, মা আমাকে ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী মন্ত্র দিলেন। মা-ঠাকরুন তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে আমার মনের কথা ঠিক জেনে নিয়েছেন। এর ফলে আমার মনে খুব তৃপ্তি ও আনন্দ হল। এই ভাবেই আমার দীক্ষা হ'ল।"

বর্ণিত চিত্রখানিতে গুরু ও তদীয়া শিষ্যের মাঝে আরও একটি চরিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে,—মনে হচ্ছে সমগ্র ঘটনাবলীতে তাঁরই ভূমিকা সমধিক। ভাস্বর সে-চরিত্র স্বামী প্রেমানন্দের। ভরত মহারাজ নিজেও বলতেন—"বাবুরাম মহারাজেরই ঐকান্তিক প্রেরণায় শ্রীশ্রীমায়ের কাছে আমার দীক্ষালাভ হয়েছিল।" দেবী সারদাকে কৃপা-সুমুখী করতে অন্য একটি যন্ত্রের নিমিত্ততা এখানে চোখে পড়ে। এমন অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে,—যদিও সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই নয়। এমন কি বিপরীত দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

অনুরূপ অপর এক ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে।

বাঁকুড়া জিলার ইঁদপুরে দুর্ভিক্ষ-সেবায় নিরত জনৈক স্বেচ্ছাসেবী যুবক বেলুড় মঠ থেকে ডাকযোগে একখানি পত্র পেলেন,—লিখেছেন স্বামী শিবানন্দ—মহাপুরুষ মহারাজ। পত্রের ভাষা :

"শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অতি উত্তম। তুমি যাইয়া তাঁহাকে বলিও, 'শিবানন্দ স্বামী (তারক মহারাজ) আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে আমায় আপনার শ্রীচরণ সমীপে পাঠাইয়াছেন। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করিতে তিনি আমায় পাঠাইয়াছিলেন, সেখান হইতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ও কৃপা লাভের জন্য আসিয়াছি। আপনি কৃপা করুন।'—এই কথা বলিলেই তিনি তোমায় দয়া করিবেন। তিনি দয়ার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে যায়

কাহাকেও বিমুখ করেন না। অতএব আমার স্বতন্ত্র পত্র দিবার প্রয়োজন নাই। এই পত্রখানি তাঁর শ্রীচরণ সমীপে পাঠ করিও, তাহা হইলেই হইবে।

"...শ্রীশ্রীমার কৃপা লাভ বড় ভাগ্যে ঘটে। তুমি যাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রণিপাত করিয়া বলিবে, 'মা আমাকে কৃপা করুন।' তারপর তিনি দয়া করিয়া যাহা বলিবেন, তাহাই শিরোধার্য করিবে। যদি তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে মন্ত্র দান করেন, জানিবে তুমি ভাগ্যবান। তিনি আমাদের সকলের মা। তাঁহার প্রদত্ত মন্ত্র পাইলে তোমার জন্ম সার্থক হইবে। ইহাতে আমারও পরম আনন্দ হইবে, জানিবে। তিনি প্রভুরই নাম তোমায় দিবেন—সকলকে তিনি তাহাই দেন।"

মহাপুরুষ মহারাজের কাছ থেকে এই অনুমতি, আশ্বাস ও অভয় পত্র পেয়েই সেবকটি আহ্লাদে আত্মহারা হয়েছিলেন, বলাই বাহুল্য। সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে মিলেও যায়। সেবাকেন্দ্র থেকে কয়েকদিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে, জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেন। প্রথমে পায়ে হেঁটে বাঁকুড়া—পরে সেখান থেকে ট্রেনে আসেন গড়বেতা। সেটা ছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট—ভাদ্র মাস। গড়বেতা থেকে খুব ভোরে পথে পা বাড়ালেন পুণ্যপীঠ জয়রামবাটীকে লক্ষ্য করে। খালি পা, জলকাদা ও পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ ধরে—মাঠ-ঘাট প্রান্তর ভেঙ্গে চলেছেন যুবক। এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—কিন্তু চলায় ছেদ ঘটেনি। অবশেষে বিকেল পাঁচটা নাগাদ জয়রামবাটীর উপকণ্ঠে। লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন তিনি—উপনীত হলেন মায়ের বাড়ির দরজায়। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করার প্রার্থনা জানাতেই, কেউ পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁকে মাতৃচরণ সমীপে। কোনওরূপ চিঠিপত্র দিয়ে আসা হয়নি—তাই একটা ভয়-ভয় ভাব মনে ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য,—এক নিমেষেই সকল ভয়, সঙ্কোচ ও শঙ্কা তিরোহিত হয়ে গেল।

সেদিনের সেই যুবকের জীবন-সন্ধ্যায় কথিত স্মৃতিচারণের ভাষাই আমরা উদ্ধৃত করব এখন, যাতে তাঁর মাতৃস্মরণের ইতিবৃত্তটি অনুসরণ ও অনুস্মরণের সুবিধা বেশি হবে—অধিক উদ্দীপনাকর হয়ে উঠবে। স্মৃতি ঃ

"শ্রীশ্রীমা তখন ভিতরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রণাম করে মুখ তুলতেই মা আবেগভরে বললেন—'আহা। বাছার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে—সারাদিন খাওয়া হয়নি। ওকে কিছু খেতে দাও।' আমি পকেট থেকে মহাপুরুষ মহারাজের

লেখা চিঠিখানি বের করে পড়তে যাচ্ছি, তখন মা বললেন, 'চিঠি পরে শুনব। এখন বাবা হাতমুখ ধুয়ে জল খেয়ে নাও'।"

মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে হাতমুখ ধুয়ে যুবকটি কিছু প্রসাদ পান। সেদিনের কথা স্মরণ করে আবেগভরা কণ্ঠে তিনি আমাদের বলেছেন :

"জয়রামবাটীতে মাকে দেখলাম ঠিক বাড়ির মায়ের মতোই- মলিন বস্ত্রে দাঁড়িয়েছিলেন, আমার আগমন-প্রতীক্ষায়, কতো স্নেহ ও করুণা ঝরছিল মূর্তিতে! ...একটু পরেই আমি পুনরায় মায়ের কাছে গেলাম। তিনি তখন পা ছড়িয়ে বসেছিলেন তাঁর মাটির ঘরটির বারান্দায় এবং কুটনো কুটছিলেন। মাকে প্রণাম করে পাশে বসে মহাপুরুষ মহারাজের চিঠিখানি পড়ে শোনালাম। তিনি 'তারকের'[১] খবর জিজ্ঞাসা করলেন, সস্নেহে দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যের সব খবর নিলেন। পরে দীক্ষা সম্বন্ধে বললেন : 'তা বাবা, কাল বেশ ভাল দিন[২], কালই তোমায় মন্ত্র দেব। সকালে কিছু খেও না, স্নান করে অপেক্ষা কোর। আমি তোমায় সময় মতো ডেকে নেব।'...

"ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—ঘরে ঘরে দীপ জ্বালা হল।...আমি বহির্বাটিতে চলে এলাম।

"...শুভ প্রভাতের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে এক প্রকার বিনিদ্র অবস্থায় রাতটি কেটে গেল। সকালে পুকুরে স্নান করে বসে আছি মায়ের ডাকের প্রতীক্ষায়। দীক্ষার জন্য কি প্রস্তুতির প্রয়োজন—তা জানিও না, জিজ্ঞেসও করিনি। টাকা-কড়িও কিছু ছিল না। আন্দাজ আটটার সময়ে সেবক-মহারাজ আমায় ডেকে শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। মা পূজার আসনে বসে পূজা করছিলেন—পাশে আর একখানি আসন। মা আমায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করে ঐ আসনে বসতে বললেন। বসতেই আমার হাতে একটু গঙ্গাজল দিলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। মায়ের স্পর্শে রোমাঞ্চ হতে লাগল, এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে গেল অন্তর। মা খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'ঠাকুরকে তোমার ভাল লাগে?' আমি সম্মতি জানাতেই তিনবার একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে পরে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে তা' উচ্চারণ করতে বললেন। হঠাৎ পাশের দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন : 'এই, এই তোমার ইষ্ট।' সঙ্গে-

১ মহাপুরুষ মহারাজের

২ বোধ হয় জন্মাষ্টমী ছিল

সঙ্গে ওদিকটা চোখঝলসানো উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তাতে ভেসে উঠল এক দেবীমূর্তি—জীবন্ত ও জ্যোতির্ময়ী—আমার দিকে সস্নেহে চেয়ে আছেন। চকিতে কি যেন হয়ে গেল। আমি আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হয়ে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। মায়ের মূর্তিও তখন অন্য রকম। একটু পরেই মা সস্নেহে বললেন : 'বাবা ভয় হয়েছিল কি?' আমি চুপ করে রইলাম মাথা নিচু করে—জবাব দেবার শক্তি ছিল না। তারপর মা আমার ডান হাতটি ধরে প্রত্যেক 'কর' স্পর্শ করে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। মা কথা বলছিলেন, কিন্তু আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। মা বার বার 'কর' স্পর্শ করে, মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জপ করা দেখাতে লাগলেন। আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন। তাই করলাম। তারপর মা ঠাকুরের পটমূর্তি দেখিয়ে বললেন : 'ঠাকুরকে প্রণাম কর, ইনিই তোমার ইষ্ট, ইনিই গুরু। তোমার ইহকাল, পরকাল সর্বস্ব। ঠাকুরই সর্বদেব-দেবী-স্বরূপ।' আমি ঠাকুরকে প্রণাম করে মাকেও প্রণাম করলাম। তারপর তিনি কত জপ করতে হবে, তা' বললেন এবং ধ্যান সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিলেন। মা যে কি বা কে, তা তখন বুঝতে পারিনি, এখনও কিছুই বুঝি না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল—তিনি ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিতে পারেন।

"মায়ের পূজার আসনের পাশেই দু'টি ফল ছিল, তা হাতে নিয়ে তিনি বললেন : 'ফল দু'টি আমার হাতে দাও।' আমি তা'ই করলাম। ঐ বোধহয় গুরুদক্ষিণা। আমি কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাইনি—টাকাকড়ি বা ফলমূল কিছুই না। আমার সব শরীর কাঁপছিল।

"মাকে পুনরায় প্রণাম করলাম। তাঁকে এত কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছিল, খুব ভাল লাগছিল। মা সস্নেহে বললেন : 'এখন ঘরে গিয়ে বসে যেমনটি দেখিয়ে দিলুম তেমনিভাবে একটু জপ কর। তারপর জল খাবে'।"

যাঁকে নিয়ে ঘটনাটি—দুর্ভিক্ষ-সেবানিরত, মাতৃ-কৃপাধন্য সেদিনের সেই যুবকই রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে খ্যাত হয়েছেন স্বামী অপূর্বানন্দ বা শঙ্কর মহারাজ নামে। তাঁর ক্ষেত্রে শ্রীসারদা দেবী গুরুমূর্তিতে প্রকট হয়েছেন যে-ভাবে, তা' অনেকটা ধারণাগম্য হতে পারে,—মায়ের এমন সহজ জ্ঞানদা গুরুমূর্তি বেশ পরিচিত আমাদের সকলের কাছে। স্বয়ং মহাপুরুষ মহারাজ যাঁকে পাঠিয়েছেন দীক্ষার জন্য, তাঁকে মা এক কথাতেই দীক্ষাদানে সম্মতা হয়েছেন, এটাও যেন স্বাভাবিক ঘটনাই মনে হতে পারে। এমন ভাগ্যবান দীক্ষার্থীকে তিনি কেবল মন্ত্রপ্রদানই

করেননি,—মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী ইষ্টদেবীকেও তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিয়েছিলেন !! এরূপ বিশেষ কৃপার হেতুও সহজেই বুঝে লওয়া চলে। কিন্তু দেবী সারদা কি এই রকম কোন বিশেষত্বেরও বশবর্তী ছিলেন ? বড় রকমের সুপারিশ-সম্বলকেই কি তিনি শরণার্থীর যোগ্যতার পরিমাপক বলে বিচার করতেন কোনও কালে ? তবে আর তিনি স্বতন্ত্র-ঈশ্বরী কেমন করে ? আমাদের সংশয়ান্বিত মনের এই অব্যক্ত কুটিল জিজ্ঞাসার উত্তরও আপনিই মিলবে, যদি এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও ঘটনার উল্লেখ করি। মা কৃপাময়ী মোক্ষপ্রদাত্রী গুরু হলেও, তিনি নিত্য-স্বতন্ত্রা,—নিয়ম বা বিধি-বিধানের অনুগতা তিনি নন্। ত্রিকালের নিয়ামক হয়ে তিনি মাত্র এক বিশেষ কালের অনুগামিনী হতে পারেন না। বিধানেরও বিধায়িকা সারদা—নিয়মেরও নিয়ন্ত্রী দেবী তিনি।

* * *

"আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন কী উদ্দেশ্যে ?" ভদ্রলোক উত্তর পেলেন—"কলকাতায় বাগবাজারে যাব—শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে দর্শন করতে।"

"কেন ? দীক্ষা নিতে নাকি ?"

আবার বিনম্র উত্তর—"এরূপই তো ইচ্ছা।"

"আপনার অনুমতিপত্র আছে তো ?"

এবার সকুণ্ঠ উত্তর—"না।"

"তা'হলে আপনার দীক্ষা হবে না।"—এই কথা বলেই ভদ্রলোক (অবিনাশ দেব মহাশয়) নিজের জামার বুক-পকেটে খুব যত্ন করে রাখা ভাঁজ-করা একখানি কাগজ বার করে দেখিয়ে সগর্বে উক্তি করলেন—"এই দেখুন মার কাছে দীক্ষা নেবার অনুমতি দিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমাকে পত্র দিয়েছেন। আমার দীক্ষা হবে।"

যে-ছেলেটির মুখের সামনে ঐ পত্রখানি ধরে বলা হয়েছিল, বিনা ছাড়পত্রে দীক্ষা হবে না,—সেই বেচারা তখন নির্বাক। তিনি ও তাঁর অপর দুই বন্ধু মিলে সুদূর শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ থেকে ষ্টীমারে কলকাতা যাচ্ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের শরণ-লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে—কোনও প্রকারের পরিচিতি ছাড়াই লোকের মুখে শুনে এই যাত্রা। রমেশ ধর এবং তাঁর দুই সঙ্গী শ্রীবাস দাস ও মানগোবিন্দ চৌধুরী ষ্টীমারে—আলাপ অবিনাশবাবুর নিরুৎসাহ-সূচক কথায় দমে না গেলেও, খুবই ধন্দে পড়ে গিয়েছিলেন। যা'হোক, তাঁরা কলকাতায় গিয়ে পৌঁছে—দিন

কয়েকের মধ্যেই বাগবাজারের বাড়িতে শ্রীশ্রীমার চরণ-দর্শনে চলে যান। সেখানে অবিনাশবাবুও যথাব্যবস্থা উপস্থিত ছিলেন। ১৩২৫ সালের পৌষ মাস তখন। রমেশের কথা থেকে জেনেছি আমরা,—মা খাটে বসেছিলেন পা ঝুলিয়ে, মুখে ঘোমটা। রমেশ সবার শেষে মাতৃ-চরণে লুণ্ঠিত হয়েছিলেন। "আমি নিজের মাথাটি মায়ের পায়ে রাখি এবং তিনি তাঁর বাম পদাঙ্গুষ্ঠ মৃদুভাবে উর্দ্ধমুখে আমার কপালে সঞ্চালিত করেন।"—রমেশের উক্তি।

যা'হোক, আমাদের মূল কথা—পরিচয়বিহীন রমেশ ও তাঁর দুই সঙ্গীর কী গতি হল শেষ পর্যন্ত? আর স্বয়ং ব্রহ্মানন্দ মহারাজ-প্রদত্ত অনুমতি-পত্র সহ আগত ভক্ত অবিনাশবাবুরই বা কী হল? রমেশ—পরবর্তী জীবনে যিনি সুখ্যাত ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, তাঁর 'জীবন-পরিক্রমা' গ্রন্থে আমাদের সে-কথার উত্তর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—"শ্রীশ্রীমার কাছে আমাদের তিনজনেরই দীক্ষা হয়, ঐ ভদ্রলোকের হয় নাই।...পাকেচক্রে নিজেই দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের প্রধানতম 'ভারী' পূজ্যপাদ সারদানন্দজী মাতৃ-প্রসঙ্গে ঠিকই গাইতেন :

"তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।
হাসিব কি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি॥
বিচিত্র তোর ভবের খেলা
ভাঙ্গ গড় দুই বেলা
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি।
এতকাল রইলাম কাছে
ঘুরিলাম পাছে পাছে
চিনতে কিছু না পেরে এখন হার মেনেছি॥"

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন, আমাদের বলার কিছু নেই। বুঝতে কিছু পারা যায় না—আমাদের কার্য-কারণ পরম্পরামূলক বিচারে। তাই-ই তো তাঁর কার্যাবলীকে 'বিচিত্র' 'রঙ্গ' বলেই বোধ হয়ে থাকে—'ছেলেখেলার'-র মতোই মনে হয়। তাঁর এই বিচিত্র রঙ্গ-ক্রীড়ার তাৎপর্য নির্ণয় করার প্রয়াস বৃথা—তবে তাঁর মোক্ষ-বিধায়িকা মূর্তির অনন্ততাকে কিঞ্চিৎ ধারণায় আনার জন্য, আমরা আরও কয়েকটি উদাহরণের উপস্থাপনা বর্তমান অনুধ্যানের অঙ্গস্বরূপ করতে চাই এখানে।

আমরা উল্লেখ করতে চাই, স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দের মাতৃ-চরণাশ্রয় প্রাপ্তির অতি

সহজ সুবোধ্য ইতিবৃত্তকে। তখন তিনি যুবক চিন্তাহরণ—ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। কলকাতায় এসেছেন একজন সঙ্গীর সঙ্গে—যিনি শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ইতিমধ্যেই। বাগবাজারে গিয়েই গঙ্গা-স্নানান্তে সঙ্গীর সঙ্গে তিনিও শ্রীশ্রীমায়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে চিন্তাহরণ সম্পূর্ণ অপরিচিত,—তাঁর সঙ্গীও কোনও রকম খবর না দিয়েই, নিছক মায়ের চরণ দর্শনের উদ্দেশ্যেই মায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। চিন্তাহরণও চেয়েছিলেন, এই যোগাযোগে যদি তাঁরও অদৃষ্টে মাতৃদর্শনটুকুই মাত্র হয়ে যায়—আর কোনও প্রত্যাশা তাঁর ছিলনা। শ্রীশ্রীমা তখন পূজা করছিলেন—তাই স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল নিচের তলায়। খানিক বাদে সঙ্গী উঠে উপরে চলে যান এবং মাকে দর্শন-প্রণামাদি করার সুযোগ লাভে ধন্য হন। কিন্তু প্রণাম ব্যতীত মায়ের সঙ্গে কোনও কথা বলার অবসর তিনি পাননি। যা'ই হোক, তিনি নিচে নেমে এসে চিন্তাহরণকে বলেন—এবার উপরে চলে যেয়ে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে আসা যেতে পারে,—কেননা মা পূজা সাঙ্গ হলেও আসনেই বসে রয়েছেন তখনও পর্যন্ত। সঙ্গীর কাছ থেকে ভরসা পেয়ে চিন্তাহরণ সাহসে ভর করে একাই সটান দোতলায় উঠে গিয়ে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে সঙ্গীর নির্দেশমতো মায়ের পাদপদ্মে লুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করেন। মা তখনও পূজার আসনেই সুস্থির আসীনা—যেন কিসের জন্য প্রতীক্ষারতা। প্রণত চিন্তাহরণ স্তম্ভিত-বিস্ময়ে মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন আচমকা : "তুমি দীক্ষা নেবে বাবা ?" চিন্তাহরণ হতবাক্—বিহ্বল। মা কিন্তু বলেই গেলেন : "ঐ আসনে বোস। নাও, আচমন করো।" যন্ত্রচালিতের মতো চিন্তাহরণও মাতৃ-আদেশ অনুসরণ করেই চললেন। স্নেহ-মিষ্ট স্বরে মা জিজ্ঞাসা করলেন তখন, "কোন্ দেবতা বা দেবীকে তোমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে ?" চিন্তাহরণও মাকে তাঁর প্রিয় ইষ্টের কথা নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন সন্তানের ঈপ্সিত ইষ্টমন্ত্র প্রদান করে। দীক্ষালাভান্তে গুরুপূজার বিধি সম্পর্কে চিন্তাহরণের কিছুই জানা ছিল না,—তিনি তো দীক্ষার জন্য এসেছিলেন না, তাই প্রস্তুতও ছিলেন না এ-সবের জন্য। শ্রীশ্রীমা স্বয়ংই তাঁকে বললেন, তাঁর শয্যার নিচে রাখা ফল থেকে কিছু হাতে তুলে নিতে। অবশেষে মায়েরই দেওয়া ফল দিয়ে, মাকে পূজা করলেন চিন্তাহরণ। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কাছে এইভাবে দীক্ষাগ্রহণের ফলে চিন্তাহরণের এক অননুভূত আনন্দে হৃদয় ভরে গিয়েছিল—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর দ্বিতীয় জন্মের চেতনা। মন্থর পদে মায়ের কাছ থেকে নেমে এসেছিলেন নিচের তলায়

যেখানে তাঁর সঙ্গী অপেক্ষা করছিলেন তাঁর জন্য। নিঃশ্রেয়স-বিতরণকারিণী দেবী সারদার নিষ্কারণ শরণ-দানের এ-এক উজ্জ্বল উদাহরণ। চিন্তাহরণকে দীক্ষাদানের পরেই শ্রীশ্রীমা নাকি মন্তব্য করেছিলেন—"এ-ছেলে তার মাকে ও ভাইদেরকে কাঁদাবে।" দিনটি ছিল ২৪ ডিসেম্বর, ইংরেজী ১৯১৬ অব্দ। চিন্তাহরণের উত্তর-জীবন শ্রীশ্রীমায়ের সেদিনের সেই মন্তব্যেরই জলন্ত সাক্ষ্য,—মা-ভাইদের কাঁদিয়ে তিনি সন্ন্যাসীই হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী নিত্যস্বরূপানন্দের পরিচিতির পরিধি আজ বিশ্বব্যাপী। নবতিপর এই মায়ের সন্তানের জীবনের উল্লিখিত তথ্যাবলী আমরা জেনেছি, তাঁর স্বমুখে কথিত আত্মস্মৃতি 'How I came to the feet of Sri Ramakrishna' থেকে।

অনায়াসবোধ্য অথচ উৎসাহ-প্রদীপক আরও একটি ঘটনার কথা এখানে অবতারণার যোগ্য। ঘটনাটি ঠিক যেন এক গল্প-কথা।

ওড়িশ্যার কোঠার। ১৩১৭ বঙ্গাব্দ। শ্রীশ্রীমা বলরাম বাবুদের দেবালয়ে অবস্থান করছেন তখন। সেই সময়ে কটক থেকে একটি তরুণ মায়ের কোঠারে আগমনের খবর কোনও সূত্রে জানতে পেরে, তাঁকে একটিবার শুধু দর্শনের অভিলাষ নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তরুণের নিজেরই উক্তিঃ "...পূর্বে একটা মোটামুটি ধারণা ছাড়া শ্রীশ্রীমা কিংবা শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতাম না বা কোনও পুস্তকেও পড়ি নাই।" কিন্তু তথাপি কটকের এতো কাছে কোঠারে মায়ের অবস্থান-সংবাদ তাঁকে খুবই ব্যাকুল করে তুলেছিল—একবার যদি দর্শন মেলে সারদাদেবীর। ব্যাকুলতার প্রেরণাতেই তিনি কোঠারে না যেয়ে থাকতে পারেন নি। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কোঠারে পৌঁছানো মাত্রই তাঁর সে-ব্যাকুলতা কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। নিজেই তিনি বলেছেন—"সেখানে পৌঁছিয়া আর আমার এতোটা ব্যাকুলতা ছিল না।" অব্যাকুল মনও তাই দর্শনাকাঙ্ক্ষাকে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত করে দিয়েছিল তাঁর। যুবকটি বলরাম বাবুর দেবালয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সর্বাগ্রে প্রসাদ পেতেই চলে গিয়েছিলেন,—মাকে প্রণাম করতে নয়। প্রসাদ পাবার পরেও বসে নিশ্চিন্তে গল্পগুজব করছিলেন বহির্বাটিতে একটি কক্ষে। স্থির হয়েছিল—বিকেলে যাবেন মাতৃচরণ দর্শনে।

"একটি ছেলে কটক থেকে এসেছে,—মা তাকে ডাকছেন। সে এখন প্রণাম করে আসবে।"—সহসা বলরামবাবুর পুত্র রামবাবু এই কথা বলতে বলতে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ করেন। সেখানে উপস্থিত কৃষ্ণলাল মহারাজ জানালেন—তিনি ছেলেটিকে বলেছেন যে, সে বিকেলে মাকে প্রণাম করতে যাবে। রামবাবু

তাতে জবাব দেন,—"না, মা অপেক্ষা করছেন। ছেলেটি দর্শন করে আসলে তিনি খেতে যাবেন।" ছেলেটি অগত্যা গাত্রোত্থান করেন এবং রামবাবুর সঙ্গে যেয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে ফিরে আসেন। অবাক কাণ্ড,—মার সঙ্গে তার কোনও কথাবার্তাই হয়নি। নেহাত কর্তব্য-সম্পাদনটুকুই মাত্র হয়েছিল তখন। ততোধিক বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, দর্শনার্থী ছেলেটি মাত্র সেই প্রণাম-জানানো পর্বটি সমাধা করেই সন্তুষ্ট চিত্তে পরের দিন ভোরেই কটকে তাঁর বাড়িতে ফিরে চলে গিয়েছিলেন।

কটকের বাড়িতে প্রত্যাগত যুবক পুনরায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন,—কে যেন দারুণ জোরে বুকের মধ্যে টানছেন। বাড়িতে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পড়ল। আবার কোঠারে।

কিন্তু কোঠারে এসেই সেই পূর্ববৎ—যেন কোনও টানই বোধ করেন না—কোনও ভাবের ব্যাকুলতা নেই। আছেন আছেন—দু'চারদিন এমন শুষ্ক চিত্তে কাটাবার পরে একদিন সকালে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গিয়ে, তাঁকে নিবেদন করেন—"মা কাল আমি বাড়ি যাব।" তৎক্ষণাৎ উত্তর শুনলেন যুবক: "আচ্ছা, কাল থাকো। পরশু যেও।" শ্রীশ্রীমায়ের মুখের এই আদেশ শোনামাত্রই যুবকটি ক্ষণকালও সেখানে না দাঁড়িয়ে বাইরে চলে আসেন। কিন্তু মায়ের অকস্মাৎ এমন নির্দেশ জ্ঞাপনের কী উদ্দেশ্য—তা' তখনও পর্যন্ত তাঁর অজ্ঞাত—তিনি আদৌ কৌতূহলীও ছিলেন না সে-ব্যাপারে। নির্বিকার শান্ত তরুণ।

হঠাৎ চমকিয়ে ওঠেন যুবক। জনৈক সাধু তাঁকে জানিয়ে গেলেন—"তোমার উপর মায়ের দয়া হয়েছে, কাল খুব সকাল সকাল স্নানাদি সেরে নিয়ে প্রস্তুত থেকো।"

"দয়া"! সে আবার কী? বুঝতে কিছু না পেরে যুবক চুপ। যা' হোক, সাধুবাক্য শিরোধার্য করে, পরের দিন তিনি খুব ভোরে উঠেই স্নান ইত্যাদি সমাধা করে নিয়ে একা একা বসে আছেন বৈঠকখানা ঘরে।

"বৈকুণ্ঠবাবু কে আছেন? তাঁকে মা ডাকছেন ভিতরে"।—রাধুদিদি আচম্বিতে বৈঠকখানায় এসে এই কথা ক'টি জানিয়ে গেলেন। দিশাহারা যুবকের তখন সম্বিৎ এল। বলে উঠলেন: "আমারই নাম বৈকুণ্ঠ। আমিই কি যাব মায়ের কাছে?" রাধুর তীব্র স্বর: "হ্যাঁ"।

"এস এস, ঘরের ভিতরে এস"।—শ্রীশ্রীমা বৈকুণ্ঠকে দেখেই বলে ওঠেন। রাধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েই যুবকটি চলে গিয়েছিলেন মায়ের দ্বারপ্রান্তে।

বৈকুণ্ঠ অভয়-আমন্ত্রণ লাভ করে ঘরের ভিতরে গিয়ে মায়ের চরণ সকাশে উপনীত হন,—কিন্তু প্রণাম নিবেদনের আগেই শ্রীশ্রীমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন: "তুমি মন্ত্র নেবে?"

উত্তর—"আপনার যদি ইচ্ছা হয়, দিন। আমি কিছু জানি না।"

মা বলেন—"বেশ, বস এখানে।"

বসা মাত্রই মা জানতে চান্—"তুমি কোন্ দেবতার মন্ত্র নেবে?"

তেমনই অসঙ্কোচ সরল জবাব—"আমি কিছুই জানি না।"

সুপ্রসন্না জ্ঞানদা সারদা উত্তম গুরুভাবে আবিষ্টা তখন। স্নেহমাখা কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে বৈকুণ্ঠকে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠ-সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়ে বলে দিলেন—"তোমার এই মন্ত্রই ভাল।" বৈকুণ্ঠের দীক্ষালাভ হয়েছিল এই ভাবেই,—১৩১৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে। অযাচিত করুণাধারা বর্ষণে কটকের আগন্তুক অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক বৈকুণ্ঠের হৃদয়-ক্ষেত্রটি কতোখানি উর্বর হয়েছিল তা আমরা বলতে পারব না,—কিন্তু আমরা জানি, সেই ভাগ্যধর তরুণকে উপলক্ষ করেই জগৎপাবনী গুরুশক্তির পরম আশ্বাসবাণী একদা উচ্চারিত হয়েছিল:

"আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখো যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন।" (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৭১-১৮৬ দ্রষ্টব্য।)

'প্রকৃতিং পরমাং' গ্রন্থের প্রথম ভাগে পৃষ্ঠা ৬৪-৭৬-এ ও পৃষ্ঠা ২১০-২১২-তে "জনৈক ভক্ত" এবং "শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত ও বিশেষ স্নেহাস্পদ একটি ছেলে"-র উল্লেখ রয়েছে—তাঁকে কেন্দ্র করে পরমার্তিহন্ত্রী শান্তিস্বরূপা দেবী সারদার কিছু লীলাবৃত্তও রচিত হয়েছে সেখানে। বলা বাহুল্য উক্ত "জনৈক ভক্ত" এবং "একটি ছেলে"—একই ব্যক্তি—তিনিই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বৈকুণ্ঠ। রামকৃষ্ণ-চৈতন্যদায়িনী, মোক্ষদাত্রী সারদার সেই অনাহত অভয়-মন্ত্র: "ঠাকুরকে ডাক। আমি রইলুম। তুমি এ জনমে মুক্ত হয়ে রয়েছ, জানবে। ভয় কি? সময় আসলে তিনিই সব করে দেবেন।"—এখানেও সেই পুণ্যকীর্তি বৈকুণ্ঠই উপলক্ষিত।

অনিচ্ছুক, অবিশ্বাসী, অনাগ্রহী শিলঙের শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্তের কথাও স্মরণ-যোগ্য এখানে। বন্ধুর উপরোধে পড়ে 'উদ্বোধন'-এর বাড়িতে গিয়েছিলেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। তিনিও নিজে কিছু প্রার্থনা করেন নি,—তাঁর বন্ধুই মাকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তাঁকে দীক্ষা প্রদানের জন্য। মা-ও বন্ধুর মুখে

শুনেই, উত্তর দিয়েছিলেন, "বেশ তো, কালকে হবে।" ইন্দুবাবু তাতে চমকে উঠেছিলেন—কারণ তিনি তো ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাননি সেখানে—অমন চিন্তাও তাঁর কাছে অবান্তর ছিল। তথাপি পরের দিন সকালে তিনি উদ্বোধনে না যেয়ে পারেন নি। অযাচিত কৃপাবর্ষণ এখানেও হয়েছিল—ইন্দুভূষণ মা-সারদার চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দীক্ষান্তে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, অকপট ইন্দুভূষণ সরল অন্তঃকরণেই মাকে নিবেদন করেছিলেন: "আমি যে ফুল দিয়ে পূজো করলুম এ আমার ভক্তিবিশ্বাস থেকে নয়, চন্দ্রকান্ত বাবু আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি যেরূপ বলে দিয়েছেন তাই মাত্র করে গেলুম। চন্দ্রকান্তবাবুই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।" মা শুনে স্মিত-হাস্যে জবাব দিয়েছিলেন—"চন্দ্রকান্ত তো তোমায় ভাল পথই দেখিয়েছে, বাবা।" করুণা-কটাক্ষপাতে ঋজুপ্রকৃতি মুক্তচিত্ত নিষ্কপট ইন্দুভূষণকে শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ করেছিলেন, তাঁর মাথায় করকমল স্থাপন ক'রে।

পরে একসময়ে এই ইন্দুভূষণই মাকে নিবেদন করেছিলেন—"মা, সাধন-ভজন কিছু হয়ে উঠছে না।" এখানেও ইন্দুভূষণের অচ্ছদ্ম চরিত্রের পরিচয় সুস্পষ্ট। সরলপ্রাণের সরল স্বীকারোক্তি শুনে যোগীন্দ্রপূজ্যা ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রী সারদা তৎক্ষণাৎ অভয় ও আশ্বাস প্রদান করে বলেছিলেন: "তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় আমি করব।"

অবিশ্বাস্য এতো বড় আশ্বাসবাক্য শুনে, ইন্দুবাবু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান প্রথমে—পরে অস্ফুটে বলেন,—"আমার কিছু করতে হবে না?" মা তাতেও পুনরুক্তি করেছিলেন: "না। তুমি কি করবে? যা করতে হয় আমি করব।"

এই ইন্দুভূষণই সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, যাকে শ্রীশ্রীমা একদা বলেছিলেন: "যা প্রাণে আসে করে যাও।...তোমরা সর্বদা জেনো—তোমাদের পেছনে একজন মা আছেন!"

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রথম ভাগে শ্রীইন্দুভূষণ সেনগুপ্তের নিজেরই লেখা স্মৃতিচারণ প্রকাশিত হয়েছে—পৃষ্ঠা ১৬৮-১৭১ আলোকনীয়।

* * *

"শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।

তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং
জনানহেতুনা অন্যানপি তারয়ন্তঃ ॥
অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পর-
শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মানাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ককর্কশ
প্রভাভিতপ্তাম্ অবতি ক্ষিতিং কিল।"

(—বিবেকচূড়ামণিঃ, ৩৭-৩৮)

ভগবান শঙ্করাচার্য প্রকৃত সদ্গুরুর স্বভাব নির্ণয় করেছেন: তাঁরা জগতে থাকেন বসন্ত-ঋতুর মতোই লোকহিতৈষণার প্রেরণায়। বসন্ত-সমাগমে ধরিত্রী পত্র-পুষ্প-ফলের সমারোহে সঞ্জীবিতা হয়ে ওঠে—জীবের মন-প্রাণ জুড়ায়, শান্ত-সুখোদয় হয় সবার চিত্তে। লোকগুরু স্বয়ং ভবসমুদ্রের পারে অবস্থান করেও শরণার্থী সকলকে জ্ঞানপ্রদান দ্বারা তারণের উদ্দেশ্যে কাণ্ডারীর কাজ করে থাকেন। জীবদুঃখাসহিষ্ণুতাই ভব-পারের কাণ্ডারীর স্বভাব—পরদুঃখ অপনয়নই তাঁদের সহজ প্রকৃতি। গুরু যেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাময়ী চন্দ্রমা—সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপে সন্তপ্তা পৃথিবীতলকে আপন স্বভাবেই শীতলতা প্রদানের দ্বারা জীবকুলের শ্রান্তিহরণ করে থাকে। ঠিক তেমনই তিনিও নিয়ত অযাচিত করুণা-বিতরণ করে সংসার-ক্লিষ্ট মানুষের ক্লেশ হরণ করেন।

সারদা-কৌমুদীর সুধাতে বিধৌত হয়েছে যাঁদের জীবন—তাঁরা সকলেই আচার্যোক্ত ঐ উপমার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন: আর যাঁরা প্রত্যক্ষতঃ তখন আসতে পারেন নি—পরে এসেছেন, তাঁরাও সে-চন্দ্রপ্রভাতে নিজ নিজ জীবনকে আলোকিত ও স্নিগ্ধ করে নিতে পারছেন—ভাবীকালেও পারবেন, কেননা এ-চন্দ্রিকা যে নিত্য-অনস্তমিত। জীবনের বাতায়নগুলিকে শুধু উন্মুক্ত করে দেওয়ারই অপেক্ষা। বসন্তবৎ লোকহিত-চারণরতা দেবী সারদার মুক্তি-প্রদাত্রী গুরুমূর্তি অনন্তকাল ব্যাপী মানবের ত্রাণের জন্য প্রকট থাকবেন,—এ-কথার সত্যতাও আজ বহুবিদিত তথ্যে পরিণত। তাঁর এই গুরুশক্তির অবাধ বিচরণশীলতা ও অব্যর্থ কার্যকারিতাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—শক্তিসঞ্চারণার মাধ্যমও অতি সূক্ষ্ম ও অনির্ণেয়। জাতি-কুল-শীল নির্বিশেষে যেমন কৃপার আধার তিনি তৈরী করেছেন—কৃপা-প্রদান-পদ্ধতিও তেমনি ছিল সর্বপ্রকারে নিয়মাতীত ও স্বকীয়তামণ্ডিত। মুখের বাণী বা বাক্যও কখনও কখনও স্তব্ধ ছিল,—মাত্র দুই নয়নের কিরণ-সম্পাতেই

দীক্ষাদান পর্ব সম্পূর্ণ করেছেন,—এমন নজিরও কিছু বিরল নয়। উদাহরণীয় একটি জীবন-স্মৃতি ঃ

"মনে করলাম শ্রীশ্রীমায়ের কোন কাজ করতে পারলে ধন্য হবো। উদ্বোধনে এসেছি বেলা দশটা কি সাড়ে দশটা হবে। গোলাপ-মা আমায় আদেশ করলেন—'অ ছেলে, মায়ের তরে এক পয়সার মুড়ি এনে দাও তো'। আমি কাছের দোকান থেকে মুড়ি এনে দাঁড়াতেই স্বামী সারদানন্দজী বললেন, 'যা ওপরে গিয়ে দিয়ে আয়।' ওপরে উঠে দেখি শ্রীশ্রীমায়ের ঘোমটা নেই, ঠাকুরঘরে পূর্বাস্য হয়ে বসে কার সঙ্গে কথা কইছেন। আমার খুবই আনন্দ হল। আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে যেমন বলব, 'মা, মুড়ি এনেছি'—অমনই তাঁর মুখ বা চোখ থেকে একটা তীব্র শক্তি এসে আমার বাক্যকে স্তব্ধ করে দিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, 'মা, এটি কোথায় রাখব?' শ্রীশ্রীমা স্থান নির্দেশ করে দিলেন এবং আমি সেখানে মুড়ি রেখে প্রণাম করে চলে এলাম। দেখলাম মায়ের কাছে আমার সাধারণভাবে কথা বলার সামর্থ্য নেই। একটু জোরে কথা বলতে গিয়ে আমি আঁক করে উঠেছিলাম—অথচ সেই করুণাময়ী করুণার দৃষ্টিতেই আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আবার দর্শন-পিপাসা বলবতী হল। এই কি ঠাকুরের গিরিশবাবুকে কথিত 'জাতসাপে ধরা'? তাঁকে সাধারণ চোখে দেখার ক্ষমতা আমার চলে গেল। আমার হৃদয়মধ্যে তিনি দীক্ষা দান করলেন।"

উৎকলিত স্মৃতিচারণটি যাঁর, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে—পূজ্যপাদ মাষ্টার মশায়ের (শ্রীম'র) বিশেষ স্নেহাস্পদ—সুলেখক ও কবি। স্বামী নিরাময়ানন্দ কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচিতি লিখেছেন—"শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাধন্য গৃহী সন্তানদের মধ্যে গোকুলদাস দে ছিলেন একজন, ১৯০৯ খ্রীঃ থেকে ১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত মাতৃসান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলেন।" উল্লিখিত স্মৃতিকথা—"শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী—যেমনটি দেখেছি'—এই শিরোনামে "উদ্বোধন"-এর পৌষ ১৩৪৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। ঐ স্মৃতি-প্রবন্ধের উপসংহারে গোকুলদাস বাবু আরও লিখেছেন ঃ

"যে-ভাবে সাধারণের মন্ত্র হয়ে থাকে, আমি সেই ভাবে মন্ত্র পাই নাই, অথচ তিনি (শ্রীশ্রীমা) বরাবরই মন্ত্রশিষ্যের মতো বা ততোধিক আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করেছেন। আগেই যে দর্শনাদি হয়েছে সে সব সম্বন্ধে কখনও আমার ভ্রম প্রকাশ করেননি, বরং তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়েছিল তার পক্ষেই কথা বলেছেন। আমি মন্ত্রাদির দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের প্রসাদ লাভ করিতে পারি নাই বা পারব না।

তাঁর অসীম কৃপায় তিনি আমায় ধরেছেন এটি বুঝতে পেরেছি। সব সময়েই মনে হয়েছে আমার পক্ষে যেটি দরকার, তিনি করিয়ে নিয়েছেন বা নেবেন।...একবার মাত্র বলেছিলেন, 'ঠাকুরের উপর নির্ভর কর, তিনিই সমস্ত করে দেবেন' এবং তিনি ও ঠাকুর অভিন্ন—এই কথাটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।...

" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পড়ে যখন জানলাম যে লোকোত্তর পুরুষগণ মন্ত্রদীক্ষা ব্যতীত শিষ্যের ভিতর শক্তিসঞ্চার করে 'শাক্তীক' ও 'শাম্ভবী' দীক্ষাও দেন, তখন আমার শ্রীশ্রীমায়ের কাছে 'রীতিমত' দীক্ষা হয়েছে বুঝে নিশ্চিন্ত হলাম।"

বর্তমান গ্রন্থের প্রথম ভাগে পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪-এ বর্ণিত চিত্রে গঙ্গাতীরে চণ্ডীপাঠক 'জনৈক ভক্তযুবক' এই গোকুলদাসই। তাঁর জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপার স্পর্শ বহুতর লাভ হয়েছে,—বিস্ময়কর সব অতীন্দ্রিয় দর্শনাদির ভূয়িষ্ঠতাই তার নিদর্শন।

* * *

দেবী সারদার জ্ঞানদা গুরুমূর্তিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনের প্রয়াস করে চলেছি—তথাপি তাঁর একখানি সম্পূর্ণ আলেখ্য রচনা আমাদের অসাধ্য। অসাধ্য এই কারণে যে, অখিল গুরুশক্তি একাধারে সন্নিবিষ্ট হয়ে বিগ্রহবতী হয়েছেন ঐ সারদা নামধেয়া শরীরখানিতে। সূর্য স্বপ্রকাশ—তার আলোকে ও তেজে বিশ্ব জেগে ওঠে, সপ্রাণ হয়, স্ব-পরিচয় বিদিত হয়। সূর্যালোকলাভ সূর্যেরই দানশক্তিতে, সূর্যতেজ অনুভব সূর্যেরই বিকিরণ-কুশলতায়। এ-জন্য কোন মাধ্যম বা অনুষঙ্গ অবান্তর আয়োজন। প্রকৃত গুরুশক্তির প্রবাহ যে আধারকে শক্তিময় বা তেজস্বান করবে, তা আপন সঞ্চারণ-স্বভাবগুণেই করে থাকে। সেখানে আর মানুষ-গুরুগণের অবলম্বনীয় লোকপ্রচলিত অন্য কিছুর অপেক্ষা থাকে না—এমনকি মন্ত্র-তন্ত্রও অনুপস্থিত বা উহ্য থেকে যায়। এই অখিল গুরুশক্তির সমষ্টিভূত যিনি—তিনি যে অবতীর্ণ ভগবান কিংবা তাঁরই অপর মায়ারূপ ভগবতী, তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়? জগদ্গুরু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে বলেছেন:

"সূর্যকে প্রকাশ করিতে মশালের প্রয়োজন হয় না। সূর্যকে দেখিবার জন্য আর বাতি জ্বালিতে হয় না। সূর্য উঠিলেই আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে সূর্য উঠিয়াছে; এইরূপে আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য লোক-গুরুর আবির্ভাব

হইলে আত্মা স্বভাবতই জানিতে পারেন যে, তাঁহার উপর সত্যের সূর্যালোক-সম্পাত আরম্ভ হইয়াছে। সত্য স্বতঃপ্রমাণ, উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই—উহা স্বপ্রকাশ; সত্য আমাদের অন্তস্তলে প্রবেশ করে, উহার সমক্ষে সমগ্র জগৎ দাঁড়াইয়া বলে—'ইহাই সত্য'। যে-সকল আচার্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য সূর্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত, তাঁহারা জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকই তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।"

(—বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃঃ ২৬)

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ঈশ্বরীরূপেই পূজিতা,—তাঁর গুরুভাবও লোক-গুরুরূপেই স্বতঃঅভিব্যক্ত। মনুষ্য-গুরুসুলভ তন্ত্র-মন্ত্রাধীনতা তাই তাঁতে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে পরিদৃশ্যমান নয়,—পরন্তু ব্যতিক্রম-স্বভাবই সমধিক লক্ষণীয় তাঁর মধ্যে। অবশ্য এ-কথাটা যেন ভুলে না যাই যে, লোকগুরুর সংশ্রয়লাভ বহু পুণ্যের ফলেই হয়ে থাকে,—পুণ্যফল থাকলেও স্থূলতঃ সেরূপ সংযোগ সর্বকালে ঘটেও না, ঘটা অসম্ভবও বটে। তাই মনুষ্য-গুরুর আশ্রয়-অপেক্ষা চিরদিনই প্রয়োজন সাধারণ আমাদের পক্ষে। স্বামিজীও উল্লিখিত প্রসঙ্গের মাঝে পরিষ্কার বলেছেন :

"...আমরা অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞানীর নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ করিতে পারি। তবে আমাদের এরূপ অন্তর্দৃষ্টি নাই যে, আমরা আমাদের গুরু বা আচার্যের সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি; এই কারণ গুরুশিষ্য উভয়ের সম্বন্ধেই কতগুলি পরীক্ষা আবশ্যক।" (—বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃঃ ২৬)

কিন্তু স্বতঃপ্রমাণিত স্বপ্রকাশ সত্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কথা—সেখানে কোন পরীক্ষা-প্রতিপক্ষের প্রশ্ন নেই,—প্রশ্নাতীত অবিতথ তত্ত্বই মাত্র বিদ্যমান সেথায়। "আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥" (কঠোপনিষৎ, ১।২।৭)

উদাহৃত গোকুলদাস দে মশায় নিঃসন্দেহে একজন 'কুশল লব্ধা'—'আশ্চর্য জ্ঞাতা'। তিনি 'অনুশিষ্ট' হয়েছেন ভূয়সী 'কুশল', আত্যন্তীন 'আশ্চর্য' এক গুরুর দ্বারা। গোকুলদাসই একক উদাহরণ নয়,—এমন 'লব্ধা' 'জ্ঞাতা' আরও কতো রয়েছেন, যাঁরা 'আশ্চর্য বক্তা' দেবী সারদার কৃপাবারি ধারণের সুকুশল পাত্ররূপে মহিমান্বিত হয়েছেন।

জ্ঞানদা সারদা দেবী মাত্র মন্ত্র দিয়েই দীক্ষাদান করেছেন—এমন কথা সকল ক্ষেত্রেই বলা ঠিক হবে না। কেননা, দীক্ষাপ্রদান করেছেন কিন্তু কোনও মন্ত্র দেননি—এ-রকম দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নয়। সাধারণ শক্তিসম্পন্ন গুরুগণ কোনও বিশেষ মন্ত্র-প্রদানের সাহায্যেই শিষ্যের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চারণ করে থাকেন।

প্রচলিত এই দীক্ষা-প্রণালীকে বলা হয়ে থাকে 'মান্ত্রী' দীক্ষা। ইষ্টদেবতার পূজাদি পূর্বক শিষ্যের কানে মন্ত্রোচ্চারণ করে দীক্ষা দেবার এই প্রণালীই সচরাচর বিদিত। কিন্তু এ-কথাও অবিদিত নয় যে, অলৌকিক শক্তির উৎসস্বরূপ বিশেষ গুরু বা দিব্যভাবাপন্ন জ্ঞানদাতৃগণ চিরাচরিত শাস্ত্রবিধির বাইরেও চলে যান কখনও কখনও, —বিচিত্র অলোকসাধারণ অঘটনীয় পদ্ধতি অবলম্বনে শিষ্যকে তাঁরা অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁরা করুণায় উদ্রিক্ত হয়ে মনোনীত পাত্রকে মাত্র ইচ্ছা-দ্বারা, কিংবা দৃষ্টিপাত বা স্পর্শমাত্রেই অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে দিতে পারেন—করেনও। কোনও রকম মন্ত্রতন্ত্র কিংবা বাহ্যিক উপকরণ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজ আধ্যাত্মিক শক্তিবলেই শিষ্যের মধ্যে যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো, তাকে শাস্ত্রে বলে 'শাক্তী' দীক্ষা। আবার এমনও ঘটেছে যে, গুরু-শিষ্যের পরস্পরে দৃষ্টি-বিনিময় বা চোখা-চোখি হওয়া মাত্রই আচার্যের বা গুরুর হৃদয়ে অকস্মাৎ কৃপার তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে শিষ্যকে অঢেল করুণায় অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং শিষ্যের জ্ঞানোদয় সাধিত হয়েছে এক নিমেষেই। এ-ক্ষেত্রে কোনও প্রকার পূর্ব-ইচ্ছা বা সঙ্কল্প কারও পক্ষেই থাকেনা.—অর্থাৎ, দীক্ষা প্রদান করব এবং দীক্ষা গ্রহণ করব, এ-রকম কোনও ইচ্ছা গুরু ও শিষ্যের আগে থাকতেই থাকে না। এই দীক্ষাকে বলা হয় 'শাম্ভবী' দীক্ষা।

বিভিন্ন তন্ত্র ও সংহিতাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত ত্রিবিধ দীক্ষারই উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বায়বীয় সংহিতা' থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে :

"শাম্ভবী চৈব শাক্তী চ মান্ত্রী চৈব শিবাগমে।
দীক্ষোপদিশ্যতে ত্রিধা শিবেন পরমাত্মনা ॥
গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি।
সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্জন্তোর্দীক্ষা সা শাম্ভবী মতা ॥
শাক্তী জ্ঞানবতী দীক্ষা শিষ্যদেহং প্রবিষ্যতি।
গুরুণা জ্ঞানমার্গেন ক্রিয়তে জ্ঞানচক্ষুষা ॥
মান্ত্রী ক্রিয়াবতী দীক্ষা কুম্ভমণ্ডলপূর্বিকা।
... ..."

অর্থাৎ, আগমাদিতে মহাদেব শিব তিনপ্রকার দীক্ষার কথা বলেছেন। যথা—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। শাম্ভবী দীক্ষায় শ্রীগুরুর দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ-প্রণামাদি মাত্রেই শিষ্যের তৎক্ষণাৎ জ্ঞানলাভ হয়ে যায়। শাক্তী দীক্ষায় দিব্যজ্ঞানময় গুরু শিষ্যের ভিতর জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা আপন শক্তিকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে

দিয়ে তার চৈতন্য সম্পাদন করেন। মান্ত্রী দীক্ষাতে মন্ত্রদানের প্রাক্‌কালে ঘটস্থাপনা, মণ্ডল অঙ্কন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মোক্ষবিধাত্রী জ্ঞানদাত্রী রূপের অনুধ্যান কালে নানা ধরণের চিত্রাবলী অবলোকনের প্রয়াস পেয়েছি আমরা। দেখেছি, দীক্ষা বা আশ্রয়প্রদানে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি স্থান-কালের অপেক্ষা করেননি। সদ্‌গুরুলাভ এক অসাধারণ দৈব সহযোগেই ঘটে থাকে। কাজেই সেখানে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কালাকালের বিচার নিষ্প্রয়োজন—"দীক্ষায়াং…ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ", এমন কথা তন্ত্রেও অনুমোদিত। আবার মাকে তাঁর জ্যোতির্ময়ী গুরুমূর্তিতে দর্শন করেছি বহুবার—যথাবিধি আচমন-পূজাদি করে নিয়ে মন্ত্র প্রদান করছেন উপযুক্ত পাত্রকে। গুরুরূপিণী সারদা দেবী এমন মান্ত্রী-দীক্ষা দিয়েছেন অগণিত জনকে। কখনও-বা তিনি বিলোকিতা হয়েছেন সকল বিধি-বিধানের পারে, কোন্ ঊর্দ্ধলোকচারিণী মূর্তিমতী জ্ঞানশক্তি—সারপ্রদাত্রী সারদারূপে। তিনি কোথাও ইচ্ছামাত্রে, কারও প্রতি দৃষ্টিপাতে অবলীলায় চৈতন্য প্রদান করেছেন। অর্থাৎ, শাক্তী ও শাম্ভবী দীক্ষাদানরতাও তাঁকে দেখেছি। একই দেহে এই ত্রিবিধ গুরুভাব কি মানুষের ধ্যান-ধারণার গম্য হতে পারে কদাপি? লীলাভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-মহাগ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে, "গুরুভাব সম্বন্ধে শেষকথা"-অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে সম্যক্ আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনিও বলেছেন:

"…গুরুভাব…কিঞ্চিন্মাত্র সহজ বা ঘনীভূত হইলে ঐ পুরুষের কার্যকলাপ, বিহার, ব্যবহার এবং অপরের প্রতি অহেতুকী করুণাপ্রকাশ সকলই মানব বুদ্ধির অগম্য এক অদ্ভুতাকার যে ধারণ করে, ভারতের তন্ত্রকার একথা বারংবার বলিয়াছেন। ঐ ভাবের ঐরূপ বিকাশকে তন্ত্র দিব্য ভাবাখ্যা প্রদান করেন এবং ঐ দিব্যভাবে ভাবিত পুরুষদিগের অপরকে শিক্ষাদীক্ষাদি-দান শাস্ত্রবিধিবিদ্ধ নিয়ম সকলের বহির্ভূত অসম্ভাবিত উপায়ে হইয়া থাকে, একথাও বলেন"

(—লীলাপ্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২১২—২১৩)

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভগবতী শ্রীসারদা দেবী অভিন্ন ও অখণ্ড এক। সুতরাং তাঁদের উভয়ের জীবন-লীলায় গুরুভাবের প্রকাশেও একই দ্যোতনা সর্বাংশে। দিব্যভাবাপন্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের উভয়েরই 'কার্যকলাপ, বিহার, ব্যবহার এবং অপরের প্রতি অহেতুকী করুণাপ্রকাশ'—'শিক্ষাদীক্ষাদি-দান'—সবই 'মানব বুদ্ধির অগম্য', 'অদ্ভুতাকার'—আবার কখনও কখনও 'শাস্ত্রবিধিবিদ্ধ

নিয়ম সকলের বহির্ভূত অসম্ভাবিত'-ও বটে! স্বামী সারদানন্দজী তাই একস্থানে বেশ একটি কথা বলেছেন—"গুরুভাব অবতার-পুরুষদিগের নিজস্ব সম্পত্তি।"

(—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', তৃতীয় ভাগ, অষ্টম অধ্যায়ের সূচনা)

* * *

"তখন বোকার মতো মায়ের কাছে মন্ত্র চেয়ে কী বেকুবিই না করেছি! এখন মনে হয়, মায়ের কাছে মন্ত্র-দীক্ষা নিয়ে শুধু খেটে মরলাম। তখন মায়ের কাছে শুধু এই প্রার্থনাই করলে যথেষ্ট হ'ত যে, 'মা, তোমার আর ঠাকুরের প্রতি আমার ভক্তি বিশ্বাস যেন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে, আর কিছুই চাই না মা'।"—এ-রকম উক্তি শুনেছিলাম আমরা, শ্রীবিদ্যা-স্বরূপা দেবী সারদার বিশেষ কৃপাধন্য, বরিষ্ঠ জ্ঞানী সন্তান স্বামী প্রেমেশানন্দজীর মুখে। দেহাবসানের প্রস্তুতি-পর্বে এমন আরও সব কথা তিনি জিজ্ঞাসু-জনের নিকট বলতেন, যার মর্মার্থ তখন কিছু উপলব্ধিগম্য হ'ত না অনেকেরই,—অথবা নিজের নিজের ভাবে সরল অর্থ বুঝে নিতেন সকলেই। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তাঁর নিজের মন্ত্র-দীক্ষা প্রার্থনাকে যিনি নিতান্তই হঠকারিতা বা স্থূলদর্শিতা বলে মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন,—অথচ তিনি মায়েরই একজন বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ্ সন্তান বলেই এতো মহনীয়! আপাত-বিপরীত এই ভাবকে অনুধাবন করা খুব সহজসাধ্য নয়,—তীক্ষ্ণ বিচার সহ মননের অপেক্ষা আছে এখানে।

উল্লেখ্য যে, তাঁর দীক্ষাকালীন অনুভূতিকে প্রেমেশ মহারাজ নানা সময়ে যে-ভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত করেছেন একান্ত ঘনিষ্ঠজনদের কাছে, তাতে কিন্তু তাঁর মাতৃ-সমীপে গমন ও মায়ের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তিতে পরম অভীষ্টসিদ্ধি-জনিত আনন্দোচ্ছাসেরই ব্যঞ্জনা দেখা যায়। জয়রামবাটীতে মায়ের পদপ্রান্তে উপনীত হয়ে, তাঁকে দর্শন করেই তিনি আনন্দে উল্লাসে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে একা একা নৃত্য করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত দীক্ষার কথা কিছুমাত্র ওঠেনি। উত্তরকালে প্রেমেশ মহারাজ তাঁর জনৈক বাল্যবন্ধুকে বলেছিলেন: "মাকে প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম তিনি কে। ধেই ধেই করে নেচেছিলামও। তার সাক্ষী ভানুপিসী এবং স্বয়ং মা।" ইন্দ্রদয়ালকে আপনভাবে একাকী নৃত্য করতে দেখে ভানুপিসী শ্রীশ্রীমাকে ডেকে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন—"দেখ মা, তোমার ঐ পাগল ছেলে একা একা কেমন গান গাইছে আর নাচছে।" মা সস্নেহে দৃষ্টিপাত

করেন তাঁর ঐ বাউল ছেলেটির প্রতি,—বাৎসল্য-জড়িত কণ্ঠে তখন ভানুপিসিকে বলেছিলেন "আমার ছেলেরা ঐ রকমই হয়।" স্বামী প্রেমেশানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য,—মাতৃচরণে সমাগত যখন, তখন তিনি শ্রীহট্ট থেকে এসেছিলেন ইন্দ্রদয়াল রূপেই। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রলাভ-প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে প্রেমেশ মহারাজ এমন কথাও বলেছেন: "যখনই মা মহামন্ত্র শুনিয়ে দিলেন, তখনই আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে প্রাণ-বায়ু বেরিয়ে গেল না কেন?"

আপাত-বিচারে পূর্বোক্ত 'বেকুবি' বা 'বোকামি' এবং উল্লিখিত অভিব্যক্তি-গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া কঠিন প্রতীয়মান হলেও,—ঘটনার গভীরে একটু দৃষ্টি দিলেই, এ-রহস্যের সমাধান-সূত্রটি মিলতে পারে, মনে হয়। আমরা তাই ইন্দ্রদয়ালের দীক্ষাপর্বটিকে নিরীক্ষণের প্রয়াস করছি। প্রেমেশানন্দ মহারাজের নিজমুখের কথাই এখানে উৎকলিত হচ্ছে। অনুলিখিত সে-ভাষা এই:

"১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের কাছে দীক্ষার জন্যে জয়রামবাটী যাত্রা করি। মেদিনীপুরের পথ দিয়ে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম। হাওড়া স্টেশনে সম্ভবতঃ একটি ইণ্টারক্লাশের গাড়িতে উঠেছিলাম। ট্রেনের সেই কম্পার্টমেন্টের একজন যাত্রী ভদ্রলোক অযাচিত ভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। সে সময়ে আবার পুলিশের খুব উপদ্রব ছিল। আমি যথাসম্ভব এড়িয়ে এড়িয়ে কথার উত্তর দিচ্ছিলাম। ভদ্রলোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'আপনি কোথায় যাবেন, আপনার কি পরিচয়? ইত্যাদি'। আমি তো বিরক্ত হলাম। বললাম জয়রামবাটী যাব। তাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়রামবাটী কেন যাবেন?' উত্তর দিলাম—সেখানে আমার গুরু থাকেন। আবার প্রশ্ন হল, 'কে আপনার গুরু?' এইসব কথাবার্তা হয়েছিল, সব মনে নেই। ভদ্রলোকটি মহা খুশী হয়ে বললেন, 'আমিও তো ঐখানেই যাব।' তিনি ছিলেন জয়রামবাটীর পাশের গাঁয়ের (শিবটের) জমিদার বাড়ির লোক। তিনি আদর করে আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। দুপুরে রোদে জয়রামবাটী যেতে না দিয়ে, পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে আমার জন্য আলাদা বামুন দিয়ে রান্না করিয়ে পরম সমাদরে খাওয়ার ব্যবস্থাও করলেন। সঙ্গে মায়ের জন্য কিছু ফল ছিল, লোক দিয়ে সেগুলি জয়রামবাটী পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করে দিলেন তিনি। বিকেলে রোদ পড়লে জয়রামবাটী পৌঁছালাম। ভদ্রলোক যখন আমাকে গুরুর মতো সমাদরে আসনে বসিয়ে যত্ন করে খাওয়াচ্ছিলেন তখন আমি মনে করেছিলাম—ওগুলো আমার প্রাপ্য। আমি যে একটা বিখ্যাত বংশের—সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে—ভদ্রলোক সেটা

বুঝতে পেরেই এমন আদর যত্ন আমাকে করছেন।...পরে বুঝেছিলাম তা মোটেই নয়। মা কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই ঐ ব্যবস্থাটি করেছিলেন।

"মাকে বললাম, 'মা, দীক্ষার জন্য এসেছি তোমার কাছে।' মা শুনে বলেছিলেন 'বাবা তোমাদের তো গুরুগোঁসাই আছে।' তখন দু'হাত জোড় করে আবেগের সঙ্গে আমি মাকে জানিয়েছিলাম, 'তাতে তো শান্তি হচ্ছে না, মা। তুমি যদি স্থান না দাও তবে আর কোথায় যাব, মা?' মা তখন বললেন—'আচ্ছা বাবা, কাল হবে।' এখন ভাবি—তখন আমার এত ব্যাকুলতাও ছিল যে, অমন করে মায়ের কাছে বলতে পেরেছিলাম। পরের দিনই মা দীক্ষা দিলেন। পূর্বে কুলগুরু যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রই একটু অদল-বদল করে দিলেন। দীক্ষার সময়ে কিন্তু মা আমাকে কুলগুরুর কাছ থেকে পাওয়া মন্ত্র জিজ্ঞাসা করেন নি। নিজেই ঠিক করে দিয়েছিলেন।"

এই দীক্ষার কথাতেই তিনি তাঁর বাল্যের সহপাঠী, মায়েরই চরণাশ্রিত সন্তান শ্রীলাবণ্য চক্রবর্তীকে যা' একবার বলেছিলেন, তা'ও এখানে স্মরণযোগ্য,—আমাদের আলোচ্যমান প্রসঙ্গটির উপরে যথেষ্ট আলোকপাত করবে সে-উক্তিগুলিও। লাবণ্যবাবুকে প্রেমেশ মহারাজ বলেছিলেন:

"দীক্ষার জন্য মাকে সামান্য চাপ দিতেই মা সাগ্রহে দিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি বুঝলাম, যে-বস্তু লাভের জন্য বীজমন্ত্র দরকার, যাঁকে চাওয়া পাওয়ার জন্যই দীক্ষা, তাঁকেই যখন লাভ করা গেল, তবে আবার এই দীক্ষার কি প্রয়োজন? মাকেও ঠিক এই কথাই প্রকাশ করে বলেছিলাম। মা শুনে হেসে বলেছিলেন: 'বেশ তো বাবা, তোমার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হোল।'"

হ্যাঁ, তাঁর 'ভিত্তি আরও সুদৃঢ়'-ই হয়েছিল জগদম্বার সেদিনের অনুগ্রহান্বিত নয়নপাতে,—তাঁর ভাবী জীবনই জলন্তভাবে সে-সাক্ষ্য বহন করেছে, সকলেই তা দেখেছেন। আত্মচরিত বিশ্লেষণের আদতে, জীবনসন্ধ্যাতে একদিন তিনি সমীপবর্তী জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে প্রণিধানযোগ্য। 'উদ্বোধন' ৭৪ বর্ষ, নবম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, সেদিনের সংলাপ। শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি তাঁর মুখে শুনতে চাইলে প্রেমেশ মহারাজ জবাব দিয়েছিলেন:

"মায়ের স্মৃতি সম্বন্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। Theoretically বুঝতে পারতাম যে, মা অবতারের সঙ্গিনী ইত্যাদি, আর কিছুই বুঝিনি। কিন্তু পরে সত্যিই বুঝলাম যে, মা সত্যিসত্যিই মা—জগজ্জননী—আদ্যাশক্তি। কুলগুরুর

কাছে তো শৈশবকালেই যথারীতি দীক্ষা হয়েছিল—সেই দীক্ষা নিয়ে যে মন্ত্রের সাধন করেছিলাম—তারই সিদ্ধি হয়েছিল যেদিন প্রথম মায়ের দেখা পেলাম। একথা তখন বুঝতে পারিনি। মা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আর দীক্ষা দিতে চাননি। এখন মনে হয়, মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে শুধু খেটে মরলাম।"

'মা বুঝতে পেরেছিলেন তাই আর দীক্ষা দিতে চাননি।'—এ-কথাটিও লক্ষণীয়। মা তাঁর সন্তানের অসামান্য উচ্চ অধিকার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই কি পৃথক মন্ত্রদান করতে তখন অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন অমন: 'বাবা তোমাদের তো গুরুগোঁসাই আছে'—এই কথা বলে? এখানে তক্ষুণি মাকে 'জগজ্জননী' 'আদ্যাশক্তি'—সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী রূপে অপরোক্ষ ঠিক না হলেও, 'পরে সত্যিই বুঝলাম' প্রেমেশ মহারাজের এই উক্তিটি কি খুবই তাৎপর্যময় নয়? শ্রীশ্রীমা কি সুযোগ্য অধিকারীকে ইচ্ছা-সহায়ে কিংবা দৃষ্টিপাতেই 'সদ্যোমুক্তিবিধায়িনী' শাক্তী অথবা শাম্ভবী দীক্ষাদানেই কৃতকৃতার্থ করে দিয়েছিলেন প্রথম সাক্ষাতেই? তাই কি মন্ত্রদীক্ষার প্রশ্নও যখন ওঠেনি, তখনই সেই প্রথম দর্শনলাভের পরেই ইন্দ্রদয়ালের দেহ-মন এক অভূতপূর্ব উদ্বেল আনন্দ-হিল্লোলে নৃত্য-গীতময় হয়ে উঠেছিল? রুদ্রযামল তন্ত্রেও কি এই আভাসই পাওয়া যায় না? সেখানে বলা হয়েছে: "শাক্তী চ শাম্ভবী চান্যা সদ্যোমুক্তিবিধায়িনী"। রুদ্রযামলে আরও আছে:

"অভিসন্ধিং বিনাচার্য শিষ্যয়োরুভয়োরপি।
দেশিকানুগ্রহেনৈব শিবতা ব্যক্তিকারিণী॥"

কোনও প্রকার পূর্ব অভিসন্ধি ছাড়াই শ্রীগুরুর অনুগ্রহ শিষ্যের ভিতর অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞানোদয় করিয়ে দিয়ে থাকে।

প্রেমেশ মহারাজ তাঁর উক্ত মাতৃ-স্বরূপানুভূতির কথা প্রকারান্তরে ব্যক্ত না করে পারেননি। যদিও সুকৌশলে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন,—শ্রীশ্রীরাজা মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দের আড়ালে। উত্তরকালে তাঁর মুখে শোনা যেত:

"...মায়ের কাছে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির মার মতোই তিনি হয়তো তরকারি কুটছেন বা সংসারের কোন কাজ করছেন। দীক্ষার সময় মা যখন কর-গণনা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তখন মায়ের হাতের দিকে লক্ষ করে দেখি—এ যে বাড়ির মার হাতের মতোই কুটনো-কোটা হাত। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করতাম, 'মা, তোমার শরীর কেমন আছে?' ইত্যাদি মামুলি কথা। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) কিন্তু মাকে প্রণাম করতে গিয়ে তাঁর কাছে বেশিক্ষণ

থাকতে পারতেন না—তিনি কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে কোন রকমে প্রণাম করেই আবার কাঁপতে কাঁপতে চলে আসতেন। মহারাজ বোধ হয় দেখতে পেতেন যে, মা All Inclusive, মায়ের উদরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তাই বোধ হয় তাঁর অমন হ'ত। আমরা তো এসব কিছুই বুঝতে পারতাম না।"

কথাগুলি শুনতে কেমন লাগছে না কি? এ যেন কেনোপনিষদের সেই মন্ত্রাংশটির মতোই শুনতে অনেকটা,—যেখানে আত্মজ্ঞান-পরিতৃপ্ত শিষ্য সোচ্চারে বলেছেন (—'কেনোপনিষৎ ২।২'):

"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।"

আমি মনে করি না যে, আমি তাঁকে বেশ ভাল করেই জেনেছি—অর্থাৎ 'জানি না' এমন মনে করি না, আবার 'ঠিক জানি' তাও মনে করি না।

আসল কথাটি হচ্ছে—"তাঁকে জানি না, তা'ও নয়,—সম্পূর্ণ জেনে ফেলেছি সেটিও ঠিক নয়",—এমনভাবে যিনি নিজ উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেন, বুঝতে হবে তিনিই তাঁকে সত্য সত্য জানেন।

"যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

তাঁকে জানি না, জানিও,—এই-ই বুঝি জ্ঞানীর ভাষা। অথবা, তাঁকে জানি না নয়, জানি যে তা'ও নয়—এমনই বুঝি আত্মজ্ঞানের সঠিক স্বীকৃতি! 'নো ন বেদ, বেদ চ'। আমরাও বারে বারেই শুনলাম: 'বুঝিনি' এবং 'বুঝেছি' !!

* * *

একদল গাঁজাখোর এক জায়গায় মিলিত হয়েছে—পরস্পর সুখ-দুঃখের কথা আলাপ করতে করতে রাত গভীর হয়ে পড়েছে। গাঁজার নেশা তখন পেয়ে বসেছে সবাইকে,—কিন্তু গাঁজা আছে, কলকে আছে—আগুন কোথায়? মহা সঙ্কট উপস্থিত হল। এদিকে আকাশে জ্বল্ জ্বল্ করছে উদিত পূর্ণচন্দ্র। একজন বিজ্ঞ গাঁজাখোর বললে, 'ওই তো আগুন জ্বলছে, দে আমাকে টিকা, ওখান থেকেই ধরিয়ে দিচ্ছি।' বলেই হাত উঁচু করে আকাশের দিকে তুলে ধরল! ব্যর্থ চেষ্টা—টিকা ধরল না। বিজ্ঞতর এক গঞ্জিকাসেবী তাতে বিরক্ত হয়ে বলে—'দূর্ চাঁদ কি অতো কাছে! দে আমাকে দে,—তোদের কম্ম নয়'। সে তখন টিকা হাতে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে গেল। কিন্তু অবস্থা তো একই হল। ফিরে এল সে হতাশ হয়ে। এবারে বিজ্ঞতম গঞ্জিকাবিদ উঠে এসে দাঁড়ালেন,—সবাইকে

ভৎ'সনা সহকারে টিকা হাতে নিয়ে সে এক নিকটবর্তী গাছে চড়ে বসল,—সেখান থেকে উর্ধ্বপানে হাত বাড়িয়ে, প্রাণপণ ফুঁ দিতে থাকল। কিন্তু সে-ও পরাস্ত হয়ে গাছ থেকে লম্ফ প্রদান করে নেমে এল। গাঁজাখোরদের সমস্ত শক্তিই পরাভূত হ'ল এইভাবে।

সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ ব্রহ্ম কিংবা সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তির কাছে শিষ্যরূপে উপনীত হয়ে, তাঁর কাছে মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করাও অনেকটা আকাশে উদ্ভাসিত চন্দ্রজ্যোতিঃর নিকট এক কণা অগ্নি স্ফুলিঙ্গ যাচার মতোই তো বিড়ম্বনা মাত্র! অবশ্য যতোক্ষণ না-জানা, না-বুঝার ব্যাপার, ততোক্ষণ অমন প্রার্থনা করতেই হবে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"।

মাতৃঅঙ্কশায়ী শিশু তার মাকেই মাত্র জানে,—আবার সত্যিই কি সে তার মাকে পুরোপুরি জানে? কিন্তু মায়ের বক্ষতাপকে শিশু যে তার সর্বাঙ্গে অনুভব করে, এ-কথা কে অস্বীকার করবে? তা' বলে কি ঐ শিশু কখনও স্পর্ধিত বোধ করবে যে, সে তার জননীর বুকভরা অপর্যাপ্ত স্নেহকে সম্পূর্ণটাই আয়ত্ত করতে পেরেছে? তথাপি এ-কথাও ধ্রুব সত্য যে, ঐ কচি শিশুটি মায়ের বুকের যতো-টুকু স্নেহতে তার তৃপ্তি ও শান্তি ততোটুকুকে সে প্রাণভরেই উপসেবন করে থাকে,—করেও ফুরাতে পারে না। সে তার আপন সাধ্য, সংস্কার ও অনুভব-সামর্থ্য দ্বারা, এ-টুকু ভালভাবেই জানে ও বুঝে যে, তার যাবতীয় আরাম, ক্ষুধার নিবৃত্তি, তৃষ্ণার শান্তি, ব্যথার নিরসন, ভয়ের মোচন -সকল সঙ্কটের ত্রাণ—তার সমস্ত প্রাপ্তি এক-মাত্র মায়েরই কাছে। শিশু তাই তার মাকে ভালই জানে,—আবার সম্পূর্ণ জানেও না।

স্বামী প্রেমেশানন্দ ছিলেন মাতৃঅঙ্কশায়ী এক অতি পুরাণ—পুরাতন হয়েও নবীন শিশু। তাই তাঁর উক্তিতে ঐরূপ 'জানি না' ও 'জানি'—বুঝতে 'পারিনি' ও 'বুঝলাম'—উভয় ব্যঞ্জনাই ধ্বনিত। আকুতি মিনতি ও প্রার্থনাও যেমন তীব্র,—আবার তার জন্য ক্ষোভ-প্রকাশও তেমনই হৃদয়স্পর্শী গভীর!!

যাঁকে পাবার জন্য এতো জপ-তপ-সাধন—তাঁকে যতোক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণই মন্ত্রের প্রয়োজন, মন্ত্র-জপের আবশ্যকতা—গুরুর জন্য অনুসন্ধান, মন্ত্রলাভের জন্য মিনতি! তাঁকেই যখন প্রাপ্ত হওয়া যায়,—জীবনের সেই চরম আপ্তির ক্ষণে তাঁর আর কোন্ সাধনের অপেক্ষা? কিসের জন্য মন্ত্র? শিশুর ক্রন্দন মায়ের কোলে তার নিশ্চিত ঠাঁইটুকুকে পাকা করে নেবার জন্যই, —মা যখন দু'হাত বাড়িয়ে সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে, আপন কোমল বক্ষে আঁচল ঢাকা দিয়ে জড়িয়ে

রাখলেন,—তখন আর কোথায় থাকে ক্রন্দন ? শিশু তখন ভাবে না কি, কান্নাকাটি করে অযথা কি বেকুবি-ই করেছি ?—'শুধু খেটে মরলাম' !

ইন্দ্রদয়াল কুলগুরুর কাছে যে-দীক্ষা-মন্ত্র পেয়েছিলেন—সেই মন্ত্রের প্রমগ্ন সাধনে ও তন্নিষ্ঠ জপাদির ফলশ্রুতি হিসাবেই তিনি মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সাক্ষাৎকার করে-ছিলেন জয়রামবাটীতে। এই সত্যটি ঠিক প্রথম দর্শনের ক্ষণটিতেই হয়তো তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি,—কিছু পরে উঠেছিল। তাই সত্যপ্রতিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞের মুখে ঐরূপ স্বীকারোক্তিই শোনা যেত! আমরা তাঁর মুখের কথা যে-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে—এখানেও তারই পুনরুক্তি তুলে ধরছি মনন-সৌকর্যের জন্য ঃ

"Theoretically বুঝতে পারতাম যে, মা অবতারের সঙ্গিনী ইত্যাদি, আর কিছুই বুঝিনি! কিন্তু পরে সত্যিই বুঝলাম যে, মা সত্যিসত্যিই মা—জগজ্জননী আদ্যাশক্তি। কুলগুরুর কাছে তো শৈশব কালেই যথারীতি দীক্ষা হয়েছিল—সেই দীক্ষা নিয়ে যে মন্ত্রের সাধন করেছিলাম—তারই সিদ্ধি হয়েছিল যেদিন প্রথম মায়ের দেখা পেলাম। একথা তখন বুঝতে পারিনি। মা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আর দীক্ষা দিতে চাননি।"

শুভ্রশির শ্রুতিও তো তাই শুনিয়েছেন আমাদের—'নাহং মন্যে সুবেদ ইতি,'—আবার একেবারে তাঁকে 'ন বেদ ইতি' তা'ও বলবার জো নেই। 'বুঝিনি'—কিন্তু 'বুঝলাম'-ও। প্রেমেশ মহারাজ শ্রীদেবী সারদাকে জানতেন তাঁর চির-জীবনের সাধনার ধন—তাঁর জীবনের জীবন, আনন্দ। শুভ্রকেশ ঐ আনন্দময় শিশুটিকে যাঁরাই ঘনিষ্ঠচোখে দেখেছেন, তাঁদের সকলেরই এই বিশ্বাস জেগেছিল যে,—শেষ নেই, শেষ নেই,—এঁর জীবন শেষ হয়ে যাবে তবু এঁর মাতৃ-সন্নিধির আনন্দ শেষ হবে না। অশীতি-উত্তর বর্ষিষ্ঠ এই শিশুটিকে দেখে সহজেই অনুমিত হ'ত, বাল্য থেকে আজ পর্যন্ত কতো নব নব রসে ইনি জগন্মাতাকে পেতে পেতে এসেছেন—ইনি না জেনে, না বুঝেও তাঁর আভাস পেয়েছেন, আবার জেনে বুঝে তাঁর স্বরূপের রস আস্বাদ পেয়েছেন। কে জানে? হয়তো এমনি ভাবেই সেই অনন্ত রহস্যময়ী সারদা তাঁর অন্তহীন গোপন বিচরণ ও অপ্রেক্ষণীয় কটাক্ষপাতে এই প্রিয় শিশুটির হৃদয়ে বিস্ময়-আনন্দের নতুন নতুন তরঙ্গাঘাত সৃজন করেছেন—তারই স্পর্শে ও আলোড়নে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রেম-ঈশ-আনন্দরূপ সহস্রদল পদ্মটির পাপড়িগুলিকে একটি একটি করে!

জনৈক স্নেহভাজন সন্ন্যাসীকে প্রেমেশ মহারাজ একবার এক পত্রে প্রসঙ্গক্রমে লিখেছিলেন ঃ

"মায়াধীশ্বরী মাথায় পা দিয়া করুণানয়নে চাহিয়া ছিলেন—সমাধির পারে যে রতন-মাণিক আছে, দিতে চাহিয়াছিলেন সমুদয়,—কিন্তু নিলাম না।"

পত্রোল্লিখিত এই উক্তির নিহিত ইঙ্গিত শুধুমাত্র অনুচিন্তনের বিষয়,—যাতে মায়াধীশ্বরী শ্রীসারদার গুরুমূর্তির ভাস্বরতা এবং তাঁর আশ্রিত সন্তান শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দজীর প্রোজ্জ্বল মহনীয়তা আমাদের চিত্তকে স্বতঃই আবিষ্ট করে। ভাষায় ব্যাখ্যা করে এ-আবেশকে বিঘ্নিত করা—সেতার বাদনের পরে ঢাকের বাদ্যের মতো শোনাবে।

* * *

"মার বাড়ি কোনটা বলতে পারেন?"

"আমি সেখানেই এসেছি, আসুন আমার সঙ্গে।"

"আপনার নাম?"

"নাম? আমার নাম নেই, গোত্র নেই, বংশ নেই, আমি মায়ের পূজোর বলি। কেবল উৎসর্গের অপেক্ষা।"

কথাগুলো হচ্ছিল জয়রামবাটীর গ্রামে ঢোকার পথে। বিষ্ণুপুর থেকে সারা-রাত হেঁটে এক যুবক চলেছেন মাতৃ-সন্দর্শনে,—আর তাঁকেই দেখতে পেয়ে সহযাত্রী জনৈক পথিকের ঐ জিজ্ঞাসা—মার বাড়িটা চিনিয়ে দিতে। পথিকের চেহারা ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, বয়সে তরুণ, মাথায় এক রাশ অবিন্যস্ত রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, আয়ত চোখ দু'টি জবাফুলের মতো লাল। নাম ধাম জিজ্ঞাসা করতেই সে হো হো করে উচ্চহাস্যে ফেটে পড়ে। বলে, "নাম? আমার নাম নেই, গোত্র নেই, বংশ নেই, আমি মায়ের পূজোর বলি। কেবল উৎসর্গের অপেক্ষা।"

অনামক সেই 'মায়ের পূজোর বলি' আর মাতৃদর্শনার্থী ঐ যুবক ভক্তটির পথের আলাপ সহসা আমাদেরও লেখনীকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছে। 'মায়ের পূজোর বলি' সশরীরেই মায়ের কাছে চলেছে বলিপ্রদত্ত হতে। উপস্থিত তাকেই অনুসরণ করব আমরা।

যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে 'পূজোর বলি'টিও সটান মায়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির,—বাঞ্ছিত চরণদু'খানি নয়ন-সম্মুখে দেখেই ছোকরাটি দণ্ডবৎ পতিত হল। বিচিত্র এক দৃশ্য। উন্মাদ সে মোটেই নয়,—পরন্তু অত্যন্ত উন্মদ মাতৃপদে চির আশ্রয়

আকাঙ্ক্ষায়। শ্রীশ্রীমা এক ঝলক দৃষ্টিপাত করেই বললেন, "স্নান করে এসো।" শোনামাত্রই পুকুরে ডুব দিয়ে এল ছেলেটি। একেবারে মার পাশে বসে ডালায় করে মায়ের দেওয়া মুড়ি-জিলিপি খেতে শুরু করে দিল অতি শান্ত শিশুটির মতো। চোখ-মুখের উগ্রভাব তখন কোথায় বিলীন। মা স্নেহভরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। খাওয়া শেষ হলে, মা বললেন—"এবার জল খাও।"

স্বর্গ তখন ধরাতলে—শান্তশ্রী জয়রামবাটীতে। মা তাঁর নিজের 'বলি'কে নিজেই হাতে ধরে, ঘরের মধ্যে ঠাকুরের আসনের সম্মুখে নিয়ে গেলেন। সঙ্গী সেই ভক্ত যুবকটি এতোক্ষণ কাছে কাছেই ছিলেন,—সাক্ষীস্বরূপ হয়ে তিনি সবই দেখছিলেন ও শুনছিলেন। এবার তিনি আড়ালে চলে গেলেন। অতঃপর মা তাঁর 'বলি'কে কী-ভাবে গ্রহণ করেছিলেন—ঐ দামাল ছেলের সঙ্গে মায়ের কী কথা হ'ল, তা কেউই জানে না,—জানার কোন সূত্রই ছিল না। তবে অনুমান করা চলে, মাতৃদেবীর কাছে ছেলেটি আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছে—মা তাকে দীক্ষাপ্রদান করেছেন। যাই হোক, দীক্ষান্তে মায়ের হাতে সে প্রসাদও পেয়েছে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে অন্নপ্রসাদ পেয়ে, খুব সুখে পরম নিশ্চিন্তে কৃপাধন্য অনামক সেই অশান্ত দুর্দান্ত ছেলেটি বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে,—দেখে মনে হচ্ছিল, মায়ের কোলে একটি দস্যি ছেলে যেন ঘুমন্ত। ঘুমন্ত সন্তানকে দেখে শ্রীশ্রীমা উক্তি করেছিলেন: "এবার ওর শেষ জন্ম। এরা এমন অশান্ত হয়।"

অবিশ্রুত কিন্তু শ্লাঘনীয় এই জীবন্মুক্ত মাতৃচরণাশ্রয়ীর কথা চিরদিনই অবিদিত থেকে যেত, যদি না দিবালোকে আনীত হ'ত প্রত্যক্ষদর্শী একজনের দ্বারা। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী, বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদিক-সম্পাদক এবং মায়ের সন্তান শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারই এই চরিত্রটিকে জ্ঞাপিত করেছেন প্রথমে। উল্লেখ্য যে, নাটকের মতো বর্ণিত উল্লিখিত কাহিনীটিতে মাতৃ-দর্শনার্থী ভক্ত যুবকটিই হচ্ছেন সত্যেন্দ্রনাথ নিজে। সত্যেন্দ্রনাথই উক্ত অনামা পথিক ছেলেটিকে মায়ের চরণপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং সে-যাত্রায় যে-কয়দিন তিনি জয়রামবাটীতে ছিলেন, সেই কয়-দিনেই ঐ ছেলেটির সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মেলা-মেশার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। বিকেল বেলা দু'জনেই একসঙ্গে বেড়াতেন মাঠে-প্রান্তরে, নদীর ধারে। সত্যেন্দ্রনাথ বিস্মিত হয়েছিলেন,—তার চেহারায় সেই উদ্দাম দুর্মদ উগ্র উত্তেজনার ভাবটি কোথায় অন্তর্হিত হয়েছিল!—স্নিগ্ধ শান্ত কণ্ঠস্বর বড় আকর্ষণীয় করে তুলেছিল অচেনা অজানা সেই কিশোরকে। প্রথম দিনই সে বিকেলে বেড়াবার কালে

উচ্ছ্বাসভরে বলেছিল : "আজ আমার নবজন্ম—কিনা শেষজন্ম। একটা অসম সাহসিক কিছু করে দেশজননীর পায়ে জীবন বলি দেওয়া আর হয়ে উঠল না,—বিশ্বজননীকেই আমার সর্বস্ব সঁপে দিলাম। আর কোনও ক্ষোভ নেই, মনের জ্বালা নেই।"

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁর পুণ্য মাতৃ-স্মৃতি প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এই নতুন সৌভ্রাত্রকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে ভোলেননি। কেননা তাতেও শ্রীশ্রীমায়েরই অপ্রাকৃত বিভূতি ওতপ্রোতভাবে প্রকটিত। তিনি লিখেছেন :

"একবার আমরা মিশনের সাধুদের সঙ্গে মুঙ্গেরে প্লেগরোগীর সেবাকার্যে যাই। আর্তের সেবায় এমন নিরলস নিরহঙ্কৃত কর্তব্যপরায়ণতা অতি অল্প মানুষে প্রত্যক্ষ করেছি। কালব্যাধি সে নিজের দেহে তুলে নিল, মৃত্যুর পূর্বে একবার চোখ মেলে শুধু বললো,—'মা এসেছেন, এইবার যাই'। কলকাতায় ফিরে মাকে সংবাদ দিতে তিনি নতনেত্রে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।"

(—'উদ্বোধন', শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৪৬)

মায়ের শ্রীপদে বলিপ্রদত্ত এই নাম-গোত্র-কুল-পরিচয়হীন, অপ্রথিত, অদ্ভুত মুক্তপুরুষটি কোথা থেকে এলেন, কোথায় গেলেন—তা একমাত্র মা-ই জানেন, নরলোকে তিনি চির অজানাই রয়ে গেলেন। বলিপ্রিয়া মাতা এমন আরও কতো জীবনকে বলিরূপে গ্রহণ করেছেন, তার সাক্ষ্য দেবার মতো 'সত্যেন্দ্র'-ই বা আর কয়জন আছেন জগতে ?

সারদা অভীষ্টরূপা জ্ঞানদা—আবার সর্বজীবের মা—দীর্ঘ অজ্ঞান-অমানিশার শিয়রে বিতন্দ্রা জননী—আর্তপ্রহরের প্রহরিণী। অভয়া-মোক্ষদা শ্রীগুরু-প্রকটা। বলিপ্রিয়া সর্বভোগ-অবসানকরী। চিদানন্দময়ী কল্যাণবৃষ্টিরূপা। অখিলগুরুভাব-বিগ্রহা দেবী সারদার মহিমা ও কার্য বর্ণনার অতীত। অপ্রমেয়া অবাচ্যা অবর্ণনীয়া। "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্"। (—কেনোপনিষৎ, ১।৬) আমাদের এই মন দিয়ে তাঁকে মনন করা চলে না। তিনি যে আমাদের সকল মনেরও কারয়িত্রী, করণ-কারিকা। তাঁর গতিবিধি কার্যকলাপ আমাদের মনের অগম্য, বুদ্ধির অগোচর। তিনি নিত্যপবিত্র—পবিত্রতাকারিণী। তিনি চিরশুচি —শুচিপ্রদায়িনী। তিনি নিত্যানন্দময়ী—শোকদুঃখাতীতা। তিনি ঈশানী—তিনি অঘোরা। বামদেবী তিনি—সদ্যোজাতা তিনি। ভবানী সর্বমঙ্গলা

সারদা—আবার তিনিই রুদ্রানী ত্রিশূলিনী চণ্ডিকা—শ্মশাননিলয়া শ্মশানপ্রিয়া।

* * *

"ওগো তোমরা আমার মাকে কোথায় নিয়ে গেলে গো!"

বুকফাটা এই আর্তনাদে সারা গ্রাম তোলপাড়। প্রসন্ন মামার বড় মেয়ে নলিনী কান্নায় ভেঙে পড়েছে—দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানহারা হয়ে উন্মাদিনীর মতো ছুটাছুটি করছে—মাথা ঠুকছে আর বুক চাপড়াচ্ছে। ছোট মেয়ে মাকু তখনও কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না,—তার মা কোথায়, কেনই-বা এতো কান্নাকাটি। অবোধ শিশু জানতে পারেনি—তাকে আদর করে কোলে নেবার জন্য সংসারে কেউই আর রইল না! সদ্য-মাতৃহারা দু'টি মেয়ে সত্যিই কি মা-হারা হয়েছিল? কিংবা বিশ্বমাতার স্নেহাঞ্চলে নিত্যকালের জন্য আশ্রয় পেয়েছিল সেদিন থেকেই? যা'ই হোক, সেই দিনটি ছিল এক মহা দুর্দিন—মৃত্যুর ভীষণ কালো ছায়াতে যেন সমস্ত বাড়িখানাকে, বাড়ি কেন, সমগ্র পল্লীবেই তখন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। শোকের দহনে বাড়িশুদ্ধ সবাই তখন পুড়ছে। সকলেরই মনে আতঙ্ক,—কি-হয়, কি-হয় ভাব! আমোদরের তীরস্থ ধূমিত চিতার বাষ্প গন্ধে জয়রামবাটীর আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন সেই কালে।

আমাদের বড় মামী—প্রসন্ন মামার স্ত্রী দুপুরে রন্ধনাদি সবই করেছেন—চাকর-মুনিশদেরও পরিবেশনাদি করে খাওয়ালেন। কিন্তু তার পর থেকেই সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন—ক্রমেই প্রবল কলেরার লক্ষণ দেখা দিল। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে। গ্রামদেশে ডাক্তার-কবিরাজ কাউকেই পাওয়া গেল না। বরদা মামা এবং আর আর সবলে মিলে তাঁদের সাধারণ জ্ঞান-গম্যি মতো রোগিনীকে আরাম দেবার চেষ্টা বহু করেছিলেন। কিন্তু সবই বৃথা হয়েছিল। ঐদিন রাত্রেই মামী অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একরূপ বিনা চিকিৎসাতেই মামী চলে গেলেন ইহধাম ছেড়ে। সেই রাত্রেই দেহ সৎকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়,—বাড়িতে তখন কান্নার রোল। নলিনী-দিদি তখন বালিকা, মাকু অতি শিশু। নলিনী তো তার মায়ের শেষ যাত্রা থেকেই কান্নায় আছাড়্‌-পিছাড় খাচ্ছে। আর মাকু ফ্যাল্‌ফ্যা'ল্‌ চোখে সব কিছু দেখে-শুনে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। শ্রীশ্রীমা ঐদু'টি মা-হারার কাছে সেই দিন থেকেই সত্যি সত্যি,—না, সত্যেরও অধিক 'মা' হয়ে

আবির্ভূতা হলেন। ঘট শূন্য থাকেনি ক্ষণকালের জন্যও,—জ্যোতির্ময় আকাশ এসে ঘটকে পূর্ণ করে দিয়েছিল। যাক্, সে অন্য কথা। আমাদের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র।

কলকাতা থেকে দুই বন্ধু গিরিজা ও বটু জয়রামবাটীতে গিয়ে উপস্থিত ঠিক সেই দিনেই,—যেদিন মাতুলদের গৃহে ঐ ভয়ঙ্কর মরণ কোলাহলে সকলেই বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

মাতৃ-দর্শনার্থী বন্ধুদ্বয় জয়রামবাটীতে মায়ের চরণপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হওয়া মাত্রই এক মহা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলেন। শ্রীশ্রীমা অতি করুণ-স্বরে জানালেন—"বাবা, বড় বউয়ের কলেরা হয়েছে। এই দুপুরে রান্না বান্না করলে, চাকরদের খাওয়ালে—তারপর থেকে হঠাৎ ভেদ বমি চলছে। এ বেলা আর কে রান্না করে! পান্তা ভাত আছে খাবে?" গিরিজা ও বটু মায়ের দেওয়া পান্তাভাতই অপূর্ব তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বরদা মামা ততক্ষণে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছেন,—গিরিজাকেও অনুনয় করে বড় মামীর শয্যাপার্শ্বে টেনে নিয়ে গেলেন, কিছু একটা বিহিত তিনি করতে পারেন কিনা, রোগিনীর কষ্টের কিছু উপশম প্রদান সম্ভবপর কিনা। কিন্তু হায়! সেই রাত্রেই বড় মামী প্রয়াণ করলেন। রোগের আক্রমণ থেকে বারো ঘণ্টাও কাটেনি তখন। মেয়েদের ক্রন্দন ও হাহাকার সকলকেই চঞ্চল করে তুলেছিল,—শোকার্ত গ্রামবাসীরাও এসে জড়ো হতে থাকল। সেই গভীর রাত্রেই শবযাত্রা করা হল। বড় মামী চলে গেলেন,—পিছনে পড়ে রইল তাঁর সংসার—দু'টি ফুলের মতো সন্তান নলিনী ও মাকু। শ্রীশ্রীমা দুই হাতে আগলিয়ে রেখেছেন দুজনকে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে তাঁর শিশুকন্যা রাধারাণী—রাধু তো শ্রীশ্রীমায়েরই স্নেহাঙ্কে লালিতা হচ্ছেই—আজ থেকে রাধুর সঙ্গে যুক্ত হল আরও দুইটি—নলিনী ও মাকু। নিরাশ্রয়ের পরম আশ্রয় দেবী সারদা—অশরণের একান্ত শরণ শ্রীশ্রীমা।

অমন দুঃখের পরিবেশে সহসা না-জেনেই এসে পড়েছিলেন গিরিজারা। দুঃখ তো চরম দুঃখ,—একেবারে মৃত্যুময় আবেষ্টনে বদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ওঁরা। কলকাতা থেকেই গিরিজার মনে একটা সুপ্ত আশা ছিল,—যদি মা কৃপা করে মনোবাসনা পূর্ণ করেন। কিন্তু এই শোকজর্জর পরিস্থিতিতে মায়ের কাছে ঐ-রকম কোনও প্রার্থনা জানানোই হবে অত্যন্ত অসংলগ্ন প্রস্তাব,—বিশেষতঃ ঠিক সেই দিনটিতেই, যেদিন চিতাগ্নির তাপ তখনও পর্যন্ত শোকপ্রবাহরূপে সেখানকার সকল হৃদয়কেই স্পর্শ করে চলেছে। গিরিজার নিজের উক্তিই এখানে স্মর্তব্য :

"আমি দীক্ষা লইবার আশায় মার নিকট গিয়াছিলাম কিন্তু ঐ অবস্থায় আর কি

করিয়া দীক্ষা'র কথা বলি? মনে হইল যাই, আনুড়ে বিশালাক্ষীদেবী দর্শন করিয়া আসি। মাকে এই অভিপ্রায় জানাইতে তিনি বলিলেন, 'কত আশা করে এসেছ, স্নান করে এসো, যা হয় বলে দি।' মা দীক্ষার ইঙ্গিত করিতেছেন বুঝিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। প্রথম আমার দীক্ষা হইল, পরে মা বটুবাবুকেও ডাকিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহারও দীক্ষা হইল। মার নিকট হইতে আসিয়া বটুবাবু আমাকে বলিলেন, 'কৈ, আমি তো মার কাছে দীক্ষা চাইনি, তবু আমাকে তিনি কৃপা করিলেন!' আমি বলিলাম, 'ইহার নামই, অহৈতুকী করুণা।'"

(—'উদ্বোধন' ৩৯ বর্ষ, সংখ্যা ৮)

প্রসঙ্গোক্ত গিরিজা হচ্ছেন উত্তরকালে স্বামী গিরিজানন্দ—যিনি স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ও স্বামী শান্তানন্দের বাল্য সহচর। স্মরণীয় যে এই তিন সতীর্থকে শ্রীশ্রীমা-ই জয়রামবাটীতে মস্তক মুণ্ডনাদি করিয়ে নিয়ে যথাবিধি গৈরিক বহির্বাস-কৌপীন প্রদান করেছিলেন। ১৯০৭-এর ২৯ জুলাই সেদিন। শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপটের দিকে তাকিয়ে মা এঁদের জন্য করজোড়ে প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন: "ঠাকুর এদের সন্ন্যাস রক্ষা করো। পাহাড়ে, পর্বতে, বনে জঙ্গলে যেখানে থাকুক না কেন, এদের দুটি খেতে দিও।" পরে শ্রীশ্রীমারই নির্দেশে এঁরা কাশীধামে গিয়ে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর কাছ থেকে সন্ন্যাসের নতুন নাম গ্রহণ করেছিলেন।

উপরের প্রসঙ্গ থেকে আরও একবার জানা গেল, প্রার্থী না হয়েও শ্রীশ্রীমার অহৈতুকী চরণাশ্রয় লাভের কথা: গিরিজানন্দের সঙ্গী বটুবাবুর নিজেরই উক্তি—"কৈ আমি তো মার কাছে দীক্ষা চাইনি, তবু আমাকে তিনি কৃপা করলেন।"

দেবী সারদার গুরুমূর্তিতে প্রকাশ বিভিন্ন স্থলে বিচিত্র রূপে দেখেছি। এবারের পটভূমি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তুলনাবিহীন নজিরছাড়া। বলতে গেলে এবার তাঁর অসামান্যা এক পরিচয়—তিনি যেন ঠিক শ্মশানালয়া শ্মশানবিহারিণী একাকিনী মা। মৃত্যুপুরীতে অধিষ্ঠান করছেন, অমৃত বিতরণের জন্য। মরণোর্মিনাশিনী মরণ তরঙ্গের শীর্ষে দণ্ডায়মানা। শোকবিহ্বল উত্তাল মরণমথিত সংসারের কেন্দ্র-ভূমিতে আসীনা থেকে—স্নেহ-কাতর কণ্ঠে নিয়তই তিনি আহ্বান করছেন আমাদের: "এসো এসো, বলে দিচ্ছি"। কিন্তু আমাদের শ্রবণে সে-কণ্ঠস্বর প্রবেশ করে কোথায়? নিত্যশুদ্ধা যিনি,—শুচিতা যাঁর কটাক্ষপাতে, তাঁর চরণ যেথায় স্থাপিত, সেথায় বিরাজ করে পবিত্রতা। তাই তাঁর কাছে আবার

মরণাশৌচ-জাতাশৌচ কিংবা কালাশৌচ কিসের? শৌচ-অশৌচ-অশৌচান্ত সকলই অবান্তর তাঁর পক্ষে, যিনি নিরঞ্জন নিরবদ্য অনাবিল সুবিমল। শিষ্যেরও আর শুভাশুভ কালনির্ণয় করা অনাবশ্যক, যদি দিব্যভাবাপন্ন গুরুমূর্তির ঐরূপ আহ্বান সত্যি সত্যিই কর্ণে আসে। গিরিজানন্দ যেমন সেই দৈবী আহ্বান শ্রবণ-মাত্রেই এক ডুবে স্নান সেরে নিয়ে একেবারেই দীক্ষার আসনে গিয়ে উপবেশন করেছিলেন,—বটুবাবুও যেমনটি এক ডাকেই সাড়া দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মহামন্ত্র গ্রহণ করতে—ক্ষণকালের জন্যও পরিবেশের চিন্তা করেন নি তাঁরা—ঠিক তেমনটিই শাস্ত্রেও সমর্থিত হয়েছে। পুরশ্চরণোল্লাস তন্ত্র বলেন :

"শিষ্যমাহূয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে।
তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিৎ ন বিচার্যং কদাচন ॥"

—অর্থাৎ, মূর্তিমান কি মূর্তিমতী গুরুশক্তি যদি কৃপা করে শিষ্যকে দীক্ষার জন্য আহ্বান করেন, তখন আর কালের বিচার না করেই তা নিয়ে নেবে। পুণ্যাপুণ্য ক্ষন নির্ণয় তখন অনাবশ্যক।

* * *

প্রবল জীবদুঃখাসহিষ্ণুতা! জীবত্রাণের জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা! আবার তাপিত জনের ক্লেশভারকে স্বয়ং স্বীকার করে নিয়ে অসহ্য দৈহিক যাতনা-বরণ! পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমা ভীষণজ্বরে শয্যাগত। পায়ে বাতও দারুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত। সে-মর্মস্পর্শী কাহিনীকে ভাষায় ব্যক্ত করাও কষ্টকর। সন্ধ্যার পরে জ্বর বাড়তে থাকে—বাতের যন্ত্রণাও তখন তুঙ্গে। অমন ব্যথা-জর্জর করুণ অবস্থার মধ্যেও মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তি : "আজ আর কেউ (দীক্ষার্থী) এল না! ঠাকুর বলেছিলেন, কত কাজ করতে হবে—বাকী আছে। একটি দিন বৃথা গেল।" রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমেই। পায়ের শব্দ শোনা গেল বাইরে—কারা যেন এসে মায়ের ঘরের দুয়ারে হাজির। রাত তখন ন'টা। তিন জন ব্যক্তি স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রার্থনা-পত্র সহ শ্রীশ্রীমায়ের কাছে এসেছেন দীক্ষার জন্য। পত্রখানি পড়ে শোনানো হ'ল মাকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কাতরস্বরে মা বলেছিলেন ; "ছেলে বিদেশ থেকে মাকে কত ভাল ভাল জিনিস পাঠায়। রাখাল শেষকালে আমাকে এই পাঠালে!"

এ-বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন স্বামী গৌরীশানন্দ, যিনি তখন উপস্থিত ছিলেন জয়রামবাটীতে মাতৃসকাশে। যা' হোক, অধীরা জননী শান্ত হলেন সেই রাত্রের মতো। তাঁর দয়া ঠিকই বর্ষিত হয়েছিল ঐ দীক্ষার্থীদের উপর,—আধার যেমনই হোক দয়া-দানে কোনও কৃপণতার প্রশ্ন নেই। কৃপাস্মমুখী গুরুশক্তির দয়া দিয়ে আগত সকলেরই জীবনকে ধুয়ে-মুছে নির্মল করেই তো লওয়া হয় সর্বদা—এ-ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিল। তিনি যদি নিজে অমন দয়া দিয়ে না ধুয়ে নিতেন, তা'হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা ঐ চরণ ছুঁতে ক' জনই-বা পারতেন? অতি উচ্চ-কোটির অধিকার সম্পন্ন সাধকও তাই মিনতি করেন চিরদিন ঃ

"দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে ॥"

(—রবীন্দ্রনাথ)

অন্য পরে কা কথা! স্বয়ং স্বামী মাধবানন্দজীকেও বলতে শুনেছিলাম, "অতো বাছ গোছ যদি মা করতেন, তা'হলে কি আর আমরাই স্থান পেতাম তাঁর চরণে?" কথাটা হচ্ছিল নির্বিচারে দীক্ষাদান-প্রসঙ্গে। সারগাছিতে মায়ের দুই বরিষ্ঠ সন্তান মুখোমুখি বসে নিজেদের পুরাতন স্মৃতি-রোমন্থন করে চলেছেন। মাধবানন্দজী তখন সঙ্ঘগুরুর আসনে বৃত। তাই স্বাভাবিক সূত্রেই দীক্ষা-প্রদানের রীতি-নীতির কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছিল। প্রেমেশ মহারাজকে যুক্তকরে মাধবানন্দজী জানিয়েছিলেন: "যারা আসে বাছ গোছ তেমন না করে, আমি সকলকেই মায়ের কাছে সঁপে দেই। মাকে বলি—'মা তুমি আমাকেও যেমন চরণে ঠাঁই দিয়েছ, এদেরও তেমনি আশ্রয় দিও দয়া করে।' আরও ভাবি আমি, সত্যিই অতো বাছ গোছ যদি মা করতেন, ত'হলে কি আমরাই স্থান পেতাম তাঁর চরণে?" লক্ষ করেছিলাম প্রেমেশ মহারাজের মুখখানা আরক্তিম এবং চোখ দু'টি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল যখন মাধনানন্দজীর মুখে এই কথা শুনেছিলেন।

শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত "শ্রীমা সারদা দেবী" নিবন্ধেও স্বামী মাধবানন্দ লিখেছেন:

"শ্রীমার এইরূপ অবারিত দ্বার ছিল বলিয়াই আমাদের মত অনেকে তাঁহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছে। মনে পড়ে, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের একটি দিনের কথা। পূজনীয় শশী মহারাজ—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখন কলিকাতায়, বলরাম বাবুর বাটীতে। আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়করূপে তিনি অল্প দু'চার কথার পরে লেখককে

বলিলেন, 'আর, মার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নাও তা'হলে সব হবে।' প্রকৃতপক্ষে ইঁহারাই শ্রীশ্রীমার মহিমা যথার্থ বুঝিয়াছিলেন…।"

"নরলীলা নরবৎ"। অসীম শক্তিস্বরূপা হয়েও বহুতর জীবজ্বালা ও সংসার-ক্লেশের সংসর্গে নরদেহধারিণী শ্রীশ্রীমাকে ক্বচিৎ কখনও চঞ্চলা হতে দেখা যায় নি,—তা ঠিক নয়। সময়ে সময়ে মূর্তিমতী তিতিক্ষাকেও ধৈর্যহারা হতে লক্ষ করা গেছে। উদ্ধার কর, মুক্তি দাও, স্থান দাও, দীক্ষা দাও, আশ্রয় দাও—শুধুই এই রব অহর্নিশ নীরবে বা সরবে মাকে অস্থির করে তুলত। সহনশীলতার প্রতিমূর্তিকেও অভিমানভরে প্রকাশ করতে শোনা গেছে—"এ শরীর আর বয় না। এক একদিন ঠাকুরকে বলি—'আর কেন?'। ঠিক সেইদিনই একপাল এনে হাজির করেন!" ক্ষোভ-পীড়িতা মাকে একদিন অমন বিচলিতা দেখে, সেবক অরূপানন্দ না-বুঝে বলেই ফেলেছিলেন, "তুমি যে মন্ত্র দাও, সে তো ইচ্ছা করেই দাও।" ব্যথিত অবুঝ সন্তানের এই কথার জবাবে মা বলেছিলেন, "দয়ায় মন্ত্র দিই—ছাড়ে না, কাঁদে। দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কি প্রয়োজন? কাউকে মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবুও এদের হোক।"

অবিরত ধারাবর্ষণের মাঝে মাঝে এক-একটু ছেদ যেমন বর্ষার মাধুর্যকে আরও উপভোগ্য করে,—যেন ঠিক তেমনই করুণাধারা ঢালবার জন্য তীব্র আকুলতা ও অতন্দ্র প্রতীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে এমন অসহিষ্ণু আক্ষেপের অভিব্যক্তিও শ্রীশ্রীমায়ের দয়াঘন রূপের লাবণ্যকে অধিকতর অনুধ্যানীয় করে তোলে। নরলীলার লীলারস তো এখানেই—সুন্দর মসৃণ আননে যেমন একটি কৃষ্ণ তিল, শ্রীকে আরও আকর্ষণীয় করে। অথবা ফুটফুটে একটি শিশুর হাসিমাখা মিষ্টি মুখে যেন একটা মস্ত কাজলের ফোঁটা তার মিষ্টত্বকেই বাড়ায়। "এ শরীর আর বয়না। এক একদিন ঠাকুরকে বলি—'আর কেন?' ঠিক সেই দিনই এক পাল এনে হাজির করেন!"—অমনই এক অনুভাব্য করুণ লীলা-কাব্য। যার মাধুর্যরস মাত্র ভক্তচিত্তেই আস্বাদনীয়।

* * *

'এ শরীরে আর বয় না'।

কিন্তু তবুও কি বিরাম আছে? দেহের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। চিকিৎসকদের নিষেধ, সেবক-সন্তানগণের প্রচণ্ড বাধা, ভক্তগণের সনির্বন্ধ অনুনয়—সব কিছুকে

উপেক্ষা করে, সকলের অজান্তেই কতোজনকে কৃপা বিতরণ করেছেন তার হিসাব এখনও পর্যন্ত কি সব জানা গেছে? উদ্বোধনে শেষ অসুখের সময়ে, প্রহরারত সেবকমণ্ডলীকে ঘুণাক্ষরেও জানতে না দিয়ে, আগত আর্ত ভক্তের মনস্কামনা মা কী-ভাবে পূর্ণ করেছেন, তার অন্ততঃ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে, আমাদের বক্তব্যের মর্মগ্রহণ করতে। শ্রীশ্রীমায়ের বিশিষ্ট সন্তান স্বনামখ্যাত সংবাদ-সাহিত্যিক শ্রীমাখনলাল সেনের লিখিত বিবরণী থেকে আমরা জেনেছি, ঢাকা জিলার সোনারং গ্রামের শ্রীমতী বিনয়বালা সেন কেমন করে লোকচক্ষুর অগোচরে শ্রীশ্রীমাতৃচরণ সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর কৃপা লাভ করেছিলেন।

বিনয়বালা তাঁর পতিগৃহে থাকা কালেই শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মায়ের কথা কিছু কিছু শুনেছিলেন। শ্রীশ্রীমা কলকাতায় বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়িতে রয়েছেন,— এ-কথাও বিনয়বালা জানেন। সহসা প্রাণে খুব ব্যাকুলতা অনুভব করতে থাকেন, কলকাতায় গিয়ে একটিবার মাকে দর্শন করার জন্য। বিনয়বালার পিতা কলকাতায় কালীঘাটে বাসা বাড়িতে থাকতেন। কোনও ভাবে তিনি পিতৃগৃহে চলে আসেন। কিন্তু কোথায় বাগবাজার তা জানেন না। বাগবাজারে উদ্বোধন কোন্ রাস্তায় তা'-ও-বা কে বলবে তাঁকে? অজানা-অচেনা বিনয়বালা একদিন দুপুরে প্রতিবেশী একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন, কাউকে কিছু না বলে-কয়ে। উত্তরদিক-গামী একটি ট্রাম দেখে, তাতেই উঠে বসলেন। ব্যাকুল জিজ্ঞাসা সহযাত্রী অনেককেই—বলতে পারেন উদ্বোধন অফিস্ কোন্ রাস্তায়? সেখানে যেতে গেলে কোথায় নামতে হবে? সন্ধান দিতে পারল না কেউই। কণ্ডাক্টর অগত্যা নামিয়ে দিলেন বিডন বাগানের কাছে। পথিক যাকে পাচ্ছেন তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন। অবশেষে কেউ একজন জানিয়ে দিলেন—ফের ট্রামে চড়ুন। বাগবাজার ট্রাম ডিপোতে গিয়ে নামুন। সেখানে নেমে কাউকে প্রশ্ন করুন—সে ঠিক দেখিয়ে দিতে পারবে—কোন্ দিকে গেলে উদ্বোধন অফিস্ মিলবে। বিনয়বালা তাই-ই করলেন—বাগবাজার ট্রাম ডিপো পর্যন্ত আবার এক ট্রামে চড়ে এলেন। ওখানে নেমে অনায়াসেই হদিস পাওয়া গেল বাঞ্ছিত ধামের।

উদ্বোধন-এর দরজায় এসে পৌছেছেন বিনয়বালা,—তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। তখন শ্রীশ্রীমা ভীষণ অসুস্থ,—তাই কাউকেই বাড়ির দোতলায় উঠতে দেওয়া হয় না, সারাক্ষণ সিঁড়ির মুখে প্রহরার ব্যবস্থা। কিন্তু কী অমোঘ বিধান! ঠিক ঐ ক্ষণেই সিঁড়ি প্রহরাহীন,—বিনয়বালা স্বচ্ছন্দে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে

গেলেন। অতঃপর কোন্ দিকে? কোন্ ঘরে যাবেন তিনি? জনমনুষ্য কেউ কোথাও নেই! অকস্মাৎ বাঁ দিকে চোখ ফেরাতেই,—কী অবিশ্বাস্য দর্শন! স্বপ্নে নয়—সত্যিসত্যি বাস্তবে। স্বয়ং শ্রীশ্রীমা শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছেন—ঘরের দরজা পেরিয়ে বেশ কয়েক পা এগিয়ে এসেছেন একেবারে সিঁড়ির কাছাকাছি! আলুলায়িত বেশা, অবিন্যস্ত বসনা মাতৃমূর্তিকে আচমকা দর্শন করেই বিনয়বালা হতচকিত—কাষ্ঠপুত্তলিকার মতো দাঁড়িয়ে পড়েছেন! কী করতে হবে, তা'ও বিস্মৃত। প্রণাম করাও হয়নি। মা অতি মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলেন: "তুমি মা আমার কাছে মন্ত্র নিতে এসেছ? ঐ কলঘর ওখানে আছে। শীগ্‌গির ওখানে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে এসো—আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।"

বিনয়বালা যেন স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে জবাব দিলেন—"মন্ত্র? আমি তো তেমন কিছু ভাবি নি। কিছুই যে নিয়ে আসিনি আমি।" এক ঝলক বিদ্যুতের মতো মায়ের ক্ষীণ কিন্তু ক্ষিপ্র উত্তর তাঁর কানে প্রবেশ করল: "তোমার ওসব কিছুই লাগবে না। তুমি এক্ষুণি হাত-পা ধুয়ে এসো।"

তারপরের ঘটনা অপ্রকাশ্য। বিনয়বালা মুক্তির আনন্দলোকের দ্বারপ্রান্তে উপনীত,—স্তব্ধ নিঃশব্দ পদক্ষেপে মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলেন—নিচে অপেক্ষমান ছেলেটিকে ইশারায় ডেকে নিয়ে নির্বাক গিয়ে আবার ট্রামে চড়ে বসলেন। প্রহরারত সেবকগণ তখনও অবধি অনুপস্থিত তাঁদের স্ব-স্ব কর্তব্যস্থলে। বোধহয় বিনয়বালার ট্রাম ডিপো ছেড়ে দক্ষিণমুখী যাত্রা করার অপেক্ষাই ছিল কর্তব্যনিষ্ঠ সেবকগণের ঐ অনুপস্থিতির হেতু।

কাণ্ড এখানেই ইতি হয়নি। আর মাত্র কয়েকদিন বাদেই শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া কঠিনতর আকারে প্রকট হয়—বুঝতে বাকী থাকছিল না যে লীলাতনু ত্যাগ করে মা স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। দিবা-নিশি উন্নিদ্র অনলস সেবায় ও প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছেন সেবক-সেবিকাগণ। দর্শনার্থী প্রবীণ ভক্তরাও মাতৃচরণ সকাশে যেতে পারছেন না। কিন্তু বিনয়বালার ক্ষেত্রে পূর্ব-ঘটনারই পুনরাবৃত্তি সকলকেই বিমূঢ় করে দিয়েছিল। বিনয়বালার মন উতলা হয়ে ওঠায়, আবার একদিন দুপুরে অমনি ভাবে মায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। সেদিনও সিঁড়িতে বাধা দেবার জন্য কেউই ছিলেন না,—সটান মায়ের কক্ষে একেবারে চরণপ্রান্তে গিয়ে ভূলুণ্ঠিতা হয়ে পড়েন বিনয়বালা। চরণতলে পতিতা তাঁকে দেখেই শ্রীশ্রীমা সুমিষ্ট স্বরে বলে ওঠেন: "মা এসেছ? বোস মা, বোস। এবার এমন অসুখ হয়েছে যে আর শরীর থাকছে না। তুমি এসেছ,—ভালই করেছ।

ছাখ মা, ছেলেরা কখন এসে পড়বে বলা যায় না। আমার পাটা একটু টিপে দাও তো—কেমন ব্যথা হয়েছে।"

যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-পূজিত পদকমলের দুর্লভ সেবাধিকার প্রদানের জন্যই কি এমন করুণ নাটকের অবতারণা? বিনয়বালার মোক্ষপ্রাপ্তি এই দেহে বিদ্যমান থাকতে থাকতেই—অসামান্য গুরুশক্তির কৃপাতেই সম্ভব হয়েছিল, এ-সত্য দিবালোকের মতোই আরও একবার স্পষ্ট হল। "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে॥"

'অবিচিন্ত্যমহাব্রতা' দেবী সারদা। 'মুক্তিহেতুঃ' গুরুশক্তিপ্রকটা ভগবতী পরমা। 'বিদ্যা' সরস্বতী জ্ঞানদা।

ইন্দ্রাদি দেবতারা এই মুক্তিপ্রদায়িনী দেবী বিদ্যার স্তব করেছিলেন:

"যা মুক্তিহেতুঃ অবিচিন্ত্য-মহাব্রতা চ অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়-তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিঃ অস্ত-সমস্ত-দোষৈঃ বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥"
(—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।৯)

—যাঁরা সংযমী, যাঁরা পরমতত্ত্বকেই জীবনের সার বলে বুঝেছেন, যাঁদের চিত্ত সর্বদোষ-রহিত—এমন সব মোক্ষার্থী মুনিদের মুক্তিদাত্রী অচিন্তনীয়া মহাব্রতস্বরূপা তুমি,—তোমাকেই তাঁরা নিত্য অভ্যাস অর্থাৎ ধ্যান করে থাকেন। হে দেবি! তুমিই সেই ভগবতী জ্ঞানদায়িনী বিদ্যা—অবিচিন্তনীয়া মহাব্রতধারিণী সাধনস্বরূপা মোক্ষদা। আমরাও বলি—মাগো কতদিনে এই অকৃতী সন্তানদের হৃদয়ে তুমি বিদ্যা-রূপে আবির্ভূতা হয়ে অজ্ঞান-অন্ধকারের থেকে মুক্তি দেবে আমাদের? অজ্ঞান-অবিদ্যাচ্ছন্ন আমরা—তাই তো তোমার মহাব্রতস্বরূপা মূর্তির অভ্যাসে বা ধ্যানে রুচি নেই একটুও। আমাদের এ-কাতর কণ্ঠস্বর কি তোমার কানে পৌঁছায় না? বিনয়বালার শুদ্ধ বক্ষ-স্পন্দন—নীরব আর্তি তো তোমাকে শয্যা ছাড়িয়ে ঘরের বাইরে ঠিক এনেছিল। বিনয়বালা নিঃসন্দেহে ছিলেন 'অস্ত-সমস্ত-দোষৈঃ' —কিন্তু আমরা অশেষ দোষে জর্জর। তবুও জানি তুমি অহৈতুকী করুণাময়ী তা'ও ভাল জানি।

মাতৃকৃপা-কৃতার্থা শ্রীমতী বিনয়বালার উত্তরকালীন বিমুক্ত জীবনের বিশদ পরিচয় লোকলোচনের বাইরেই থেকে গেছে। গাছের ফুল গাছেই ফুটল,—বিরাটের পূজায় লেগেছিল, তাঁরই শ্রীপদে অঞ্জলি-স্বরূপ হয়ে থাকল,—পূজাশেষে আবার তাঁরই পায়ে ঝরে পড়েছিল। শ্রীমাখনলাল সেন লিখেছেন;

"শ্রীশ্রীমার অশেষ কৃপা পাইয়া বিনয়বালা অভিভূত হইয়া গিয়াছিল।

বিনয়বালাকে তারপর যখনই দেখিয়াছি, তাহার মুখে কেবলই ঠাকুর ও মার কথা —যেন আনন্দে বিভোর হইয়া আছে। দরিদ্রের সংসার, গৃহে কেহই ঠাকুরের ভক্ত ছিল না, কিন্তু বিনয়বালার আনন্দের সীমা ছিল না। কিছুদিন পরে যক্ষা-রোগে তাহার জীবনান্ত হয়।"

(—অক্ষয়চৈতন্য-কৃত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী', পৃঃ ৩১৪)

"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে"।—দেহে থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন, দেহান্তেও বিমুক্ত হয়ে গেলেন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেবী সারদা দুই দেহে এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্যই মূর্তিধারী —একই সত্তার দুইটি রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূলদেহ অপ্রকট হওয়ার পরে, মা সারদাই রইলেন তাঁর সর্বলোক-ত্রাণকারী গুরুভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশস্বরূপ একটি অনির্বাণ হোমশিখার মতো—যাতে আহুত হতে দিগ্‌দিগন্ত থেকে অগণিত নারী-পুরুষ ছুটে এসেছেন, আগত হয়েছেন 'সুনিয়তেন্দ্রিয়-তত্ত্বসার' সাধুগণ। কোনও সুনির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী শেখাতে নয়, নিয়মবদ্ধ কোন বিশেষ ভাবানুষ্ঠান প্রচার বা প্রতিষ্ঠা করতেও নয়, অধ্যাত্মবিশ্বের সার্বভৌমিক উদার বিস্তৃতির মধ্যে তিনি সনাতন বৈদিক সাধনধারাকে পুনঃপ্রবাহিত করে, সকল মতের ও সকল পথের তৃষিত মানুষকে, জিজ্ঞাসু সাধককে, মোক্ষার্থী আত্মানুসন্ধানীকে আপন স্নেহক্রোড়ে ধারণ করেছেন। বৈষ্ণবের কান্তভাব আর শাক্তের মাতৃভাব—এই দুই প্রবলভাবই দেবী সারদার ভাব-ভাণ্ডারে অনায়াসলভ্য। ভক্তের আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং বেদান্তবাদীর স্থির সিদ্ধান্ত—উভয়েরই ভাস্বর প্রতিমূর্তি শ্রীশ্রীমা। দ্বৈতপথ খুব ভাল; অদ্বৈত আরও ভাল। দ্বৈত পেরিয়েই তো অদ্বৈত—অদ্বৈতে সব আছে, দ্বৈতও আছে। প্রথমে আরম্ভ, পরে শেষ। অতএব অর্থহীন বিরোধ। আশীর্বাদ-অভিসম্পাতের বিধাতা, অনুগ্রহ-নিগ্রহের কর্তা, ব্যক্তি-ভগবানে আস্থাহীন সন্তানও যেমন তাঁর স্নেহের,—ঠিক তেমনই বিশেষ রূপধারী দাতা দয়াল ভগবানেরই কৃপার কাঙাল কোনও ভক্তও মায়ের কাছে সমান আদরের। বলতেন তিনি, সকলের পথ এক নয়। ভক্তিহীনকেও প্রত্যাখ্যান করেন নি। বলেছেন,—ভক্তি নাই বা হ'ল—জ্ঞানও উত্তম পথ। মানুষের মধ্যেই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে চায়

—সে তো চরম অদ্বৈত—সম্পূর্ণই ঠিক পথ সেটি। দেব-দেবীর মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে—জনে জনে ইষ্টের পার্থক্য। এইভাবে প্রত্যেককেই তার স্বভাবধর্মে তিনি দিব্য প্রেরণা দিয়েছেন—নানা মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন—এমনকি মন্ত্র ছাড়াও দীক্ষিত করে নিয়েছেন। আবার নিছক তাঁর ইচ্ছা বা দূর থেকে এক পলকের দৃষ্টিপাতের দ্বারাই কাউকে কাউকে আকৃষ্ট করেছেন,—সমান আশ্রয় দিয়েছেন আর সব দীক্ষিত সন্তানদের মতোই। মায়ের সন্তান সকলেই শ্লাঘনীয়—সকলেই সমান পূজ্য।

মায়ের কাছে দীক্ষালাভে কৃতপুণ্য যাঁরা, তাঁরা অধ্যাত্মরাজ্যে বিলক্ষণ এক বিশেষ থাকের ভক্ত—সাধক বা সাধিকা। দীক্ষা-প্রদানের মধ্যে নিহিত থাকে সাধনোপদেশ,—ইষ্ট-সাক্ষাৎকার কিংবা ভক্তিলাভ কি জ্ঞানলাভের জন্য কিছু করণীয় বা অনুসরণীয় বিধি-বিধান। এ-রাজ্যে প্রবেশের অধিকার অর্জনই তো সর্বপ্রথম সাধন। দীক্ষা শব্দটির মধ্যেই একটা সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা রয়েছে,—কর্মজ মলকে, বাসনাজাত ময়লাকে যেন ক্ষার দিয়ে বিধৌত করতে হবে। গুরুমুখে যতো উপদেশ শিষ্যের প্রতি—সবই উক্ত ক্ষার সহযোগে ধৌত-করণের প্রণালী শিক্ষাদান। ক্ষার হচ্ছে গুরুপোদিষ্ট ভজন-প্রক্রিয়াদি বা সাধন-পদ্ধতির একনিষ্ঠ অনুশীলন। কিন্তু শ্রীশ্রীমার নিজেরই স্বীকারোক্তি থেকে আমরা বহুবার জেনেছি যে, মার আশ্রিত সন্তানদের যা কিছু করার, তা তিনি দীক্ষাদানকালেই করে দিয়েছেন নিজেই। স্বামী মাধবানন্দজীও এই সত্যকে প্রকাশ করে স্পষ্টই লিখেছেন: "...জানিয়া আশ্বস্ত হই যে, তিনি (শ্রীমা) দীক্ষাদান-কালে শিষ্যের যাহা কিছু করণীয় সব করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ গুরু হইতে এইখানেই তাঁহার পার্থক্য।" (—শ্রীশ্রীমা শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যা, 'উদ্বোধন', পৃঃ ৬)

উল্লেখ্য, শ্রীশ্রীমার মন্ত্রপ্রদান পদ্ধতির তারতম্য অধিকারী বিশেষে লক্ষণীয় ছিল। এমন কি, একই ব্যক্তিকে একাধিকবার দীক্ষা মন্ত্র দিয়েছেন—ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র প্রদান করেছেন, এ-রকম দৃষ্টান্তও আমাদের গোচরে আছে। আবার একই আসনে বসে আলাদা দুই মন্ত্রের দুই জপপ্রণালী উপদেশ করেছেন,—এ-রকম নজিরও আছে। সাধারণ গুরু থেকে স্বতন্ত্রতা এখানেও। যার যেমনটি প্রয়োজন,—তার জন্য সেই ব্যবস্থাই মা করতেন। "যার পেটে যা সয়"। কাউকে আদেশ করেছেন—জপাৎ সিদ্ধি। খুব জপ কর। জপেতেই সিদ্ধ হবে—জপেতেই শান্তি পাবে। কোনও সন্তানকে জোর দিয়ে বলেছেন—তুমি আর কি করবে? তোমাদের জন্য আমিই করছি যা' করবার। কেউ-বা নির্দেশ পেয়েছেন—মাত্র একশ' আট বার জপ

করলেই হবে এই বিচিত্রতাও শ্রীশ্রীমার গুরুভাবের অনন্ততা ও অসামান্যতার নিদর্শন।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ঘোষের স্মৃতি থেকে জানা যায় যে, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম জয়রামবাটী গিয়েছিলেন শিলং এর দু'তিনজন ভক্তের সঙ্গে, নিতান্তই কৌতূহলী হয়ে 'শ্রীশ্রীমা কেমন—তা দেখবার জন্য'। তিনি নিজেই বলেছেন—"দীক্ষা লইবার কোন কল্পনা আমার ছিল না।" একদিন সকালে তিনি একাকী জয়রামবাটী গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একজন কে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে খবর দিল—"তুমি এখানে কি করছ? মা ডাকছেন, শীগ্‌গির চলে এসো।"

অমূল্য মার সমীপে গিয়ে দাঁড়াতেই—দীক্ষাদানান্তে আসনে উপবিষ্টা মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বাবা, তুমি মন্ত্র নেবে?" অপ্রত্যাশিত এ-রকম জিজ্ঞাসাতে অমূল্য খুবই উৎফুল্ল হলেও, বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েই থাকলেন;—বুক কাঁপছিল তাঁর—মুখে কোনও রা বেরোচ্ছিল না। কাষ্ঠবৎ অমনি নির্বাক দেখে, মা নিজেই আবার বলেন, "যাও, শীগ্‌গির স্নান করে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।" যন্ত্রচালিত পুতুলের মতো অমূল্য নিকটবর্তী কলুপুকুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা ডুব দিয়ে উঠে—গা মুছে, কাপড় ছেড়েই সোজা আবার মায়ের ঘরে চলে যান।

মা তখনও পূজার আসনে প্রতীক্ষারতা। এবার আমরা অমূল্যবাবুর নিজের কথাই শুনব:

"পাশের একটি আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর আমার জন্য নির্ণীত মন্ত্রটি কয়েকবার উচ্চারণ করিয়া আঙুলে গণনা রাখিবার পদ্ধতিটি দেখাইয়া দিলেন। আমি ঠিকমতো বুঝিয়াছি কিনা—বোধহয় সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমাকে জপ করিতে বলিলেন। আমার মন্ত্রোচ্চারণ ও আঙ্গুলি-গণনা নির্ভুল হইয়াছে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, 'ঠিক হয়েছে। এইটি আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে।'

"কয়েকটি ফল হাতে দিয়া বলিলেন, 'ওগুলি আমার হাতে দাও। দক্ষিণা দিতে হয়।' আদেশ পালন করিলে বলিলেন, 'এখন পা ছুঁয়ে প্রণাম কর।' আবেগে শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই বলিলেন, 'একটু দাঁড়াও।'

"ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে শিকায় ঝুলানো হাঁড়ি হইতে দুইটি মোয়া বাহির করিয়া স্বয়ং দাঁতে কাটিয়া একটু খাইলেন। তাহারপর ঐ মোয়া-দুটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে খেয়ে নাও।'

"এই আমার প্রথমবার দীক্ষা। আমার কিশোর-জীবনের অভাবনীয় ঘটনা। অহেতুকী কৃপার কথা শুনিয়াছি,—ইহা কি তাই? কাঁচ কুড়াইতে গিয়া পরশমণি পাইলাম। কোন অনুরোধ বা প্রার্থনা করিতে হইল না। করুণাময়ী জননী কৃপা করিয়া দীক্ষাদান করিলেন।"

অতঃপরের ঘটনা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরিতে কলকাতায়,—অর্থাৎ পাঁচ বছর বাদে। অমূল্য মায়ের বাড়িতে গিয়েছেন—মাতৃচরণ-বন্দনার উদ্দেশ্যে। স্নানাদি সেরে, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে, কিছু ফুলও সংগ্রহ করে হাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাড়ির দরজাতেই বাধা পেলেন—"দর্শন হবে না আর আজ। মা বড় ক্লান্ত।" দ্বাররক্ষী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা সেদিন অত্যন্ত কঠোর প্রহরায় নিরত। কাকুতি-মিনতিতেও কর্ণপাত করলেন না কেউ। জোর করে প্রবেশের চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল সেদিন। অগত্যা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমূল্যকৃষ্ণ মাতৃপূজার জন্য অঞ্জলি-ভরা ফুল এবং নয়ন-ভরা জল নিয়ে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। অন্যদের চোখে তখন কৌতুক, মুখে পরিহাসের হাসি। কে-একজন সন্ন্যাসী একটু ভৎ'সনাও করেছিলেন—পড়াশোনা না করে এইভাবে হুজুগ করে বেড়াবার জন্য। তিরস্কৃত অসহায় অমূল্যকৃষ্ণ বেচারা তখন কেঁদেই ফেলেছেন। গণ্ডদেশ বেয়ে যখন অশ্রুজল গড়াচ্ছে, ঠিক তক্ষুণি ওপর থেকে সেবকের ডাক এল: "অমূল্য কার নাম? কোথায় ছেলেটি? মা ডাকছেন।" দ্বার ছেড়ে দিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ রক্ষীরা। অমূল্যকৃষ্ণ চোখের জল মুছে উপরে চলে গেলেন মায়ের কক্ষে।

ঘরে ঢুকেই দেখলেন, মা চৌকির উপরে বসে, চরণদ্বয় মেঝেতে নামানো। পায়ের পাতা বেশ শীর্ণ ও ফ্যাকাশে বর্ণ—নীল শিরাগুলিও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। মুখকমলও কেমন শুষ্ক লাগছিল,—যথেষ্ট রোগা দেখাচ্ছিল মাকে। চৌকিতে মায়ের ঠিক পিছনেই রাধু শায়িতা ছিল তখন—সম্ভবতঃ অসুস্থ। অমূল্য মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে দণ্ডবৎ পতিত হলেন। উঠে দাঁড়াতেই মা সস্নেহে কাছে সরে আসতে আজ্ঞা করলেন। "কাছে এসো বাবা। কিছু বলবে?" অমূল্যকৃষ্ণ ভরসা পেয়ে মায়ের চরণপ্রান্তে নতজানু হয়ে বসলেন এবং মনের কথা কিছু একান্তে নিবেদন করলেন। এর পরে যা' ঘটেছিল, তা' পুনরায় অমূল্য-কৃষ্ণের লিপি থেকেই উদ্ধৃত হচ্ছে এখানে:

"...প্রসন্নমুখে মা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। ঘরের মধ্যে যে দু একজন ছিলেন, তাঁহাদিগকে একটু বাইরে যাইতে বলিয়া আমাকে বলিলেন, 'আজ অপর একটি মন্ত্র দিচ্ছি তোমাকে, মন দিয়ে শোন। এই মন্ত্রটি এখন জপ করবে।

আগেরটি দ্বাদশবার জপলেই হবে।' এই বলিয়া মৃদুস্বরে মন্ত্রটি কয়েকবার উচ্চারণ করিলেন।

"এই মহামন্ত্র কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র আমার সারা অন্তর অপূর্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল। মনে হইল—এই মন্ত্রটির জন্য বহু জন্ম ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। যে ফুলগুলি দিয়া শ্রীশ্রীমায়ের চরণপূজা করিয়াছিলাম, সেগুলি কুড়াইয়া লইলাম।"

(—'উদ্বোধন', ৬৫ বর্ষ, ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

অপর আর এক দৃষ্টান্ত—দ্বিবিধ মন্ত্র ও জপ-রীতি একই আসনে বসে মা দিয়েছেন। শুনেছিলাম সে-কাহিনী শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের মুখে। আমরা তরুণ বয়সে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে যেতে পেরেছিলাম বলেই, অনেক একান্ত ঘনিষ্ঠ আত্ম-স্মৃতি তাঁর মুখে শোনার সুযোগ হয়েছিল। পূজ্যপাদ কেদার বাবা (শ্রীশ্রীস্বামিজীর অন্যতম প্রিয় শিষ্য স্বামী অচলানন্দ) ছিলেন অমূল্যবন্ধু বাবুর জীবনের সখা. উপদেষ্টা ও সুহৃদ। কেদারবাবার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আদিষ্ট হয়ে অমূল্যবন্ধুবাবু জয়রামবাটীতে মাতৃসন্দর্শনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সেই প্রথম-বারেই শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষালাভে ধন্য হয়েছিলেন। অমূল্যবন্ধুবাবু নিজমুখে শুনিয়েছেন আমাদের ঃ

"আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন—১৩২৩ সালের ২৯ ফাল্গুন, সংক্রান্তি। বেলা ১১ টার সময় শ্রীশ্রীমায়ের ডাক এলে আমি মায়ের ঘরে প্রবেশ করে, তাঁর পাশেই বসলাম। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার কে আছে ?' আমি উত্তর দিলে, মা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে যান। অথচ মূর্তি খুব করুণামাখানো দেখেছিলাম। আমাকে তিনি গায়ত্রী জপ করতে বলায়, উপনয়নকালে প্রাপ্ত গায়ত্রীমন্ত্র আমি তাঁর সম্মুখে বসে জপ করলাম কিছুক্ষণ। জপ শেষে তিনি জানতে চাইলেন, আমাদের বংশ শাক্ত না বৈষ্ণব। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, যা জানি। আমার উত্তর শুনে মা আমাকে আদেশ করেন :

" 'শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর—ঠাকুর তুমি আমার ইহকালের ও পরকালের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর।' আমি মায়ের আদেশমতো প্রার্থনা করলাম ঠাকুরের কাছে। এবার তিনি আমাকে একটি মন্ত্র ১২ বার জপ করতে বললেন। আমিও তাই-ই করলাম। তারপর শ্রীশ্রীমা আর একটি মহামন্ত্র আমার কানে কানে বললেন—পরে জপপ্রণালীও দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'রোজ সকাল-সন্ধ্যায় ১০৮ বার জপ করবে। স্পষ্ট আরও জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু'।

"এখানে আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে এই যে, আমি যে ব্রাহ্মণের ছেলে, তা' মা জানতেন না,—আমার গলার পৈতাও তো সম্পূর্ণ ঢাকা ছিল—বাইরে দেখা যাচ্ছিল না। অথচ, অবাক ব্যাপার—মা আমাকে গায়ত্রী জপ করতেই আদেশ দিয়েছিলেন। ততোধিক তাজ্জব ঘটনা—আমি শৈশবে স্বপ্নে একটি মন্ত্রলাভ করেছিলাম, কিন্তু সে-কথা কাউকেই আমি জানাইনি কখনও—মাকেও ঘুণাক্ষরে জানতে দেইনি। এতো গোপনীয় যে, আমিই মাত্র জানতাম সে-মন্ত্রটি। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিলাম, আমার স্বপ্নে-পাওয়া সেই মন্ত্র মা কেমন করে জানলেন! আমাকে সেই স্বপ্নের মন্ত্রটিই সর্ব-প্রথমে ১২ বার জপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমার অন্তর্যামিত্ব অনুভব করে আমি রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলাম সেদিন। দীক্ষার পরে মনে আনন্দ আর ধরছিল না। ভাবতে লাগলাম—জন্ম সার্থক।"

অমূল্যবন্ধুবাবু এইভাবে তাঁর দীক্ষার স্মৃতি আমাদের কাছে আবেগোচ্ছল ভাষায় কতোবার ব্যক্ত করেছেন। দীক্ষার পরে মায়ের প্রসাদ ধারণ করে ঐদিনই তিনি কামারপুকুরে গিয়েছিলেন—সেখান থেকে কলকাতায়। সে-মধুর স্মৃতিও এখানে প্রকাশের যোগ্য। অমূল্যবন্ধুবাবুর কথায়:

"বেলা দু'টার সময়ে মায়ের কাছে বিদায় নিতে গেলাম। মনে পড়ে, মা বলেছিলেন—'ওখানে শিবু আছে, রঘুবীরকে কিছু ভোগ দিও, রাত্রিতে গুরুগৃহে বাস করে সকালে উঠে কলকাতায় রওনা হবে। খুব সাবধানে যাবে—তুমি ছেলেমানুষ। মঠে গিয়ে বাবুরামকে আমার স্নেহাশীর্বাদ দেবে।' আমি তাঁর পাদোদক ও মিছরি-প্রসাদ চেয়ে নিয়েছিলাম সঙ্গে রাখব বলে। তাঁর শ্রীচরণে মাথা রেখে মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়াতে যেন মুগ্ধ না হই. আর তোমার পাদপদ্মে যেন ভক্তি থাকে।' মা কিন্তু আমার মনের নীরব প্রার্থনা শুনেছিলেন নিশ্চয়ই,—মুখে যদিও কিছু বলেন নি, কিন্তু আমি লক্ষ করেছিলাম, তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন। পূজনীয় মাষ্টার মশায় পরে শুনে বলেছিলেন, 'সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চায়।' কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন বাদে মঠে গিয়ে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদের কথা নিবেদন করলাম। সে এক দৃশ্য! বাবুরাম মহারাজ শুনেই 'কি আর বলব! কৃপা কৃপা কৃপা !!!'—মুখে উচ্চারণ করতে করতে হাতের করগণনা সহ জপ করতে লাগলেন। পরে মায়ের কথা বলতে তিনি মেতে উঠলেন। আমাকে বলেছিলেন, 'মায়ের কৃপার কথা যেন তোর মনে থাকে। বেইমান হসনি। মা যে কি বস্তু—পরে বুঝবি। এখন আমাদের কারও বুঝবার

শক্তি নেই। তিনিই কালে তোদের কৃপা করে বুঝাবেন। এখন কেবল তাঁর কৃপার কথা স্মরণ করে যা। আহা, লোক-কল্যাণের জন্য তিনি কি না করছেন! দেহের একটু বিশ্রাম পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছেন।' আমার তখন মনে হচ্ছিল, শ্রীশ্রীমাই যেন তাঁর আপন মাহাত্ম্যকে শোনাবার উদ্দেশ্যেই আমাকে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন।…ধন্য মা, ধন্য মা, ধন্য তোমার অহেতুকী কৃপা! কলিকালে তুমিই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সাধে কি পূজনীয় নাগ মশায় বলতেন, 'বাবার চেয়ে মা দয়াল'।"

দয়াস্বরূপা মা। স্বামী অভেদানন্দজী তাই তো মাকে প্রণাম জানাতে শিখিয়েছেন ঃ

তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং,
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥

মানবজীবনের দুর্লভবস্তু—জ্ঞান-ভক্তি-মুক্তি দায়িনী মা সারদা। দয়াল দাতা তিনি,—মানবেতিহাসে তাঁর চেয়েও বড় দয়াল দাতার উদ্ভব কেউ জানে না। মায়ের দানছত্রে আমরা সবাই প্রার্থী—যাচক। বলি,—মা আমাদের যে যেমন অধিকারী, তাকে তুমি তাই-ই দাও। মূলে সকলেরই প্রার্থনা—জ্ঞান-ভক্তি। আখেরে চাই মুক্তি—অজ্ঞানের নিবৃত্তি। মোক্ষদা সারদা, তোমার কৃপা-কটাক্ষে—তোমার চরণের যৎকিঞ্চিৎ স্পর্শলাভে—তোমার ইচ্ছামাত্রেই মোক্ষ করফলায়তে। এখানে একটি উদ্দীপক স্মৃতি কাহিনী মনে আসছে,—শোনা ছিল উদ্বোধনে কার্তিক মহারাজ—স্বামী নির্লেপানন্দের মুখে ঃ

ডাক্তার দুর্গাবাবুর বিবাহিতা কন্যা তার পতিগৃহে যেয়ে মৃত্যুমুখে পতিতা হলে, দুর্গাবাবু শোকে ভয়ানক ভেঙ্গে পড়েছিলেন। বিশেষ এই কারণে যে, মৃত্যুর হেতু সন্দেহজনক ছিল—স্বাভাবিক নয় বলেই ধারণা হচ্ছিল সবার। দুর্গাবাবু প্রতিদিনই উদ্বোধনে পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের কাছে এসে বসতেন এবং প্রয়াতা কন্যার জন্য বিলাপ প্রকাশ করতেন। জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা এ-সব। একদিন দুর্গাবাবু অতি বিষণ্ণ বদনে অশ্রুপাত করছিলেন সারদানন্দজীর সমীপে বসে। দেহত্যাগান্তে কন্যার কী গতি হবে,—এমন অপমৃত্যু কি তার আত্মার শান্তিতে বিঘ্নকর হবে না? এই সব ছিন্ন-ভিন্ন চিন্তাজাল যেন শোকগ্রস্ত পিতার মনকে ভীষণভাবে আকুল করে তুলছিল। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ গম্ভীর হয়ে, শোকাহত পিতার মর্মন্তুদ্ বিলাপবার্তা সব শুনছিলেন,—অবশেষে যেন সহানুভূতিতে ও করুণায় বিগলিত হয়ে কিঞ্চিৎ

চিন্তাবিষ্ট ভাবে দুর্গাবাবুকে প্রশ্ন করলেনঃ "আচ্ছা, ওকে কখনও মার কাছে এনেছিলে ?"

উত্তরঃ "হাঁ মহারাজ। ছেলেবেলায় মা ওকে কোলেও নিয়েছেন—একবার নয়, ক-তো বার! কতো প্রসাদ খাইয়েছেন মা নিজের হাতে। ছেলেবেলায় ও দেখতে ফুটফুটে সুন্দর ছিল।"

সারদানন্দ মহারাজ হাঁফ্ ছেড়ে বলেছিলেনঃ "তবে আর কি ভাক্তার? যে-ভাবেই শরীর যাক্, ও-মেয়ের কখনও অসংগতি হবে না নিশ্চিত জেনো।"

এমন বিশ্বাস-সঞ্চারক ও হৃদয়স্পর্শী আরও একটি ঘটনা পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের স্মৃতিচারণ-প্রসঙ্গে নির্লেপানন্দ স্বামীর মুখে কথিত। তিনি বলেছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত ভক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায় অন্তিম কালে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে শেষ ক্ষণের অপেক্ষায়। শিয়রে উপবিষ্ট তখন শরৎ মহারাজ। ঠিক শেষক্ষণটি সমাগত বুঝতে পেরে তিনি ললিতবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনবার উচ্চারণ করেছিলেনঃ "ললিত, মাকে ভুলো না।"

গুরুর গুরু মহাগুরু শ্রীরামকৃষ্ণাভিন্না দেবী সারদার গুরুভাবের মহিমা সাগরসম দুরবগাহী। সর্বপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনও থৈ পাওয়া যাবে না। মানবিক অহমিকা-প্রসূত কার্য-কারণবাদ বা হেতু-নির্ণয় প্রয়াস ব্যর্থ এখানে। আশ্চর্য গুরুবিগ্রহ দেবী সারদা—আশ্চর্য তাঁর আশ্রয়দান-কুশলতা—আশ্চর্য তাঁর আশ্রিত সন্তানগণ—আশ্চর্য তাঁদের সকলের জীবনবৃত্ত। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথার পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছা হচ্ছে এখানে। তিনি যেন অগণিত মাতৃচরণাশ্রয়ীর অন্তরের নিরুদ্ধ ভাবকে ভাষা দিয়ে গেঁথে আমাদের সকলকেই উপহার দিয়েছেন—মাতৃপদে অঞ্জলি প্রদানের জন্য। সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ

"তাঁর (শ্রীশ্রীমায়ের) অগণিত ভক্তের মধ্যে এমন মানুষও দেখেছি, যাঁরা নাম যশ ঐশ্বর্য কিছুই চান না, এমন কি ব্যক্তিগত দুঃখ অতিক্রম করতে ভক্তি মুক্তি বা অলৌকিক দর্শনেও অভিরুচি নেই। মার কাছে না ছিল তাঁদের কোন প্রার্থনা, না ছিল কোন অভিযোগ। তখন ভাবতাম, এখনও ভাবি, সকলের জন্য সব নয়। যার স্নেহ ক্ষমা আশীর্বাদ বিনা চেষ্টায় অর্জিত সম্পদের মতো পাওয়ার পরে, আর কিছুর জন্য কাঙালপনা কোনদিন করিনি। তাঁর পদপ্রান্তে বসবার সুযোগ পেয়েছিলাম, জীবনের সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের পুণ্যক্ষণগুলি স্মরণ করে আজও চিত্ত-মন-বুদ্ধি ক্ষোভহীন তৃপ্তিতে ভরে আছে।"

(—'উদ্বোধন', শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা)

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাব-মহাচক্র—একটি ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ সুবৃহৎ বনস্পতি যেন। বহুশাখান্বিত বিস্তৃত-বিশাল এই ধর্মতরু, যা আজ বিশ্বের কোটী কোটী নর-নারীর পরমাশ্রয়স্বরূপ, তার মূল শ্রীরামকৃষ্ণ,—এর জীবন-রস, প্রাণ-শক্তি উৎসারিত হচ্ছে সেই গভীর গহন মূল থেকেই। স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ একদা মাদ্রাজে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন ঃ

"...the Ramakrishna Mission...a tree with root at the top and branches at the bottom. These various institutions bearing the name of Sri Ramakrishna, which we see sprouting up-and flourishing around us have their root all above in Him, and so long as they draw sustenance from that source, they are sure to prosper and grow from more to more."[১]

মূলের জ্ঞান না থাকলে বৃক্ষ-চর্চা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সম্পর্কে তাই একটা সুনিশ্চিত প্রত্যয়—যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে সুস্পষ্ট বোধেতে,—সেটি অবশ্যই থাকা দরকার এই বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণের প্রারম্ভ থেকেই। অন্যথায় সমগ্র উদ্দেশ্যটাই বিফল হবার আশঙ্কা। এই প্রত্যয় সঞ্চারণাই গুরুর কাজ। যিনি সামান্য দু'এক কথাতেই বা সরল কোন অভিব্যক্তি কিংবা ইশারাতেই পারেন বহুজনের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দিতে, প্রত্যয়কে অবিচল করতে, তিনি তো গুরুরও গুরু—অখিল গুরুশক্তির প্রতিমা, তাতে আর সংশয়ের কোনও অবকাশই নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবরাজ্যের এক অতি গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ এবং দিঙ্‌নির্ণায়ক অধ্যায়কে স্মরণ করছি এখানে। পর্বটি বহু-কথিত বা বহু-আলোচিত নয়,—যে-হেতু স্বল্প-প্রকাশিত। কিন্তু তা'বলে এর ভাবমূল্য কোনও অংশেই লঘু নয়—পরন্তু বিশেষ প্রতিপত্তিমণ্ডিত এবং গুরুত্ববহ। ইতিহাসের পটভূমিকাটি জানা প্রয়োজন, তাই সর্বাগ্রে সেটির উল্লেখ করছি। বর্তমান লেখক-প্রণীত 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা ১১৭ থেকে কিছু অংশ উৎকলিত হচ্ছে এই উদ্দেশ্যে।

"ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের মৃত্যুর পর স্বামিজী যখন মায়াবতীতে গিয়াছিলেন (জানুআরি, ১৯০১), বিমলানন্দ তাঁহার বহু আকাঙ্ক্ষিত গুরুসেবার সুযোগ পুনরায় কিছুদিনের জন্য পাইয়াছিলেন। যদিও স্বামিজী মাত্র সপ্তাহ দুই

১ তুলনীয় ঃ লেখকের 'স্বামিজীর পদপ্রান্তে'-গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা ৯৭।

মায়াবতীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি বিমলানন্দ মনের সাধ মিটাইয়া হিমালয়ের পুণ্য পরিবেশে আচার্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

"বিমলানন্দের উদ্যোগে বিরজানন্দ-প্রমুখ কয়েকজনের উৎসাহে অদ্বৈত আশ্রমে একটি ছোট ঠাকুর-ঘর ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং নিয়মিত ফুল-ধূপ-দীপ সহকারে অর্চনাদিও সেখানে হইত। স্বামিজীর অভিপ্রায় ছিল, অদ্বৈত আশ্রমে সম্পূর্ণ অদ্বৈতভাবেই শ্রীভগবানের ধ্যান-চিন্তা হইবে—দ্বৈতভাবের উপাসনাদির কোন প্রচলন সেখানে না করা। সুতরাং অদ্বৈত আশ্রমের ঠাকুর-ঘর ইত্যাদি দেখিয়া তিনি আদৌ প্রীত হন নাই। স্বামিজীর অনভিপ্রেত বুঝিয়া, তখন হইতেই অদ্বৈত আশ্রমে দ্বৈতভাবের পূজাদি তথা ঠাকুর-ঘর ইত্যাদি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিমলানন্দই ঠাকুর-ঘরের প্রধান উদ্যোগী থাকায়, এই ব্যাপারে বেশ কিছুদিন মনো-ব্যথা বোধ করিয়াছিলেন এবং সংশয়ান্বিত হইয়া জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। অদ্বৈত ও দ্বৈত এই উভয় দোলায় বিমলানন্দের মন তখন দুলিতেছিল। অবশেষে সন্তানের এই মানসিক দ্বন্দ্ব জননীই দূর করিলেন—পত্রোত্তরে বিমলানন্দকে মা লিখিলেন:

'আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুরই শিষ্য তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।'

"১৫ই ভাদ্র ১৩০৯, অর্থাৎ ৩১শে আগস্ট, ১৯০২, তারিখে জয়রামবাটী হইতে লিখিত মাতাঠাকুরানীর এই পত্র মায়াবতীতে বিমলানন্দের হাতে পৌঁছিয়াছিল ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২। জগজ্জননীর এই আশ্বাসে বিমলানন্দ ও তাঁহার গুরুভ্রাতারা সকলেই চিরতরে নির্দ্বন্দ্ব হইলেন—তাঁহাদের বেদান্তবিদ্ আচার্যের মনোগত ভাবটিও এইবার ঠিক ঠিক ধরিতে পারিলেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হইলেও ভাবের দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।..."

উল্লিখিত উৎকলনের মাঝে উদ্ধৃত শ্রীশ্রীমায়ের পত্রাংশটি একটি মহামূল্য সিদ্ধান্ত-সূত্র,—অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের সাধক-সাধিকাদের জন্য একটি মহাবাক্য। ভক্তির দ্বৈতচেতনা থেকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি হওয়া বা সিদ্ধান্তের চরমকে অপরোক্ষের উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হওয়া,—অতি কঠিন একটি সাধন-স্তর। বিবেকানন্দ-পরিকর বিমলানন্দ তথা অন্যান্য সুউন্নত বিবেকানন্দ-সঙ্গী সকলেই সে-স্তরকে অত্যন্ত সহজে ও স্বচ্ছন্দে উত্তরণে সক্ষম হয়েছিলেন সেদিন শ্রীশ্রীমায়েরই উক্ত সহজ কয়েক ছত্র বাক্যে! জ্ঞান-ভক্তির পরম উৎকর্ষ মায়ের ভাষায় যেমন সহজতা ও মর্মস্পর্শিতা প্রাপ্ত হয়েছে,

তা বিশ্বের অধ্যাত্ম-শাস্ত্রে একক উদাহরণ,—সরল বাক্-ছন্দে পরম সত্যের এমন প্রকাশ একমাত্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম-সাহিত্যে বিরল—সুদুর্লভ। কেবলমাত্র বিমলানন্দ-প্রমুখ জনকয়েক জিজ্ঞাসুর জন্য নয়,—আগত-অনাগত সকল কালের একটি অনুদাত্ত অথচ সার্বজনিক অনুসন্ধিৎসার সুমধুর প্রবোধক মীমাংসা শ্রীবিদ্যারূপিণী সারদা রেখে গেছেন রামকৃষ্ণ-অন্বেষী সবারই জন্য। এখানে স্মরণীয় যে, স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণই সারদা দেহধারিণী শ্রীবিদ্যা দেবী সরস্বতীকে আনুষ্ঠানিক ভাবেই গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিতা করে গেছেন সর্বমানবের হিতার্থে। এ-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডে।

প্রশ্ন চিরন্তন,—উত্তরও শাশ্বত স্বতঃপ্রমাণ,—অবিসংবাদী অবিতথ। অদ্বৈতই সাধনপথের শেষ কথা কিনা। বিশিষ্টাদ্বৈতই অবলম্বনীয় পন্থা অথবা দ্বৈতই অনায়াস-অনুসরণীয়? বহু-জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আমরা নতুন কোনও প্রসঙ্গের অবতারণায় যাবনা এখানে। কেননা এগুলির উত্তরও শত-সহস্রবার প্রদত্ত হয়েছে গীতা-উপনিষদাদি শাস্ত্রে এবং ঋষিমুনি মহাজনদের উপদেশে। সাম্প্রতিক যুগে শ্রীচৈতন্য-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রমুখ অবতার-আচার্যগণও উক্ত জিজ্ঞাসানিচয়ের সজীব উত্তরস্বরূপ হয়ে আমাদের সম্মুখেই প্রকট। আমরা মাত্র সংক্ষেপে এই কথাই পুনঃ স্মরণ করতে ইচ্ছা করি যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত কোন পৃথক স্বতন্ত্র ভিন্ন পথ নয়,—এগুলি হচ্ছে অবস্থার নাম। সাধকের জীবনে তার সাধনার গভীরতার তারতম্য অনুসারে এক এক অবস্থা ক্রমে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে। এরা পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়,—অত্যন্ত স্বাভাবিক পরস্পর-পরিপূর্ণতা-সাধক। উপনিষদ-গীতা প্রমুখ শাস্ত্রে এই তিন অবস্থার কথাই বিশদভাবে বা সুত্রাকারে উক্ত হয়েছে—প্রত্যেক অবস্থারই মহিমোজ্জ্বল বর্ণনা রয়েছে। শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা তাঁর নিজের সাধনাবস্থায় অবস্থান করেই, তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন—এবং তাঁর কথার প্রমাণও সংগ্রহ করেছেন শাস্ত্র থেকেই। ফলে বিভিন্ন ব্যাখ্যাতার বক্তব্যের মধ্যে নানা বিষয়ে আপাতঃ-বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে—তাঁদের অনুগামীদের মধ্যেও কলহের ও বিতর্কের বেড়াজাল গড়ে উঠেছে। এবারে অবতীর্ণ ভগবান ঐ তিনটি অবস্থার মধ্যে স্বয়ং স্বেচ্ছায় গতায়াত করেছেন—যেন বাইচ খেলেছেন, প্রত্যেক অবস্থার পরাকাষ্ঠা উপলব্ধিসমূহ অপরোক্ষ করেছেন এবং এক অত্যাশ্চর্য ধারাবাহিকতা অনুভব করে সকল সাধন-অবস্থার মধ্যে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য বা সমন্বয়সূত্র আবিষ্কার করেছেন,—সেই আনন্দ-বার্তাকে সোচ্চারে জগৎকে জানিয়েও দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁরই সুনির্বাচিত বার্তাবহ—

শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা আচার্য। লীলাভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ তাই স্পষ্টই লিখেছেন :

"দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ।...বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।... যুগাবতার ঠাকুরের সেই জন্য ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল।"

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২।২১)

সংক্ষেপে সত্য হচ্ছে এই যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত মত মানুষকে সাধনার অবস্থাভেদে গ্রহণ করতে হবে—এটা অবধারিত। এখানে কোনও রকম অবান্তর ভেদ চিন্তা করা নিতান্তই প্রবল ভাবপ্রবণতা বা মানসিক ঝোঁকের পরিচায়ক। তিনটি মত এবং তাদের যথাযোগ্য অবলম্বনাধিকার সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে নিম্নোদ্ধৃত তাঁর উক্তিগুলির মধ্যে :

"অদ্বৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।"

"মন বুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম।"

"বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সঙ্কীর্তনাদি প্রশস্ত।"

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯)

এ-ছাড়াও অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের জন্য তিনি সহজতম পথ যা উপদেশ করেছেন, তারও উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে, আলোচনাকে সুগম করার জন্য। সংসারের জটিল আবর্তে দিবানিশি যাপন করে কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অতীব দুঃসাধ্য। তাদেরও জন্য ঈশ্বর-চিন্তার কিংবা ভগবানের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার উপায় তিনি বাতলিয়েছেন :

"সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়—চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম করিতে পারে না, অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না।......অন্য সকল

মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে যত কিছু কার্য বড়লোকের বাটীর দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ, ও ধ্যান করা এবং পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করা—ইহাই পথ।" (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয়, পৃঃ ৩৭৯-৩৮০)

তা'হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবের অনুসারীর পক্ষে তাঁর অধ্যাত্ম-প্রগতির পথ অত্যন্ত অনাবৃত উন্মুক্ত এবং ক্রমপ্রকাশমান। প্রথমে কর্মযোগ—অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম-জপ-ধ্যানাদির সঙ্গে সঙ্গে. বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে যেতে হবে—উচ্চতর জীবন-চর্যার যোগ্য হয়ে ওঠার জন্য। তারপর দ্বৈতভাব আশ্রয় করে পূজা-পাঠ নাম-সঙ্কীর্তনাদিমূলক আরাধনায় রত হতে হবে। এইরূপ আরাধনাময় জীবন ক্রমেই বিশিষ্টাদ্বৈতভাবের দিকে অনুপ্রেরিত হতে থাকবে—বোধ আসবে যে, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও পূর্ণ, জীব-জগৎ তাঁরই ছোট-বড় বিচিত্র অংশ যেমন সমুদ্রের নানা ঢেউ। তাঁরই চৈতন্যে, জীব-জগৎ সবই চিন্ময়। বোধ হবে, 'আমিও তাঁরই অংশ'। ঈশ্বরের কোনও প্রিয় নাম বা নয়নানন্দী রূপ—অর্থাৎ তাঁর সাকার সগুণ ভাবই তখনও পর্যন্ত 'ইষ্ট'।

অতঃপর বিশিষ্টাদ্বৈত অবস্থার চরমতম পরিণতিতে—অদ্বৈত উপলব্ধির আনন্দ-রাজ্যের কপাট উদ্ঘাটিত হবে। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—ব্রহ্মময় সব। আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল। 'নাহং ন ত্বং'—আমি নেই, তুমি নেই,—কোনও ভেদ কুত্রাপি নেই। আছেন শুধু সর্ববিকল্পবর্জিত এক অদ্বিতীয় তিনি। এই নির্বিকল্প অবস্থা হ'ল শেষ কথা। নাম-রূপ-গুণ সবই তখন কোথায় বিলীন—এক একাকার। দুই নেই—একও নেই অবশেষে। যা আছে তাঁকে 'বুঝে প্রাণ বুঝে যার'—'অবাঙ্-মনসোগোচরম্'। যা আছে তা আছে। মুখে বলা যায় না—মনেতে ছবি লওয়া চলে না। বুদ্ধিতে ধরা যায় না।

মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে দ্বৈতাদ্বৈত বৃত্তান্ত। খুব স্বাভাবিক কারণেই এটা এখন পরিষ্কার বুঝা গেল যে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির রাজ্যে সর্বশেষ অবস্থাই হচ্ছে অদ্বৈত। এই অবস্থাতেই নির্বিকল্পস্তরে—সর্বোচ্চ শীর্ষে উন্নীত হন অধ্যাত্ম-পথিক। সব অবস্থা অতিক্রম করে, সকল স্তর ভেঙ্গে ভেঙ্গে—এই অদ্বৈতে উপনীত হওয়া—সর্বোন্নত স্তরে আরূঢ় হওয়াই মানবজীবনের আধ্যাত্মিকতার পরম উৎকর্ষ। এখন আর কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, শ্রীচৈতন্য-রামকৃষ্ণাদি পুরুষ অদ্বৈতভাবেই অধিষ্ঠিত ছিলেন—নির্বিকল্প-সবিকল্পের মাঝে তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বাধীনসঙ্কল্পে ওঠা-নামা করেছেন—আনন্দে বাইচ খেলেছেন যেন। আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-

প্রসঙ্গ চতুর্থখণ্ডের 'গুরুভাব সম্বন্ধে শেষ কথা' অধ্যায়ে স্বামী সারদানন্দজীর মন্তব্য থেকেও জেনেছি :

"ঠাকুরের মনের স্বভাব আলোচনা করিতে যাইয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিয়া অদ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপলব্ধিই মানব-জীবনের চরমে আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার ঐ ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন—'সব শেয়ালের এক রা' ; অর্থাৎ, সকল শিয়ালই যেমন এক ভাবে শব্দ করে, তেমনি নির্বিকল্পভূমিতে যাঁহারাই উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ ভূমি হইতে দর্শন করিয়া জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও ঠাকুর বলিতেন, 'হাতীর বাইরের দাঁত যেমন শত্রুকে মারবার জন্য, সেই রকম মহাপ্রভুর দ্বৈতভাব বাহিরে ও অদ্বৈতভাব ভিতরের জিনিস ছিল।' অতএব সর্বদা একরূপ অদ্বৈতভাবই যে ঠাকুরের সকল বিষয়ের পরিমাপকস্বরূপ ছিল, একথা আর বলিতে হইবে না ; ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমষ্টি সমাজকে যে ভাব ও অনুষ্ঠান ঐ ভূমির দিকে যত অগ্রসর করাইয়া দিত, ততই ঠাকুব ঐ ভাব ও অনুষ্ঠানকে অপর অপর সকল ভাব ও অনুষ্ঠান হইতে উচ্চ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-লীলায় নিত্য অনুরণিত থাকত একটিই অনাহত ধ্বনি—অদ্বৈত। কিন্তু 'কোনও ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমষ্টি সমাজকে যে ভাব ও অনুষ্ঠান ঐ (অদ্বৈত) ভূমির দিকে যত অগ্রসর করাইয়া দিত, ততই ঠাকুর ঐ ভাব ও অনুষ্ঠানকে অপর সকল ভাব ও অনুষ্ঠান হইতে উচ্চ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন,'—শুধু উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে, অদ্বৈতমুখী প্রেরণা সঞ্চারের জন্য—সাধনার সিদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে দিতে। এমনকি নিজেও তদনুযায়ী সকল ভাবের সাধনা করেছেন,—যখন যে-ভাবে মত্ত হয়েছেন, তখন সেই সেই ভাবকে কী গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন, যেন তাঁর স্বকীয় সেই ভাবকেই অবলম্বন করে সাধনায় ব্রতী তিনি। যিনি মা মা করে কেঁদেছেন, মা না হলে চলে না যাঁর,—সেই তিনিই প্রয়োজনে মায়ের রূপকে খণ্ড খণ্ড করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন,—সেই মায়েরই নিরাকার ভাবে ডুবে যাবেন বলে! এই কারণেই তো তাঁর ভাবের ইতি করা চলে না। তাঁর কোনও বিশেষ ভাবের অবস্থা দেখে, বা সেই কালের উপদেশকেই মাত্র স্বীকার করে নিলে—তাঁর সমগ্র রূপকে জানা হবে না। আমরা এইরূপ প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের সমকালেই। বিশ্রুত দার্শনিক অধ্যাপক[১] গ্রন্থ লিখলেন

১ ড. অমর চন্দ্র দাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ; প্রমাণ ; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। উত্তর-গ্রন্থ রচিত হল উক্ত অধ্যাপকেরও অধ্যাপক, লব্ধকীর্তি দর্শনবিদ্‌—শ্রীশ্রীমায়েরই কৃপাধন্য এক পণ্ডিতপ্রবরের[১] দ্বারা। তিনি তাঁর ছাত্রের মতকে খণ্ডন করলেন,—রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌ষ্টিট্যুট অব্‌ কালচার-এ ধারাবাহিক ভাষণে তিনি বিদ্বজ্জন সমক্ষে সোচ্চারে জানালেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পূর্ণ অদ্বৈত। তাঁর সিদ্ধান্তকেও তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রধানতঃ সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রমাণ-গ্রন্থ সহায়েই। শুধু তাই নয়, তিনি প্রাঞ্জল জ্ঞানগর্ভ ভাষায় সপ্রমাণ সিদ্ধান্ত স্থাপনা করেছিলেন যে, ভারতীয় দর্শন-সমুচ্চয়ের সমন্বয়-মূর্তি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'Classical Indian Philosophies : Their synthesis in the Philosophy of Sri Ramakrishna'—দ্রষ্টব্য। বলা বাহুল্য, সর্বাঙ্গ-সার্থক সমন্বয় অদ্বৈতদৃষ্টিতেই সম্ভব,—সর্বাত্মকতা বোধ জাগে অদ্বৈতভূমিতে আরূঢ় হলেই।

কেবলমাত্র উল্লিখিত দুই জন বিদগ্ধ দার্শনিকেরই নয়, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে অসংখ্য জিজ্ঞাসু মনেই এমন বোধ-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়ে আসছে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে। *"চিদাকাশে যার যা ভাসে!"* নিজ নিজ ভাব-দৃষ্টি দিয়েই তো লোকে সব কিছুকে দেখে থাকে,—শাস্ত্রের অর্থ করে থাকে, ভগবানকেও স্ব-স্ব ভাবের আলোকে সকলে দর্শন করে। এটাই স্বাভাবিক।

দু'টি জিজ্ঞাসা এখানে পাঠক-পাঠিকার চিত্তে ফুট কাটতে পারে। এক,—ঠাকুরের এই অদ্বৈত ভাবকে স্বামিজী কেবলমাত্র অদ্বৈত আশ্রমের ক্ষেত্রেই সাধনীয় করলেন—অন্যত্র সকল আশ্রমে বা মঠে-মন্দিরে তো শ্রীরামকৃষ্ণের আনুষ্ঠানিক পূজা-অর্চনাদি প্রবর্তনা তিনি স্বয়ংই করেছেন। অন্ততঃ ধ্যানঘরে ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে ফুল-ধূপ-দীপ প্রদানের প্রথা তো বিনিবেশিত তাঁরই দ্বারা। শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক-ভজন তাঁরই রচিত, তাঁর দ্বারাই সমারব্ধ। তিনি নিজে পূজাদি সহকারে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিকে সংস্থাপনাও করেছেন—সে-ইতিহাসও সুবিদিত। শুধু তাই নয়, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা প্রচারেও প্ররোচনা ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীকে এক পত্রে স্বামিজী লিখেছিলেন যাতে শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' মহাকাব্য-গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার কথা খুব উৎসাহ দিয়ে লেখেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা থেকে স্বামিজী লিখেছিলেন শশী মহারাজকে :

"এই ভাবগুলো তার ভাষায় বিস্তার করে লিখতে হবে। যে তাঁর

---

১ ড. সতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(শ্রীরামকৃষ্ণের) পূজা করবে, সে অতি নীচ হলেও মুহূর্তমধ্যে অতি মহান হবে—মেয়ে বা পুরুষ।...আর শাঁকচুন্নীও[১] ঘরে ঘরে তাঁর পূজা করাক। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পূজোয় সকলের অধিকার। যে ঘটস্থাপনা বা প্রতিমা করে তাঁর পূজা করবে,—মন্ত্র হোক বা না হোক—যেমন করে যে ভাষায় যার হাত দিয়ে হোক—খালি ভক্তি করে যে পূজা করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এই ঢোলে লিখতে বলো। কুছ পরোয়া নাই, প্রভু তাঁর সহায় হবেন।"

স্বামিজীর এই দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে সঙ্গতি কোথায়?—প্রথম জিজ্ঞাসা এটাই।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা মনের কোণে উঁকি দেয়—স্বামী বিমলানন্দ শ্রীশ্রীস্বামিজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম হয়েও নিজের গুরুর কথায় কি সাময়িক সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন? শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করাতে কি আপন গুরুর প্রতি সংশয় সূচিত হয়নি? যদিও খুবই অল্পকালস্থায়ী ছিল,—তথাপি বিমলানন্দ-হেন বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-পার্ষদের পক্ষে ক্ষণকালের সংশয়লেশও যেন কেমন অবিশ্বাস্য ছন্দপতন বলে মনে হয় না কি? সত্যিই কি তাই? অথবা অন্য গূঢ় মর্ম আছে, এই ঘটনার অন্তরালে?

প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাদের চিন্তাধারা হচ্ছে এই যে, স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার প্রবর্তক ও অনুপ্রেরক,—বিরোধী ছিলেন না কোনও কালেই। কিন্তু স্বামিজীর শ্রীরামকৃষ্ণ তো শুধুমাত্র সাকার ভগবানই নন, তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম, নররূপধারী পরমাত্মা (Sum total of individual souls)। 'নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়' হচ্ছেন তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ। সুতরাং মূর্তির মধ্যেও যেমন তাঁর পূজার কথা সহস্রবার বলেছেন—ঠিক তেমনই অযুত সহস্রবার স্বামিজী স্মরণ করিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের 'বাক্যমনাতীত' 'চিদ্ঘনকায়'-কে। তাঁর প্রকৃষ্ট রূপ বর্ণনা স্বামিজীর ধ্যানে ভাস্বর হয়েছে: "অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃত-বৃত্তং।" সুতরাং প্রতিকৃতি স্থাপনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজা যেমন না করে পারা যাবে না,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অদ্বয় অনন্ত স্বরূপের ভাবে সমাহিত হবার অন্তপ্রেরণাকেও জাগ্রত রাখতে প্রয়াসী না হয়ে থাকা চলে না। একজন শ্রীরামকৃষ্ণ-তত্ত্ব-তৃষিতের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক সাধন। সার্বজনিক প্রয়োজন বুঝে স্বামিজী ঠাকুরের পূজায় উৎসাহ দিয়েছেন—আশ্রমাদিতে তাই পূজা আরাত্রিকাদির প্রচলন হয়েছে। কিন্তু যুগপৎ ঠাকুরের অদ্বৈতভাব-দ্যোতক উচ্চতর ধ্যান-ধারণা ও স্বাধ্যায়-

১ পত্রাধিকার শ্রীঅক্ষয় কুমার সেনকে স্বামিজীর আদরের ডাক।

মননাদিও অব্যাহত ধারায় চলবে এবং তার জন্য হিমালয়ের অন্ততঃ একটি আশ্রমে উপযুক্ত অধিকারী সন্ন্যাসিগণের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরীও রাখতে হবে।

এখানে স্মরণীয় যে, স্বামিজী মায়াবতী থেকে নেমে এসে বেলুড় মঠে একদিন অদ্বৈত আশ্রমে ঠাকুর-ঘর স্থাপনার উদ্যোগকে স্মরণ করে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তাঁর খেদোক্তি ছিল এই: "আমি ভেবেছিলুম অন্ততঃ একটি কেন্দ্রেও তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণের) বাহ্যপূজাদি বন্ধ থাকবে! কিন্তু হায়, হায়, গিয়ে দেখি বুড়ো সেখানেও জেঁকে বসে আছেন।"

(—'যুগনায়ক বিবেকানন্দ', তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৭)

মঠের নিয়মাবলীতে 'ঠাকুরঘর' পরিচ্ছেদে এতদ্ সম্পর্কে স্বামিজীর অভিপ্রায় ও নির্দেশ সুস্পষ্টই লিপিবদ্ধ রয়েছে—যেখানে আর কোনপ্রকার সংশয়েরই অবকাশ নেই। আমরা যথাযথ উদ্ধৃত করছি স্বামিজীর অনুশাসন:

"মূর্তিপূজাদি অন্যান্য ভাবও যথাস্থানে পরিরক্ষিত হইবে। কিন্তু প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালীই সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবে ও সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রভুত্বের অধিকারী হইবে।

"অর্থাৎ প্রত্যেকেই এইটি বিশেষ মনে রাখিবেন যে, যিনি ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রণালী ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মূর্তিপূজা, ভোগরাগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত আছেন, তিনি প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালীকে অবজ্ঞা করিতেছেন। ধ্যান, ভজন ইত্যাদি প্রধান কর্তব্যের সঙ্গে মূর্তিপূজা প্রভৃতি আর সমস্ত থাকুক, হানি নাই।"

দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত,—কিংবা সাকার-পূজাদি এবং নিরাকার-ধ্যান-ভজনাদির মধ্যে সরল সমীকরণ স্বামিজীর ভাবের মধ্যে সর্বদাই সমান ভাস্বর—সরল স্পষ্টীকৃত। সুতরাং সঙ্গতি সদাই বিদ্যমান।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বিমলানন্দকে ঘিরে। বিমলানন্দ প্রকৃত তাৎপর্যার্থেই স্বামিজীর যোগ্য শিষ্য—তাঁর অন্তরঙ্গ পরিকর। স্বামিজীর কাছ থেকেই সন্ন্যাসলাভ করেছিলেন। সন্ন্যাসীর বেদান্ত-দৃপ্ত সাধন-পথ অদ্বৈতমুখীই হয়ে থাকে,—সে-পথের পথিক বিমলানন্দ অবশ্যই অদ্বৈতপন্থী,—যাঁর পথ-নির্দেশক দিশারী স্বয়ং বেদান্তমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামিজীর ঠাকুর-ঘর নিয়ে কটাক্ষ বা ইঙ্গিত বিমলানন্দের 'মনোব্যথা'র কারণ হয়েছিল ঠিকই—'সংশয়াম্বিত' হয়ে তিনি স্বীয় মন্ত্রগুরু শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখেছিলেন, তাও সুবিদিত সত্য। শ্রীশ্রীমা বিমলানন্দের কাছে কেবলমাত্র জগন্মাতা জ্ঞানদায়িনী অখিল-গুরুই নন,—তাঁর একান্তই আপনজন মন্ত্র-

দাত্রী ইষ্টরূপিণীও বটে। তাই তাঁর মানসিক যে-কোনও অবস্থাই মাকে নিবেদন করা অত্যন্ত স্বাভাবিক কর্তব্য কর্ম—বরং না জানানোটাই হ'ত খুবই অস্বাভাবিক।

মনে পড়ে, জনবিরল প্রান্তে একান্তে রামনাম-জপরত মহাবীরকে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র যখন প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন দূত গরুড় মারফৎ যে, তাঁর স্বরূপে তাঁকে দর্শন করার জন্য,—গরুড় মহাবীরকে বুঝিয়েছিলেন যে, রামচন্দ্র একজন মনুষ্যদেহধারী হলেও তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, নররূপী রামের চিন্তা ও নাম-জপ ছেড়ে এখন তাঁর আত্ম-স্বরূপেই তাঁকে দর্শন করে জন্ম সার্থক করার সুযোগ আগত। মহাবীর তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট গরুড় পুনঃ পুনঃ অনুনয় জানানোতেও মহাবীর জপের আসন ছেড়ে উঠে আসেননি—বলেছিলেন, সবই জানি, সব সত্য —জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীপতি নারায়ণ অভেদ পরমাত্মা,—তবুও আমার জীবনসর্বস্ব কমললোচন শ্রীরামই।

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥"

এখানে মহাবীরের যে মনোব্যথা—সেটিকে অনুভবের চেষ্টা থাকলে, বিমলানন্দের মনোব্যথার কারণটিও অনায়াসে অনুধাবন করা যাবে। এ-'মনোব্যথা' নিষ্ঠা থেকে, —অহং বা অজ্ঞান থেকে নয়। এমন 'মনোব্যথা' গোস্বামী তুলসীদাসেরও হয়েছিল,—তাই তো বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীরঘুনাথজীর মন্দির না দেখে, তথা রঘুনাথের কণামাত্র প্রসাদও না পেয়ে তিনি জলগ্রহণও ত্যাগ করেছিলেন। বিমলানন্দের মনের খেদ সহজেই উপলব্ধব্য এখন।

শ্রীরামচন্দ্র মহাবীরকে কিছুই বলেননি তাঁর প্রেরিত প্রস্তাব উপেক্ষিত হলেও। স্বামিজীও প্রত্যক্ষতঃ বিমলানন্দকে বা তাঁর সহযোগীদের কাউকেই শাসনমূলক কিছু বলেননি,—ঠাকুর-ঘর তুলে দেবার আদেশও তক্ষুণি দেননি। দরদী সহমর্মী গুরু স্ব-শিষ্যের মনে কোনও রকম আঘাত লাগে, এমন কিছু উক্তি করেননি! এটাও বেশ লক্ষণীয়।

শ্রীশ্রীমাকে বিমলানন্দ পত্র দিয়েছিলেন, স্বামিজীর নির্দেশের প্রতি কোনও-রূপ সংশয় দ্বারা প্রেরিত হয়ে যে আদৌ নয়,—এই সরল সত্যটিকে বুঝতে এখনও কোনও অসুবিধা থাকা উচিত নয়। বরং তাঁর মনে যে সংশয়টুকু উঠেছিল, তা' হচ্ছে তাঁর আচার্যের প্রতি ঐকান্তিকী বিশ্বাস ভক্তি থেকেই—গুরুবাক্যে অমড় নিষ্ঠার হেতুতে। সাময়িক তাঁর মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল, তিনি হয়তো অদ্বৈত আশ্রমের কর্মী হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন,—কেননা তাঁর ঝোঁক বা

প্রবণতা অদ্বৈত অপেক্ষা দ্বৈতের দিকেই অধিক। বুঝি-বা তিনি অদ্বৈতবাদী হবার অনুপযুক্ত। আমরা যদিও কেউই জানি না,—আমাদের পূর্বগামীরা কেউ দেখেছেন বা জানেন বলেও শুনিনি, বিমলানন্দ শ্রীশ্রীমাকে সঠিক কী সংশয় নিবেদন করেছিলেন—কী লিখেছিলেন। কবে কোন্ তারিখে সেই পত্র লেখা হয়েছিল, তা'ও অজ্ঞাত। শ্রীশ্রীমায়ের উত্তরবাহী পত্র থেকে এটা এখন সুনিশ্চিত যে, বিমলানন্দ স্বয়ং প্রকৃত অর্থে অদ্বৈতবাদী কিনা, কিংবা শ্রীরামকৃষ্ণপদানুবর্তী অন্যান্যরাও অদ্বৈতবাদী কিনা সঠিকভাবে, এটাই ছিল মাকে লিখিত পত্রের মূল জিজ্ঞাস্য। শ্রীশ্রীমা-ও খুবই নিপুণ ও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যাটির অত্যাশ্চর্য প্রাঞ্জল মীমাংসা ধরিয়ে দিয়েছেন চোখের সম্মুখে,—যে মীমাংসা-সূত্রটি কেবলমাত্র বিমলানন্দের জন্য নয়, ভাবীকালের সকল জিজ্ঞাসুর জন্যই অনির্বাণ আলোকবর্তিকা স্বরূপ হয়ে থাকবে। শ্রীরামকৃষ্ণচৈতন্যদায়িনী সাক্ষাৎ সরস্বতী বা শ্রীদেবীর এক অনন্য ক্রিয়াশক্তি বা বিভূতি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটিতে প্রকট হয়েছে! দেবী সারদার গুরুভাব শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই জাগ্রতা নয়,—সমষ্টি বা মানবগোষ্ঠীরও জ্ঞানদাত্রী গুরুরূপে তিনি চিরবন্দিতা। সেই 'ষোড়শীপূজা'র মর্মকথা এখন কিছুটা ভাল উপলব্ধি করা যাচ্ছে।

বিমলানন্দ-প্রসঙ্গে আরও দু'একটি কথা উল্লেখ বাহুল্য হবে না আশা করি। বিমলানন্দ এই ধরনের সমস্যা নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দরবারে হাজির হয়েছিলেন, যেমন তাঁর জীবনসর্বস্ব গুরু-ইষ্ট ইহকাল-পরকাল-নিয়ন্ত্রীকে ব্যক্তিগত যাবতীয় অসম্পূর্ণতা, দৈন্য, সংশয়কে নিবেদন করা নৈতিক কর্তব্যবোধে,—তেমনই আরও এক কারণ এই যে শ্রীশ্রীমাই রামকৃষ্ণ-ভাবজগতের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ—প্রচলিত কথায় 'হাই কোর্ট'। স্বয়ং মহাপুরুষ মহারাজ—স্বামী শিবানন্দই ঐ অভিধা ব্যবহার করেছেন শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে,—ভক্ত পাঠক-পাঠিকারা জানেন। সুতরাং ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সকল জিজ্ঞাসা বা সংশয়ের সুনিরসনের জন্য মায়ের পদপ্রান্তে উপনীত হওয়াটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল ওঁদের সবারই কাছে। এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমরাও তো দিবানিশি সারা জীবন ধরেই কতো গুরুবাক্য শুনে আসছি, পড়ে আসছি, জেনে আসছি—কিন্তু সে-সবের একটি বাক্যও তো আমার জীবনকে এতোটুকুও নাড়া দেয় না, সাড়া জাগায় না! পক্ষান্তরে ওঁদের ছিল কী গভীর আন্তরিকতা ও সত্যাগ্রহ! বিমলানন্দ তাই স্বামিজীর সামান্য একটু ভ্রুকুঞ্চনেও কী পরিমাণ বিচলিত বোধ করেছিলেন নিজেকে,—কতো তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসার ফলাকে তাঁর হৃদয় মথিত হচ্ছিল, তা ভাবলে

চমকিত হতে হয়,—বিমলানন্দের উদ্দেশে শ্রদ্ধায় আনত না হয়ে পারা যায় না। আদর্শের প্রতি এমন একাগ্রনিষ্ঠাই স্বামিজীর প্রত্যাশা ছিল তাঁর নিজ সন্তানদের কাছ থেকে। আরও এক কথা—বিমলানন্দ কোন্ তারিখে মাকে পত্র লিখেছিলেন তা' জানা না গেলেও, মায়াবতীতে পত্র-প্রাপ্তির তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ এবং 'মূল চিঠি'[১] থেকে অবগত হওয়া গেছে যে, পত্রখানি লেখানো হয়েছিল "১৩০৯/১৫ ভাদ্র" তারিখে—অর্থাৎ ৩১ আগস্ট, ১৯০২। সুস্পষ্ট থাকছে যে, শ্রীশ্রীস্বামিজী তখন স্থূল শরীরে নেই। শ্রীশ্রীমাও তজ্জন্য ঐ পত্রে তাঁর তখনকার শোকাহত মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করেছেন। লিখেছিলেন,—"শ্রীশ্রীস্বামিজী মহারাজের জন্য যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই।" এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা সুনিশ্চিত বলা কঠিন যে, স্বামিজী স্থূল শরীরে বিদ্যমান থাকাকালেই বিমলানন্দ ঐ পত্র মাকে লিখেছিলেন—কিংবা স্বামিজীর মর্তভনু চলে যাবার পরেই তাঁর মনের অস্থিরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে মায়ের কাছে পত্রমাধ্যমে উপস্থিত হয়েছিলেন শান্তিলাভের জন্য। স্বামিজী মহাসমাধিমগ্ন হন ৪ জুলাই,—তার প্রায় দু'মাস বাদে মা যে-চিঠির উত্তর লিখেছেন, তা' নিশ্চয়ই সদ্য হস্তগত হয়েছিল—অর্থাৎ স্বামিজী স্থূলতঃ অবিদ্যমান তখন। মায়াবতীর উল্লিখিত ঘটনার সময় জানুআরি, ১৯০২। নিশ্চয়ই ঘটনার অব্যবহিত পরেই মাকে পত্র লেখেননি—আবার ৪ জুলাইর মধ্যে কোনও সময়ে লেখা হয়নি, সেটাও অনেকটা আঁচ করে লওয়া চলে। তা'হলে এটাও কি একটা বিচার্য দিক নয় যে, স্বামিজীর বিরহই বিমলানন্দকে তুষানলে দগ্ধ করছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শ্রীশ্রীমাকে ঐ পত্র প্রেরিত হয়েছিল? যদি স্বামিজী বর্তমান থাকতে থাকতেই অতখানি উদ্বেলিত হতেন, তা'হলে তিনি মাকে যেমন লিখেছেন, সরাসরি স্বামিজীকেও তেমনই লিখতেন কিনা কে বলবে?

আমাদের অনুধ্যেয় প্রসঙ্গ: শ্রীশ্রীমায়ের গুরুভাব। কিন্তু আমরা প্রসঙ্গ ছেড়ে একটু প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি যেন। আসলে বিমলানন্দ সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলার একটা মানসিক তাগিদ-বোধ থেকেই এমনটা দিক্‌ পরিবর্তন এখানে। স্বামিজীর কোন কোন বাংলা জীবনীগ্রন্থে, লক্ষ করা গেছে যে, উপরি-উক্ত মায়াবতীর ঘটনাটির বর্ণনাতে বিমলানন্দজীর ব্যাপারের উল্লেখ একটু লঘুভাবেই করা হয়েছে। যেমন, "তবু একজনের মনে একটু সন্দেহ থাকিয়া গেল,—স্বামিজী যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কি সত্যই সর্বগুরুজনসম্মত?" আরও

১ স্বামী বিমলানন্দকে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের মূল পত্রখানি 'উদ্বোধন' ৭৪ বর্ষে পৃষ্ঠা ৫০৫ এ শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু কর্তৃক প্রকাশিত।

দেখা যায়,—শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের মতে উক্ত 'এই সন্দেহনিরাসের' জন্ত-ই স্বামী বিমলানন্দ জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখেছিলেন। অর্থাৎ, বিমলানন্দের পত্রখানি ছিল যেন কার্যতঃ একখানি 'অভিযোগ পত্র'! গ্রন্থকারের মতানুসারে পত্রলেখক বিমলানন্দ যেন স্বয়ং স্বামিজীরই কার্যপ্রণালীতে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বামিজী যা' করতে চাচ্ছেন সেটা 'সর্বগুরুজনসম্মত' কিনা তা' যাচাই করার উদ্দেশ্যেই মাকে পত্র দিয়ে তাঁর উত্তর প্রত্যাশা করেছিলেন। অত্যন্ত বিনতির সঙ্গেই নিবেদন করতে চাই যে, এ-রকম ধারণা অত্যন্ত অশ্লাঘনীয় অনুমান মাত্র,—বিশেষতঃ স্বামিজীর একজন একনিষ্ঠ অন্তরঙ্গজন সম্পর্কে।

বিমলানন্দের সন্দেহ, স্বামিজী যা করতে চাচ্ছেন তা 'সর্বগুরুজনসম্মত' কিনা, এ-রকমটা নিতান্তই অমূলক—অতিশয় কষ্টকল্পনা। বাস্তবিক পক্ষে, তাঁর সন্দেহ জেগেছিল নিজের উপরেই,—দ্বৈতের প্রতি একোটা ঝোঁক নিয়ে নিজেকে অদ্বৈত আশ্রমের একজন অঙ্গ বলে জাহির করাটা ন্যায়সঙ্গত কি না। শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন-পত্র ছিল এই উদ্দেশ্যে—কোনও অভিযোগ জানাতে নয়। স্বামিজীর জীবনীবিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ আকর বা প্রামাণিক গ্রন্থ 'The Life of The Swami Vivekananda' —By His Eastern & Western Disciples, যা মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকেই প্রকাশিত। সেখানে যা' আছে, তাতে আমাদের বক্তব্যেরই পূর্ণ সমর্থন মেলে। শুধু তাই নয়, মাকে লেখা পত্রখানি যে স্বামিজীর দেহান্তের পরবর্তী কালের,—আমাদের এই অনুমানেরও অনুমোদন পাওয়া যায় ঐ মূল প্রামাণ্য জীবনীতে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি :

"Later, soon after the Swami's (Vivekananda's) demise, Swami Vimalananda, who still doubted whether it was right for him to profess himself a member of Advaita Ashrama when he leaned towards dualism, appealed to the Holy Mother in this connection"। (—Life of S.V —Eastern & Western Disciples, Revised & Enlarged, Vol. II, pp. 572).

তা'হলেই কথাটা দাঁড়াচ্ছে, মায়াবতীতে ঠাকুর-ঘর স্থাপনার ব্যাপারে স্বামিজীর বিরূপতা প্রকাশের অনতিপরেই কিন্তু বিমলানন্দ পত্র লেখেননি মাকে। অথচ, আমাদের পূর্বোক্ত বাংলা জীবনীতে যে-ভাবে বলা হয়েছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, স্বামিজীর অসন্তুষ্টি ব্যক্ত হবার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াতেই বিমলানন্দ 'সন্দেহনিরাসের' জন্ত শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখেছিলেন।

যা' হোক, শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে উত্তর পেয়েই বিমলানন্দের মনে উত্থিত আত্ম-সংশয় চিরতরে প্রশমিত হয়েছিল—তিনিও যে স্বাধিকার সূত্রেই অদ্বৈতবাদী এই সিদ্ধান্তে চিরতরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ভক্তির প্রবণতাকেই তিনি দ্বৈতের প্রতি ঝোঁক মনে করে দ্বৈত-অদ্বৈতের দোলায় সাময়িক তখন বিচলিত বোধ করেছিলেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমই ছিল তাঁর কর্ম ও তপোক্ষেত্র—সেখানেই তিনি অন্তিম-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন (২৩ জুলাই, ১৯০৮)। অদ্বৈত-জ্ঞানে সমারূঢ় আত্মবিদ্ বিমলানন্দ উজ্জ্বল প্রসন্নবদনে স্মিতমুখে মাত্র তিনবার 'ওঁ ওঁ ওঁ' উচ্চারণ করেই ব্রহ্মলীন হয়ে যান।

শ্রীশ্রীস্বামিজীর গুরুভ্রাতা লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী স্বয়ং 'উদ্বোধন'-পত্রে মহাসমাধিমগ্ন বিমলানন্দকে স্মরণ করেই সখেদে লিখেছিলেন :

"আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদপদ্মে চিরানুরক্ত শিষ্যের এই হৃদয়ের শোণিত দান—এই প্রশংসা-স্বার্থ-বিরহিত অযাচিত প্রেমার্পণ—এই লোকচক্ষু-বহির্ভূত, আড়ম্বর-বর্জিত নিঃশব্দ হৃদয়ের পূজার কথা—মানব, তুমি কি বুঝিতে পারিবে? বুঝিবার চেষ্টাই বা তোমাদের কয়জন করিবে? হট্টগোলের জগতে মিথ্যা গোলযোগই লোকে করে ও বুঝে। বিমলানন্দ মূর্খের ন্যায় বৃথোদ্যমে শরীরপাত করে করুক, —এস, আমরা যাহা করিতেছি তাহাই করি।"

বহুজনের মনে উদিত ঐ যে অলীক ধারণা,—বিমলানন্দ সংশয়-দগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন স্বামিজীর কঠোর অদ্বৈতভাবের অভিব্যক্তিতে, আর সেই সংশয় নিরাসকরণের আশা নিয়েই তিনি মাকে পত্র লিখেছিলেন,—সে-ধারণা যে কতো অসার তা' যেমন উপলব্ধি করতে পারা যাচ্ছে এখন, তেমনই আমরা বিমলানন্দের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কী অপূর্ব আলোকে সমুজ্জ্বল ছিল তা'ও তাঁর স্ব-লেখনীমুখে প্রকাশিত দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে আবিষ্ট হই। না, বিমলানন্দের জীবন সঙ্গীতে কদাপি কোন ছন্দপাত ঘটেনি,—তাল ভাঙেনি, সুর কেটে যায়নি। শ্রীশ্রীস্বামিজীর কতো আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন তিনি! তিনি ইংরেজী 'বেদান্ত কেশরী' (ফেব্রুআরি, ১৯২৩)-পত্রে স্বানুভূত স্বামিজীর আদর্শকে এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন :

"আত্মতত্ত্ব বা মানুষের দেবত্বের উদ্বোধনই স্বামিজীর সমগ্র শিক্ষার সার কথা। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে স্বামিজীর আশ্চর্য উদার প্রকৃতির মূল রহস্য ইহাই। তিনি জ্ঞানী বলিয়াই এতবড় বিশ্বপ্রেমিক। আর এ-কথাও সত্য বলিতেছি যে জ্ঞান ও ভক্তি যে পরস্পর-বিরুদ্ধ আমার বহুকাল পোষিত এমন মারাত্মক ধারণাও,

স্বামিজীর কৃপাতেই বিদূরিত হইয়াছে—যেমন সূর্যের উদয়ে সকল অন্ধকারের বিলয় হয়। স্বামিজী মহা কর্মযোগী ছিলেন, কারণ তিনি একাধারে ভক্ত ও জ্ঞানী। যে মহাশক্তি সারা বিশ্বকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল এবং আজও যাহা বহু বহু নিদ্রিত আত্মাকে অন্তর্নিহিত দেবসত্তায় জাগ্রত করিতেছে, মৃত অস্থিতে জীবন সঞ্চার করিতেছে, হতাশার অন্ধকারে সূর্যালোকের প্রভা আনিতেছে ও শুষ্ক উষর প্রাণে প্রেম সিঞ্চন করিতেছে—সে শক্তির মূল তাঁহার ঐ সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন। একথা আবার স্পষ্ট বলিতেছি যে কর্ম হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধী, এমন সর্বনাশা ভ্রান্তি স্বামিজীর জীবনের স্পর্শে মুহূর্তেই আমা হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে।"

বিমলানন্দের প্রাণের ভাষায় লেখা এই কথাগুলি মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত হ'ল এখানে। বিমলানন্দ স্বামীর আত্মচরিত-কথনও বলা চলে এই উক্তিগুলিকে। প্রকাশিত নিবন্ধে স্বামিজীর 'জীবনের স্পর্শ'-কে বিমলানন্দ সোচ্চারেই ব্যক্ত করেছেন,—কিন্তু অনুচ্চারে অমুক্ত রয়ে গেছে তাঁর প্রাণের আরও এক গোপন স্মৃতি: শ্রীশ্রীমায়ের অমোঘ আশীর্বাদলাভের কথা। মায়ের ব্যাপারে তিনি বরাবরই ছিলেন সংগোপনচারী,—এমন কি মায়ের পাদপদ্মে আশ্রয়প্রাপ্তির কথাও তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও গোপন রেখেছিলেন বহুকাল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবজগতের যে ঐতিহাসিক পত্রখানিকে নিয়ে আমাদের বর্তমান অনুধ্যান,—শ্রীশ্রীমায়ের সেই মহামূল্য নির্দেশনা জগৎ পেয়েছে বিমলানন্দকে উপলক্ষ করেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতবাদী, না বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অথবা তিনি অদ্বৈতবাদী, —এ-প্রশ্ন যেমন পুরাতন ও চিরন্তন, তেমনই আমাদের সম্মুখে সূর্যালোকের মতো দৃপ্ত উত্তর—যা শাশ্বত, স্বতঃপ্রমাণ অবিসম্বাদি অবিতথ। "তিনি ত অদ্বৈত"—শ্রীশ্রীমায়ের লিখিত দেশনা। তা'হলে আমরা কী? স্পষ্ট সত্য: "তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী"। জ্ঞানদা শ্রীসারদার অব্যর্থ সুমন্ত্রণা প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রয়ীর উদ্দেশ্যে। অখিলগুরুমূর্তি শ্রীশ্রীমাকে মুহুর্মুহুঃ প্রণতি জানাই: "সর্ববেদান্ত সংসিদ্ধে নমো শ্রীসারদামূর্তয়ে"।

* * *

গুরুশক্তি নিত্য। স্থূল দেহধারী গুরু অপ্রকট হলেও, তাঁর সূক্ষ্মশক্তি নিত্যকাল ক্রিয়াশীল থাকে,—আশ্রিত প্রপন্নজনকে তা' সদাই রক্ষণাবেক্ষণ করে। সাধারণ

মনুষ্যগুরুর মধ্যেও সেই একই শক্তি বিদ্যমান থাকে—যেমন ছাদের নল দিয়ে সেই এক আকাশের বারিধারাই নেমে আসে। কিন্তু সমষ্টি গুরুশক্তি যখন মূর্তি-পরিগ্রহ করে ধরাধামে আবির্ভূত হন, তখন তাঁর স্বভাব-নিত্যত্ব যেন আর গোপন থাকেনা কোনও মতেই—তার বহুলপ্রকাশ মুমুক্ষু জীবকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করে। দেবী সারদাও নিত্যলীলাময়ী। তিনি স্থূলশরীরে অনুপস্থিত থেকেও তাঁর অনুগ্রহ-বিতরণ বা অভীষ্টপূরণরূপ স্বাভাবিক কর্মগুলি ঠিকই করে চলেন। ভক্ত মহাজনরা তাই বলে থাকেন: "অদ্যাপিও নরলীলা করে গোরা রায় / কোনও কোনও ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।"

শ্রীশ্রীমা তাঁর মর্ত-লীলার অন্ত্যভাগে ভক্তকল্যাণে—তাদের চিন্তায়, ভাবনায়, সেবায়, আপ্যায়নে—তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে, দীক্ষাপ্রদানে, মুক্তি-বিতরণে যেমন উন্নিদ্র প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করেছেন, তেমনই কল্পনাতীত শ্রম স্বীকার করেছেন—আহার-বিশ্রাম পর্যন্ত বর্জন করেছেন। আবার নিজমুখেই কতজনকে বলেছেন—'ঠাকুরের দয়া পেয়েছ বলেই এখানে এসেছ।' ঠাকুরের দয়াতেই মায়ের আশ্রয়লাভ সম্ভব। আবার মায়ের কৃপাতেই ঠাকুরের দয়াকে আকর্ষণ করা যায়। আমরা এই হেঁয়ালির মধ্যে প্রবেশে অক্ষম। আমরা শুধু দেখেছি,—মা-ই অতন্দ্র জেগে বসে থেকেছেন মানুষের জন্য,—'কে কোথায় আছিস্ আয়' মাত্র এই-ই যেন নিরন্তর ডাক আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে ছিল। সে-ডাক অনাহত,—লীলাতনু ছেড়ে যাবার পরেও তিনি সমানই ডেকে চলেছেন। না, শুধু ডেকে নয়, একেবারে চাক্ষুষ,—সম্মুখেই প্রকট হচ্ছেন দ্বারে দ্বারে। শ্রীরামকৃষ্ণ "লীলাও সত্য" এ-কথা সহস্রবার শুনিয়ে গেছেন। মা ততোধিকবার দেখিয়েছেন সে-সত্যকে। স্থূল-সূক্ষ্ম উভয় দেহ পরিত্যক্ত হলেও শ্রীভগবানের বা তাঁর আবির্ভূত গুরুশক্তির লীলা-রূপ কোনও কালেই বিনষ্ট হয় না। সে চিন্ময় বিগ্রহ নিত্য-ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। এই নিত্যলীলার আভাস শ্রীশ্রীমায়ের নিজমুখের একদিনের স্বীকারোক্তি থেকে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। ঘটনাটি এই রকম ('শ্রীশ্রীমায়ের কথা' দ্রষ্টব্য):

বলরামবাবুর ছাদে বসে ধ্যান করতে করতে মা একদিন সমাধিতে মগ্ন হয়ে যান। পরে সমাধি থেকে নেমে এসে বলেছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমাকে কত আদর-যত্ন করছে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সেখানে, তাঁর পাশে আমাকে আদর করে বসালে। সে যে কি আনন্দ, বলতে পারি না। একটু হুঁশ হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে

রয়েছে। তখন ভাবছি—কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভিতর ঢুকব? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁস এল।"

শ্রীশ্রীমায়ের স্থূলদেহে লীলাসম্বরণের পরবর্তী কালে তিনি অনুগৃহীত জনের কাছে নানা ভাবে ও রূপে নিজেকে প্রকট করেছেন এবং করে আসছেন। ভাবোদ্দীপক মায়ের সেই সব নিত্যলীলার ছবি উদাহরণ-স্বরূপ দুই-একখানি এখানে আমাদের মনন-নেত্রের সম্মুখে তুলে ধরতে প্রয়াসী হচ্ছি। এতদ্-সংক্রান্ত একটি উজ্জ্বল সাক্ষ্য উপস্থাপনা করেছেন ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁর 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' গ্রন্থে (পৃঃ ৩১৬)—সেখানে তিনি শ্রীম—মাষ্টার মশায়ের লেখা একখানি পত্রের উল্লেখ করেছেন। আরও জানিয়েছেন যে পূজ্যপাদ কথামৃতকারের লিখিত সেই পত্রখানি তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত আছে। ভক্ত উমেশ বাবুকে ঐ পত্রে শ্রীম-লিখেছেন ঃ

"সেদিন স্বপ্ন দেখিলাম, মা বলিতেছেন, 'তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখেছিলে, সে দেহ মায়িক ; এই দেখ আমি সেইরূপই রহিয়াছি'।"

মায়ের তিরোধানের পরের বৎসর (অর্থাৎ ১৩২৮ বঙ্গাব্দে) দেবীপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্রীম-লিখেছিলেন সেই পত্রখানি।

কাশীতে স্বামী অপূর্বানন্দজীর মুখে তন্ময় হয়ে শুনেছিলাম, তিনি কেমন অলৌকিক ভাবে তাঁর বহু বাঞ্ছিত মায়ের মুখের শেষ একটি কথা শুনেছিলেন।

"মায়ের শেষ অসুখের সময়ে একদিন মায়ের বাড়িতে গিয়েছি—যেমন রোজই যেতাম। মায়ের বাড়ি থেকে মঠে ফিরেই মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করতেই তিনি মায়ের সংবাদ সব জানতে চাইতেন। সেদিনও তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি নিবেদন করেছিলাম যে, রাত্রে তাঁর এতোটুকুও ঘুম হয়নি, সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা, ছট্‌ফট্ করছেন। শুনতে শুনতে মহাপুরুষ মহারাজের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলেছিলেন—'আহা! সকলের পাপ গ্রহণ করেই তো মায়ের এত অসুখ। তাই তো সর্বাঙ্গে তাঁর ঐ বিষের জ্বালা। তিনি শত শত সন্তানের পাপতাপ নিজের ভিতর আকর্ষণ করে নিয়ে সন্তানদের নিষ্পাপ করে দিচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা ও মায়ের কৃপা একই। ঠাকুর নরদেহ ত্যাগ করে এখন শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে বাস করছেন। যারা মায়ের কৃপা পেয়েছে তাদের এই শেষ জন্ম। মা, মা, তুমি ভক্তদের জন্য কত কষ্টই না সহ্য করছ! একদিন ঠাকুর আমায় বলেছিলেন—ঐ যে নহবতে আছে, আর মন্দিরে ভবতারিণী একই। আমি তখন কি এত সব বুঝতাম! তিনি বলেছিলেন—শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

যে মাকে দর্শন করেছে—সে মুক্ত হয়ে যাবে। মায়ের দর্শন কি কম ভাগ্যের কথা!' বলতে বলতে মহাপুরুষজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুই চোখ ভরে জল!"

সেদিন মায়ের প্রসঙ্গ শোনাতে শোনাতে শঙ্কর মহারাজ—অপূর্বানন্দজীও বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন বার বার লক্ষ করছিলাম। পূজ্যপাদ মহাপুরুষজীর উক্তি থেকে শ্রীশ্রীমায়ের অসামান্য ভাবমূর্তি—তাঁর অনন্ত গুরুশক্তির প্রকাশচিত্রও আমাদের কাছে আরও একবার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন অপূর্বানন্দ মহারাজ। তিনি আরও বলেই চলেছিলেন:

"আমি সেদিন কাঁদতে কাঁদতে মহাপুরুষ মহারাজকে জানিয়েছিলাম—'মাকে রোজই তো দর্শন করছি, কিন্তু মায়ের মুখের একটি কথাও তো শুনতে পাইনা একদিনও। আমার কেবলই মনে হয়—আহা মা একটি কথাও বলতেন আমার সঙ্গে!' মহাপুরুষ মহারাজ খুব আবেগভরা উত্তর দিয়েছিলেন,—'ঐ যে মা তোমার দিকে চেয়ে থাকেন, ঐ তো তাঁর আশীর্বাদ। তিনি কৃপাদৃষ্টিতে তোমায় দেখেছেন। তোমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। মায়ের কৃপা পেয়েছ—তোমার এ-জীবনের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।'

"মহাপুরুষ মহারাজের সে শুভ-ইচ্ছা এক অলৌকিক উপায়ে আক্ষরিকভাবে সত্য হয়েছিল। দেহত্যাগের রাত্রিতে শ্রীশ্রীমা দিব্যদেহে জ্যোতির্ময়ী রূপে আমার শেষ আশীর্বাদ করেছিলেন। ২০ জুলাই ১৯২০। রোজ যেমন ঘুমোই সেদিনও তেমনি ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত প্রায় দেড়টার সময়ে অদ্ভুতভাবে মায়ের দর্শন পাই। অসাধারণ সেই দর্শন। মাকে জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে দেখতে পেলাম। তিনি সস্নেহে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমাকে মধুরস্বরে ডেকে বলছেন: 'বাবা, আমি যাচ্ছি।' এই অদ্ভুত দর্শনের মর্ম কিছুই বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম, যখন মায়ের দেহরক্ষার মর্মভেদ্ সংবাদটি পেলাম। মা উদ্বোধনে মর্তত‌নু ত্যাগ করেছেন প্রায় সেই সময়—যখন আমি তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম।"

* * *

রক্তমাংসে গড়া স্থূল শরীরকে ছাড়াই মা তাঁর আপন ইচ্ছায় সর্বত্রগামিনী সর্বব্যাপিনী এবং সর্বকরণকারিণী—সূক্ষ্ম শরীরিণী। জাগ্রতেই মাত্র দৃশ্যমানা নন, স্বপ্নচারিণীও বটে তিনি। জাগ্রৎ-স্বপ্নের পারেও তিনি কারণ-শরীরিণী—সুষুপ্তি-

বিহারিণী। জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই মা বিরাজমানা—লীলা-বিলাসিনী। অবস্থাত্রয়ের অবসানাবস্থাতেও মা তুরীয়া। তাই তো তিনি নিত্যা—নিত্যলীলাময়ী। আমরা দু'টি সজীব চিত্র দেখলাম, যেখানে মা স্থূল-সূক্ষ্মে, জাগরণে-স্বপনে সমান প্রভাময়ী।

প্রশ্ন এই : স্বপ্নে দর্শন কি সত্য? স্বপ্ন তো স্বপ্নই,—তার দর্শনাদিও তা'হলে ভ্রান্তি বা অলীক। কিন্তু এমন এক নিঃশ্বাসেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলা যাবে না।

'একটি ভক্ত' (হয়তো শ্রীম-স্বয়ং) শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে চিত্রিত রয়েছে (চতুর্থ ভাগ, চতুর্বিংশ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। চিত্রটির অংশ :

"প্রত্যূষ হইল। ঠাকুর মার নাম করিতেছেন। পশ্চিমের বারাণ্ডায় গিয়া গঙ্গা দর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যস্থিত দেব দেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়া নমস্কার করিলেন। ভক্তেরা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রণামাদি করিয়া প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন।

"ঠাকুর পঞ্চবটীতে একটি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনি স্বপ্নে চৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবিষ্ট হইয়া)। আহা! আহা!

"ভক্ত। আজ্ঞা, ও স্বপনে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বপন কি কম!

"ঠাকুরের চক্ষে জল। গদ গদ স্বর!

"একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন কথা শুনিয়া বলিতেছেন—'তা আশ্চর্য কি! আজকাল নরেন্দ্রও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে।'"

"স্বপন কি কম!"

আবার জাগরণ অবস্থায় দর্শনের কথায়—"তা আশ্চর্য কি!"

শ্রীরামকৃষ্ণ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থার দর্শনকেই সমান মহিমান্বিত করেছেন—উপরোক্ত কথামৃত-কণা দু'টি থেকে সহজেই প্রতিভাত হচ্ছে।

কথামৃত-পাঠকের জানা আছে,—শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক ক্ষেত্রে জানতে চাইতেন, ভক্ত কোনও রকম স্বপ্নাদি দেখে কিনা, বা কী ধরণের স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়কে জেনে নিয়ে, তিনি ভক্তের লক্ষণ বিচার করতেন—কখনও কখনও ভাবী শুভাশুভ বলে দিতেন। সুতরাং মানুষের জীবনযাত্রায় স্বপ্নকে সর্বাংশেই অর্থহীন, শুভাৎপর্যশূন্য জ্ঞান করা ঠিক হবে না। বিশেষতঃ অধ্যাত্ম-রাজ্যে স্বপ্নকে যথেষ্ট

ইন্দ্রিয়বহ বলেই মনে করা হয়ে থাকে। যদিও এ-কথাও খাঁটি যে, জাগ্রতেরও যেমন সব ঘটনার পারম্পর্য বা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না, স্বপ্নেরও সকল দৃশ্যের সত্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা বৃথা—এক অলস প্রয়াসমাত্র। পূজ্যপাদ বিরজানন্দ মহারাজ এই প্রসঙ্গে এক জিজ্ঞাসার উত্তরে যা' বলেছিলেন, সেই কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এখানে। তাঁর উক্তি :

"গুরু, ইষ্ট ও দেবদেবীর স্বপ্ন দেখা খুব ভাল। এতে মনে খুব উৎসাহ, আনন্দ হয়। তবে না দেখতে পেলেও মন খারাপ করবে না। ওরকম স্বপ্ন দেখলে যার তার কাছে বলে বেড়াবে না। ইচ্ছে করলে গুরুকে বলতে পার। আর স্বপ্নের প্রত্যেক অংশের মানে কি, তা নিয়েও মাথা ঘামাতে যাবে না। স্বপ্ন স্বপ্নই, সবটার মধ্যে একটানা সামঞ্জস্য থাকবে, এরকম আশা করা বৃথা।"

সামঞ্জস্য বা পৌর্বাপর্য স্বপ্নে থাকে না,—জাগ্রতেও তা' সব সময়ে মেলে না। সে দিক থেকে জাগ্রতের ঘটনাবলীও তো অনেক ক্ষেত্রে নিতান্তই স্বাপ্নিক। আবার স্বপ্নকালে দৃষ্ট যাবতীয় দৃশ্যাবলী জাগ্রত প্রত্যক্ষ বলেই অনুভূত হয়ে থাকে। তাই তো মাঝে মাঝে এক কঠিন প্রশ্ন আমাদের সবারই মনকে আন্দোলিত করে : জীবন কি সত্য? অথবা এই জাগ্রত জীবনও একটা অতি দীর্ঘ স্বপ্ন? দৃশ্যমান এই বিশাল বিচিত্র জগৎটা কি বাস্তবিকই এই রকম,—না এ-সবই আমাদের দেখার ভুল? স্বপ্নে মনের খেলা—অদ্ভুত কারসাজিকে আমরা জানি। মাত্র কয়েক মিনিটে, এক শতাব্দকে পরিদৃশ্যমান করে তোলে। জাগরণেও তো সেই মন আমাদের সঙ্গে অমনই কারিকুরি ও কূটকৌশল করে থাকে প্রতিনিয়ত! প্রকৌশলবিদ্ এই মনের বিচার কে করে? স্বপ্ন ও জাগরণের পরিসীমা বাস্তবিকই অবোধ্য মানুষের পক্ষে। জ্ঞানী, সুধী কবিদেরও হতচকিত করে আসছে এই প্রশ্ন,—জাগরণ ও স্বপ্নের মধ্যে কোন্ অবস্থাটি বিশ্বাসযোগ্য—বাস্তবিক কোন্‌টি? মনস্বী সেক্সপীয়রকেও বলতে শোনা গেছে :

> "We are such stuff
>
> As dreams are made of, and our little life
>
> Is rounded with a sleep."—(Tempest, IV)

—স্বপ্ন যে-উপাদান দিয়ে গড়া, আমরাও তো তাতেই তৈরী। স্বপ্নের শেষে যেমন সুষুপ্তি, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও তেমনি মরণ-রূপ মহা সুষুপ্তিতে ডুবে যায়!

কবি এখানে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মাঝে কোনও ভেদ দেখেননি—তাই উভয়কেই সমান উপাদানে রচিত না বলে পারেন নি।

বিশ্রুত গ্রীক্ দার্শনিক ডাইওজিনিস্ এই জাগ্রতের জগৎটাকে নেহাতই স্বপ্নজ্ঞান করতেন। দুর্জনের দ্বারা নিপীড়িত তাঁর শরীরকে যখন কঙ্করময় পথে ফেলে ক্ষতবিক্ষত করা হচ্ছিল,—তখনও দুষ্টরা তাঁকে উপহাস করছিল: "ওহে ডাইওজিনিস্! জগৎটাকে কেমন লাগছে এবার বল। এখনও কি স্বপ্নই বলবে?" জ্ঞানী ডাইওজিনিস্ হেসে জবাব দিয়েছিলেন: "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। জগৎ স্বপ্নই—তবে ঠিক এক্ষুণি এটা যন্ত্রণাপ্রদ স্বপ্ন।" ('Oh yes! The world is a dream, but this is a painful dream.')

জগৎ তথা জাগ্রতাবস্থার জীবনকে পর্যালোচনা করে, স্বপ্নেরই তুল্য জ্ঞান করেছেন এঁরা মানুষের জাগরণাবস্থাকেও। আবার এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় যে, স্বপ্নের বাস্তবতাকে জাগ্রতের মতোই ধরে নিয়ে, স্বপ্নের দৃশ্যাবলীর প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছেন স্বপ্নভঙ্গের পরেও। আমাদের পুরাণ থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারি,—রাজর্ষি জনক তাঁর দুঃস্বপ্নকে এতোই উচ্চমূল্য দিয়েছিলেন যে, প্রভাতে জেগে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন থেকেও কেবলই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন ঐ দুঃস্বপ্ন-স্মৃতিতে। অমাত্য-পরিষদ ও অনুগত প্রজাগণ পরিবৃত থেকেও তাঁর চিত্তে একটিই মাত্র প্রশ্ন আলোড়ন তুলছিল—"কোনটি সত্য? গতরাত্রের দুঃখময় স্বপ্ন কিংবা এই জাগ্রত প্রভাতের মহিমোজ্জ্বল রাজদরবার?" অবশেষে মহাতাপস অষ্টাবক্র ঘটনাচক্রে রাজর্ষি সমীপে উপস্থিত হলে, তাঁকেও সেই প্রশ্ন নিবেদন করেন জনক। জনক-অষ্টাবক্র সংলাপ থেকে জানা যায় যে, জনকের জ্ঞানলাভ হয়েছিল গুরু অষ্টাবক্রের মুখে শ্রুত উপদেশ থেকেই। অষ্টাবক্র বলেছিলেন—"মহারাজ, স্বপ্ন ও জাগরণ দুই-ই সমান। উভয়ের কোনওটিরই পারমার্থিক সত্যতা নেই। দুই অবস্থারই দ্রষ্টা আপনি।"

জাগ্রদাবস্থায় এই জগতের সুখ-দুঃখের প্রতীতি দুই রকম,—স্বপ্নেও সুখ-দুঃখ দুই প্রকারের অনুভূতি। বিচার করে দেখলে, জাগ্রৎটাও একটা বিরাট লম্বা স্বপ্ন,—জাগরণাবস্থার সুখও যেমন স্থায়িত্বহীন স্বপ্নতুল্য, দুঃখবোধও তেমনই স্বপ্নপ্রায়। এই জানাকেই বলে যথার্থ জ্ঞান। পরমার্থতঃ এক আত্মবস্তু সদা বিদ্যমান, নিত্য, অখণ্ড, একরস;—যিনি সর্ব সুখ-দুঃখের অতীত।

* * *

আমরা স্বপ্নকে ও জাগরণকে বিচারের আলোকে দেখতে চাইছি,—কিন্তু

এই দুই অবস্থার অবসান যাতে, সেই সুষুপ্তিকেও দেখার প্রয়াসকে অন্তরে প্রযত্নপর রাখতে হবে। অন্যথায় বিচারের খেই মিলবে না। সংক্ষেপে যে-কথাগুলি উপস্থাপিত হচ্ছে, বস্তুতঃ সেগুলিই অধ্যাত্মরাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ—বেদান্ত-বিজ্ঞানের সারতত্ত্ব।

জাগ্রৎ বলা হয় সেই অবস্থাকে, যখন আত্মা প্রধানতঃ স্থূল অন্নময় দেহে অভিমানী থাকেন। এই কালে ইনি বাহ্যবিষয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন। মাণ্ডুক্য শ্রুতির ভাষায়: "জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রজ্ঞঃ"। ইনি স্থূল বিষয়ভোগী। জাগরণাবস্থায় মন সারা শরীরে বিচরণ করে,—ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়-স্পর্শের সংবাদ বুদ্ধিকে পৌঁছে দেয়। তাই বুদ্ধি এই জগৎকে জানে এবং জগতের সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ অনুভব করে মত্ত হয়ে থাকে। স্থূল দেহাভিমানী আত্মা আমি—তখন আত্মবিস্মৃত। নিজেকে 'বুদ্ধি' জ্ঞান করে। অন্যের সুখ-দুঃখ—বিশেষতঃ যাতে বেশি আসক্ত এমন বন্ধু বা প্রিয়জনের দুঃখ-সুখকে যেমন আমার নিজেরই দুঃখ বা সুখ বলে ভ্রম হয়, ঠিক তেমনই আমি বুদ্ধির মত্ততায় নিজেকেই দুঃখিত বা সুখী বোধ করে থাকি। যাবজ্জীবন নির্জন কারাবাস করতে করতে কোনও বন্দীর জীবনে একাকিত্বের যে-পরিণাম ঘটে থাকে কখনও কখনও—অনেকটা যেন ঠিক ঐরকমই ব্যাপার এখানেও। কারারুদ্ধ বন্দীর মস্তিষ্কে বিকার-লক্ষণ প্রকাশ পায়—সে ভাবে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেন তার এক এক প্রতিবেশী জীব। দু'খানা হাত যেন তার দু'জন ক্ষমতাশালা বন্ধু—তাদের এক একজনের পাঁচ-পাঁচজন পুত্র! পরমেশ্বর বা আত্মাও যেন ঠিক ঐ ধরণের বন্দীদশাপ্রাপ্ত হয়েছেন;—কিন্তু সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি মায়ার বন্ধন স্বীকার করে এইভাবে বদ্ধজীবের অভিনয় করছেন। বদ্ধজীবের জাগ্রদাবস্থার যাবতীয় সুখ-দুঃখ ভোগ সবটাই তার আপন মনঃসৃষ্ট। জাগরণাবস্থায় স্থূল বিষয়ভোক্তা এই আত্মাকে বেদান্ত আখ্যা দিয়েছেন বৈশ্বানর বা বিশ্ব নামে।

আত্মা যখন সূক্ষ্মদেহে (প্রাণ, মন ও বুদ্ধিতে) অভিমানী, তখনই জীবের স্বপ্নাবস্থা। এই কালে ইনি অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ মনের সংস্কারদ্বারা উপস্থাপিত সূক্ষ্ম আন্তর বিষয়সকলের প্রজ্ঞাযুক্ত। 'স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ' (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)। বাসনাময় বিষয়সকলই ভোগ করেন তখন। মন তখন স্থূল দেহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের মধ্যেই বিহার করে—জাগরণাবস্থার কিছুই তার খেয়াল থাকে না, বাসনা বা অবিদ্যাপ্রভাবে মন সেই কালে নানা ভোগ্য ও দৃশ্যবস্তু সৃষ্টি করে থাকে। স্বপ্নকালে রচিত পথঘাট বাড়িঘর মানুষজন ঘোড়াঘোড়া

প্রভৃতিকে প্রকাশিত করার জন্য বাহিরের সূর্য-চন্দ্র অগ্নির বা কোনও আলোকের দরকার করে না। আত্মা স্বকীয় তেজদ্বারাই স্বপ্নের যাবতীয় কিছুকে প্রকাশ করেন। বেদান্তে এই সূক্ষ্মদেহাভিমানী আত্মাকে অভিহিত করা হয় তৈজস নামে।

অনেকে ভাবেন, স্বপ্ন বোধ হয় জাগ্রৎকালের স্মৃতি থেকে উৎপন্ন। তা কিন্তু মোটেই নয়। এ-কথাটি একটু বুঝে দেখার অবকাশ রয়েছে। জাগ্রতের সব অনুভবই হয়ে থাকে স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে বাহ্য স্থূল বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষ দ্বারা লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে। তখনও সব কিছুকে বোধ করা যায় "এই" "এই" আকারে। যেমন বলা হয়ে থাকে "এই পাহাড়", "এই নদী", "এই মানুষ" ইত্যাদি ভাবে। জাগ্রতে পূর্বপ্রত্যক্ষ কোন কিছু যদি কাছে না থাকে (দেশ বা কালিক দূরবর্তী হয়), অথচ সেই আগেকার দেখা রূপ বা বিষয়টি চিত্তে ভাসতে থাকে, তাকেই বলা হয় স্মৃতি। স্মৃতির ক্ষেত্রে অনুভব হয় "সেই" আকারে,—যেমন প্রকাশ করা হয়ে থাকে, "সেই পাহাড়টি" "সেই নদীটি" কিংবা "সেই মানুষটি"। আবার পূর্বদৃষ্ট কিছুকে যদি পুনরায় প্রত্যক্ষ করা যায় ঠিক সেই একই ভাবে,—তাহলে কিন্তু অনুভবকে ব্যক্ত করা হয় "সেই এই" আকারে। একে দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় "প্রত্যভিজ্ঞা"। প্রত্যভিজ্ঞাস্থলে আগেকার সুদর্শন নামক ব্যক্তিকে পুনর্বার কাছে পেলে সচরাচর অনুভূতি প্রকাশ করা হয়—"সেই এই সুদর্শন" বা "এই সেই সুদর্শন" বলে। স্বপ্নে কিন্তু দৃষ্ট কোন কিছুকেই কদাপি "সেই" বলে অনুভব হয় না,—পরন্তু স্বপ্নকালে সমস্ত দেখাকেই বোধ হয় "এই" (সম্মুখে বিদ্যমান) আকারে। তা'হলেই মানতে হচ্ছে যে, স্বপ্নে স্মৃতি বলে কিছুই বোধে আসে না,—স্বপ্নদৃষ্ট সব কিছুই যেন প্রত্যক্ষ বলে অনুভূত হয়ে থাকে। যদি স্বপ্নদৃষ্ট কোন কিছু স্মৃতিই হ'ত, তবে "সেই" "সেই" আকারেই তা অনুভব করা যেত। কেউ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে এসে, কখনও বলে না যে "আমি অমুককে স্মরণ করেছি",—বরং স্পষ্টভাষায় জানায়, "আমি অমুককে স্বপ্নে দেখেছি"। আরও একটি বিচার্য বিষয় : স্মৃতির বস্তু সব সময় দূরবর্তী বলে, স্মৃতিতে কোনওরূপ শারীরিক বিকার—ভয়, পলায়ন, লোভ প্রভৃতিপ্রকট হয় না। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ—একেবারে সমীপবর্তী তা থেকেই শরীরে নানা ধরণের বিকৃতি, ইন্দ্রিয়-প্রতিক্রিয়া, হৃৎস্পন্দন, অশ্রুপাত, ভয়, ক্রোধ, পলায়ন প্রভৃতি অনিবার্য,—স্বপ্নে যা হামেশাই ঘটে থাকে।

কথাটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, স্বপ্নজগৎ জাগ্রতেরই স্মৃতিমাত্র,—এটা অনুভব-বিরুদ্ধ। বরঞ্চ বলতে পারা যায়,—যে-হেতু স্বপ্নের দেখাশোনা প্রত্যক্ষ অনুভূত, তাই স্বপ্নদৃষ্ট বা স্বপ্নশ্রুত সব কিছুরই তৎকালিক সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য। কেননা যে

বস্তু অলীক বা অসৎ—যা একেবারেই নেই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, দিল্লীর লাড্ডু, ঘোড়ার ডিম প্রভৃতির প্রত্যক্ষজ্ঞান কখনোই হয় না।

আত্মা বা আমিই মায়াশক্তি দ্বারা স্বাপ্নবস্তুগুলিকে অনির্বচনীয়রূপে সৃষ্টি করি। তাই স্বাপ্নবস্তুকে বা রূপকে একেবারে নেই বলা মোটেই উচিত নয়, যেহেতু তা' প্রত্যক্ষ। অবশ্য এটাও ঠিক যে, স্বপ্নকে সত্য সত্যই বাস্তব ঘটনা বলা যায় না। কেননা জাগ্রতে তা' থাকে না। যা' সৎ বা সত্য নয়, আবার অসৎ অলীকও নয়, তাকে সদসৎ (সৎ+অসৎ)-ও বলা চলে না। কারণ একই বস্তুতে সৎ ও অসৎ এই বিরুদ্ধতা অসম্ভব। তাই স্বপ্নের দৃশ্য বস্তু ও আকারগুলির স্বরূপ অনির্বচনীয় এবং সাক্ষিভাস্য। অর্থাৎ সাক্ষী আমি বা আত্মাই স্বাপ্নবস্তুর সাক্ষাৎ প্রকাশক।

আর একটি অবস্থা—আত্মা তখন মূল অজ্ঞান বা কারণদেহে অভিমানী। তখন তিনি প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন। মন তখন বুদ্ধিতে লীন থাকে—ফলে তখন আর জানা জানি কিছুই থাকেনা,—কোনও স্বপ্নও দেখে না। এই অবস্থার নাম সুষুপ্তি—যে অবস্থায় আমরা অজ্ঞানে সম্পূর্ণ আবৃত থাকি,—এ-এক আত্মবিস্মৃত পর্যায়। "যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্।" (মাণ্ডুক্য উপনিষৎ) এটাই মায়াশক্তির দারুণ আবরণরূপ খেলা,—বেদান্তে একেই বলে 'অবিদ্যা'। বীজ যেমন বৃক্ষের কারণ, যেন অবিকল তেমনি এই অজ্ঞান বা কারণ দেহই সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহদ্বয়ের কারণ। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের বিষয়গুলিকে সুষুপ্তিকালে দেখা যায় না, তখন এরা সবাই মূল অজ্ঞানেতে বীজভাবে লীন থাকে। রাত্রির অন্ধকার যেমন দিনের বহুবিধ বস্তু-বৈচিত্র্যকে আচ্ছাদন করে, জমাট কালো একীভূত ভাবকে প্রতীত করায়, সেই রকম সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানও জীবের মনঃসৃষ্ট যাবৎ দ্বৈতকে আবৃত করে এক মহা অভাবরূপে প্রতীত করায় সবকিছুকে। এই মহা অভাবরূপের বা সর্ববিস্মৃতির একটা আমেজ বা সুখ আছে,—সব কিছুকে ভুলে থাকার অনুভূতিকে 'প্রজ্ঞানঘন এব' বলেছেন শ্রুতি। আনন্দ-ভোগ অনায়াসেই হয়ে থাকে এই অবস্থায় তাই বলা হয়েছে "আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্"। মনে রাখতে হবে, এই সুষুপ্তিতে আনন্দ প্রচুর থাকলেও, আনন্দস্বরূপতা বোধ কিন্তু তখনও পর্যন্ত হয় না। মাণ্ডুক্য শ্রুতি বলেন—"সুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ো হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয় পাদঃ।" (—মাণ্ডুক্য, ৫) অজ্ঞানেতে অভিন্নরূপভাবে ভেদবোধ থাকেই। সুষুপ্তি থেকে জাগার পরক্ষণেই অজ্ঞান থেকে ঐ ভেদবোধও আবার ফুটে ওঠে। মনে রাখা আবশ্যক যে, সুষুপ্তিকালে যাবতীয় অন্তঃকরণবৃত্তি (মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার) বিলীন অবস্থায় থাকলেও

অবিদ্যা বা অজ্ঞানবৃত্তি ঠিকই থাকে—তবে অতি সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট অবস্থায়। একমাত্র গভীর ধ্যান-সঞ্জাত সমাধিকালেই সাত্ত্বিক অন্তঃকরণবৃত্তি অনিদ্র অতন্দ্রিত থাকে,—ব্রহ্মাকারা বৃত্তি তাকেই বলে। জীবের সুষুপ্তিকালে তার মন-বুদ্ধি অজ্ঞানে লীন থাকে বলে, তার আত্মস্বরূপের জ্ঞান হতে পারে না—তার অজ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয় না। পক্ষান্তরে সমাধি অবস্থাতে জীবের সাতিশয় সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ বুদ্ধি, যা একনিষ্ঠ সাধনভজনের দ্বারা লব্ধ তা অবিলুপ্তই থাকে। শুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবেই জীব অবশেষে আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম হয়—সর্বদুঃখাতীত পরমানন্দেরও অধিকারী সে তখন। শুদ্ধ বুদ্ধিদ্বারা "আমি ব্রহ্মই" এই রকম অবাধিত দৃঢ় সুনিশ্চিত ধারণাই তত্ত্বজ্ঞান। সর্বদ্বৈতের অবসান তখনই।

* * *

মোটামুটিভাবে বেদান্ত-দৃষ্টিতে জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের সারার্থজ্ঞাপক নিষ্কর্ষ এই-ই। আমাদের উত্থাপিত প্রশ্ন প্রসঙ্গেই এতো কথার অবতারণা। মায়ার রঙ্গমঞ্চে তিনটি পট-প্রকোষ্ঠ—আলোকিত, স্বল্পালোকিত এবং অনালোকিত—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। একই জীবন-নাট্যের অভিনয় চলে একই কালে এই তিন পট-প্রকোষ্ঠে,—ঘূর্ণায়মান সংসার-মঞ্চে অভিনীত দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে আমরা এতোই অভিভূত হয়ে থাকি যে, মঞ্চশৈলীর দিকে একটুও দৃষ্টিপাত করার অবকাশ পাইনা। যখন যে প্রকোষ্ঠে অভিনয় দৃশ্যমান থাকে,—আমাদের সবটুকু নজর আকৃষ্ট থাকে তারই দিকে। হায় মায়া!

এমন চমৎকারিণী প্রযোজনা কার কুশলতায়? উত্তর—মনের। জাগরণের কুশলা মন, স্বপ্নেও তাকেই দেখি নট-নিপুণা। সুষুপ্তিতে কিন্তু মন অন্তর্লীনা। এই অন্তর্লীন অবস্থায় মন যেন বিশ্রামরতা—নিজের মধ্যেই নিজেকে সংবরণ-মগ্না। একই মন—কিন্তু তিন প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন রূপধারিণী। স্বপ্নে যেমন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গী-সাথী সকলেই মনের দ্বারা সৃষ্ট, জাগরণেও অনুরূপভাবে মনই একমাত্র শিল্পী ও সৃজনকারিণী আমার ও আমার আশে-পাশের সকল কিছুর। স্বপ্নে এবং জাগরণে এই মন জল-বাতাস-আলো-আকাশ-বৃষ্টি-বন-পর্বত-প্রান্তর-ঘর-দ্বার-পরিজন-প্রতিবেশী পরিবেষ্টিত আমাকে সৃষ্টি করেন। অথচ কিছুই স্থির নয় কোনও অবস্থাতেই। শুধু অবিরাম পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। এই নিয়ত পরিবর্তনশীলতা কিন্তু মনেরই স্বভাব।

একটি বীজ—বীজ থেকে অঙ্কুরিত পল্লব। দেখা দিল একটি কুঁড়ি—রূপ নিল ফুলে। ফুলটিও কালে ঝরে পড়ল। যা ছিল অস্তি, হয়ে দাঁড়াল তা অনস্তি। এই খরা, এই ধারা বর্ষণ—নদী-নালা কূলে কূলে ছাপিয়ে উঠল! আবার শুকিয়ে খাঁ খাঁ করতে থাকল সব। আজ সমৃদ্ধ জনবহুল জনপদ,—এক বিপর্যয়ে তাকে করে দিয়ে যায় নিশ্চিহ্ন। নগর হয় অরণ্য। অরণ্য রূপান্তরিত হয় কোলাহলমুখর আবাসনে। কলকণ্ঠ শিশু পরিণত হয় বলিষ্ঠ যুবাতে, যুবাত্বের অবসান ঘটে বার্ধক্যে, বার্ধক্যও অস্তাচলে বিলীন হয়ে যায় একদিন। অদ্য যেখানে নহবত বাজছে, কাল সেখানেই শোকার্তের ক্রন্দন ধ্বনিত হবে। সদ্যোজাত শিশুর আগমনে একদা শঙ্খধ্বনি বেজেছিল—সবারই মনকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল! আবার সেদিনই শোনা গেল হরিধ্বনি শেষযাত্রার সেই একই গৃহে। এখানে 'স্থির' শব্দটিই যেন অবান্তর। কেবলই অনিবার প্রবহমান পরিবর্তনের স্রোত। চর অচর সর্বত্রই এই গতি—সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা—এমনকি তাদের মহাধারয়িত্রী আকাশও নিরন্তর ধাবমান। সমুদ্রের মতো আকাশেও কত শত তরঙ্গ উঠছে, ছুটছে,—অগণন সৌরজগৎ নেবুলা থেকে নির্গত হচ্ছে—নেবুলাও পরম গতিশীল মহাব্যোমে। এই আছে,—পরক্ষণেই নাই। প্রচণ্ড প্রহেলিকাময় এই জাগরণের জগৎ। তবে কি জাগ্রৎও এক বিস্ময়কর স্বপ্ন নয়? জাগরণও এক ছদ্মনামা স্বপ্নই বটে!

স্বপ্নের জগৎ মনেরই গড়া। জাগরণেও তাই। তবু কেন আমরা বুঝতে চাই না? স্বপ্নের দৃশ্যাবলী যে মনেরই সুকৌশলে রচিত, তা কিন্তু আমরা স্বপ্নাবস্থায় বুঝতে পারি না,—বুঝতে সক্ষম হই স্বপ্ন ভাঙ্গার পরে, যখন জেগে উঠি। ঠিক তেমনই জাগ্রতের স্তর থেকে সরে অন্যত্র কোথাও দাঁড়াতে পারলে, জাগরণের জগৎটাও যে মনেরই এক সৃজন-শিল্প তা বুঝা যেত ঠিকই। যেমন আমাদের ঋষিরা—যাঁরা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির পারে এক চতুর্থ ভূমিতে দণ্ডায়মান, তাঁরা কিন্তু সত্যই এ সব উপলব্ধি করেছেন এবং আমাদের জানিয়েও দিয়েছেন।

স্বপ্ন যেমন এক অতি সূক্ষ্ম মনঃশিল্প, জাগরণের ঘটনাপ্রবাহও তেমনই মানস-ক্রিয়া। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, এ-সব কোনও কালে আদৌ ঘটেনি কিংবা ছিল না। সবই ছিল, সবই ঘটেছে - তবে এদের কারও কোন স্থায়ী সত্তা নেই। ওরা এসেছে—ধরা দিয়েছে—খাঁটি সত্যরূপেই প্রকট হয়েছে কিন্তু আবার কোথায় হারিয়ে গেছে। জাগরণে ও স্বপ্নে উভয় অবস্থাতেই এই একই কাণ্ড,—তুল্য বৈশিষ্ট্য। যতোক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, ততোক্ষণই ঐ-সব দৃশ্যের বা ঘটনাবলীর প্রামাণ্য।

স্বপ্নের ঘুম ভেঙে উঠে, কোনও মতেই হদিস পাওয়া যায় না—স্বপ্ন কোথায় গেল। শুধু এইটুকুই বুঝি যে, মন থেকে সৃষ্টি হয়ে, মনেতেই লয় পেয়েছে। আবার জাগরণের সুখ-দুঃখময় এতো সব ঘটনাই বা প্রতিনিয়ত কোথায় হারিয়ে যায়, অদৃশ্য হয় ;—তারও নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আমরা বড়জোর কথায় প্রকাশ করি,—কালগর্ভে মিলিয়ে যায়, এখানকার সব কিছু। এই কালগর্ভ বস্তুটি তবে কি ? কালগর্ভ মনেরই এক দুর্বোধ্য পরিভাষা। অবশ্য এ 'মন', সচরাচর আমরা যাকে মন বলে থাকি, তা' ঠিক নয়,—তার চেয়েও অনেক বড়, অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন। এই অঘটন-ঘটন-নিপুণ মন—স্রষ্টা ও শিল্পী মন, আমাদের আটপৌরে মন অবশ্যই নয়। আমাদের নিত্য-সাথী মনের সঙ্গে এই বৃহৎ মনের সংযোগ অবিচ্ছেদ্য,—কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি মন অপেক্ষা সমষ্টি বৃহৎ মন অতিশয় মহান, অনেক গুণে বড়। স্বপ্নের স্রষ্টা এবং জাগরণের আশ্রয়—দুই-ই এক বস্তু—আমাদের বৃহৎ মন বা সমষ্টি মন। এখানে স্মরণীয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উক্তি : "মনেই জগৎ, আবার মনেতেই লয় হয়।"

বৃহৎ বা সমষ্টি মনই সর্বস্রষ্টা, সর্বব্যাপী—সীমাহীন এক অবিভাজ্য। ব্যষ্টি জাগরণের যে মন, আবার খণ্ড খণ্ড স্বপ্নকারী যে মন—অগণন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনের পশ্চাতে এই এক অখণ্ড সমষ্টি মন বিরাজিত। এই সমষ্টি বা বৃহৎ মনেরই একটি অভিব্যক্তি জাগরণ, অপর অনুকল্প স্বপ্ন। জাগরণ পরাভূত করতে চায় স্বপ্নকে, স্বপ্নও চায় জাগরণকে পর্যুদস্ত দেখতে। অথচ উভয়ই ধাবমান অনিত্য ও পরিবর্তনধর্মী। উভয়েরই স্রষ্টা বৃহৎ মন কিন্তু নিত্য, অপরিণামী, অবিকারী, অবিতথ,—অন্তহীন এই মনের উদয় নেই, অস্তও নেই। এই বৃহৎ মনই আমাদের স্বরূপের, চৈতন্যময় আত্মার নিকটতম আভাস, সন্নিকৃষ্ট প্রকাশ। শুভ্রশির শ্রুতি তাই এই বিরাট মনকে 'পরদেব' বা পরমদেব বলে ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নোপনিষদে চতুর্থ প্রশ্নে দ্বিতীয় মন্ত্রে আছে : মহর্ষি পিপ্পলাদ ব্রহ্মনিষ্ঠ সৌর্যায়ণি গার্গ্যকে উদ্দেশ করে, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—হে গার্গ্য অস্তগামী সূর্যের কিরণসমূহ যেমন ঐ সূর্যমণ্ডলেই একীভূত হয়ে থাকে, পুনশ্চ যখন সূর্য উদিত হতে থাকে, তখন আবার তারা দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়, ঠিক তেমনই এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ও পরমদেব মনেতে গিয়ে একীভাব প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই নিদ্রিত প্রাণী কিছু শোনে না, দেখে না, আঘ্রাণ করে না, আস্বাদন করে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না, গ্রহণ করে না, আনন্দ করে না, ত্যাগ করে না বা চলেও না। নিকটবর্তী লোকে শুধু বলে 'তিনি ঘুমাচ্ছেন'।

“তস্মৈ স হোবাচ—যথা গার্গ্য, মরীচয়ঃ অর্কস্যাস্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতস্মিন্ তেজঃ-মণ্ডলে একীভবন্তি, তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরন্তি, এবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে মনসি একীভবতি। তেন তর্হি এষঃ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিঘ্রতি, ন রসয়তে, ন স্পৃশ্যতে, নাভিবদতে নাদত্তে, নানন্দয়তে, ন বিসৃজতে, নেয়ায়তে। স্বপিতি ইতি আচক্ষতে ॥”

‘বৃহৎ মন’ বা উপনিষদোক্ত ‘পর-দেব’-ই আত্মার এক নামান্তর। সৎস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ আত্মাকে আমরা যখন স্রষ্টা বলে মানি তখন তিনি সমষ্টিভূত বৃহৎ মন। ইনিই জাগরণ ও স্বপ্ন সৃজন করেন,—আবার সুষুপ্তিতে এই দুই ছবিকেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেন। তরঙ্গমালা যেমন মহাসমুদ্রবক্ষে ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ভাঙ্গে—জাগরণ ও স্বপ্নের জগৎ-সৃষ্টিও তেমনই সচ্চিদানন্দ আত্মাতেই অভিব্যক্ত হয় এবং লয় পায়।

তরঙ্গলেশহীন সমুদ্রকে ভাবা কঠিন;—তবুও শান্ত নিস্তরঙ্গ অনন্ত জলরাশি আছে—আছে—আছে। ঠিক সেই রকমই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ সৃজন-বৈচিত্র্য ছাড়াও আত্মার অনন্ত অনভিব্যক্ত অনাখ্য একটি অখণ্ড স্বরূপ সুনিশ্চিতই আছে। সেই স্বরূপকে কিন্তু আর ‘বৃহৎ মন’ বলা হয় না,—ঋষিরা বলেন নি।

মাণ্ডুক্য-শ্রুতির ভাষায় তাঁকে বলা যায়ঃ “অদৃষ্টম্-অব্যবহার্যম্-অগ্রাহ্যম্-অলক্ষণম্-অচিন্ত্যম্-অব্যপদেশ্যম্-একাত্ম-আত্মপ্রত্যয়সারম্ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ ॥” (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, ৭) —অর্থাৎ তিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অগ্রাহ্য (ধরা ছোঁয়ার অতীত), অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, একাত্ম-প্রত্যয়সার—মাত্র ‘আত্মা’ এই বোধের গম্য, জগৎ-প্রপঞ্চের বিরাম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত। আত্মবিদ্‌গণ তাঁকেই আত্মার চতুর্থ পাদ বা তুরীয় বলে উপলব্ধি করেন। বিজ্ঞেয় এক তিনিই।

সচ্চিদানন্দ আর সচ্চিদানন্দময়ী। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতঃ “যিনি ব্রহ্ম তিনি কালী—মা আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই।” সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম শুদ্ধ আত্মা,—যিনি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং, তিনি যখন সৃষ্টি করেন, লয় করেন, ভাঙেন গড়েন—জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ দৃশ্যপটে নানারূপে ক্রীড়া করেন, তখন তাঁকেই বলি ‘বৃহৎ মন’—সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়া। ক্রীড়া বা লীলা কিছু সত্য নয়, কিন্তু লীলাময়ী সত্য। জাগরণ স্বপ্নাদি সবই মায়িক, ক্ষণিক, অনিত্য,—কিন্তু ঐ-সব দৃশ্যপট রচনাকারিণী—দৃশ্যপটবর্তী ঘটনাবলী নিয়ে

ক্রীড়াময়ী মহামায়া নিত্য, অবিতথ একরূপা। তিনিই অবতীর্ণা সারদামূর্তি-ধারিণী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃততে পড়েছি : "স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে, দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা। · যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।"

*　　　*　　　*

স্বপ্ন-জাগরণ ইত্যাদি নিয়ে এই যে কথঞ্চিৎ আলোচনা,—এতে কি জাগরণ-অবস্থাটিও যে নিতান্তই স্বপ্নবৎ একটি বিশেষ দৃশ্যান্তরমাত্র, সেটাই ধারণা হয় না? এ-সম্পর্কে স্বয়ং শ্রীশ্রীমা একদা সেবক অরূপানন্দকে যা বলেছিলেন তা' বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রীশ্রীমায়ের কথা : "স্বপ্ন বই কি! জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও—এই জাগ্রৎ অবস্থাও একটা স্বপ্ন।" অরূপানন্দ মায়ের এই উক্তিকে তখনই ঠিক ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে কিঞ্চিৎ লঘুচিত্ততা প্রকাশ করেছিলেন সেদিন। প্রত্যুত্তরে জানিয়েছিলেন—"না এতটা স্বপ্ন নয়। তা' হলে পলকে ভাঙ্গত। এ যে অনেক জন্ম ধরে রয়েছে।" চৈতন্যরূপা দেবী সারদা সন্তানের ভ্রম সংশোধন করে দিয়েছিলেন তক্ষুণি। সস্নেহে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বিজ্ঞাত করেছিলেন : "তা হোক। স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। এই যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছ, এখন তা নেই। চাষা স্বপ্ন দেখেছিল—রাজা হয়েছে, আট ছেলের বাপ হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙ্গে বলেছিল, 'সেই আট ছেলের জন্য কাঁদব, না এই এক ছেলের জন্য কাঁদব'?" ('শ্রীশ্রীমায়ের কথা' দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২ দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু হায়, ভ্রান্ত অভ্যাস বা সংস্কারবশে আমরা জাগরণাবস্থাকেই প্রামাণ্য বা অলঙ্ঘনীয় সত্য বলে মেনে আসছি। এ-সম্পর্কে কোনও সংশয়ই জাগে না। সেদিনের বালক রাসবিহারীর (উত্তরকালের অরূপানন্দ স্বামীর) মতো জাগ্রৎ-প্রীতি আমাদের সকলেরই। তাই জাগ্রতের উপরে অতি বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত আমরা সবাই। জাগরণের প্রত্যক্ষতা সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই তুলিনা কেউ। কিন্তু শ্রীভগবান অলক্ষ্যে হাসেন আমাদের দুরবস্থা দেখে। তিনি কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের জীবনধারার মধ্যে এমন দু'টি আশ্চর্য সংস্থান করে রেখেছেন, যা আমাদের জাগ্রদাসক্তিকে—বিচারহীন আস্থাকে, নিয়তই ব্যঙ্গ করে থাকে। সে সংস্থান হচ্ছে দু'টি সুন্দর অভিজ্ঞতার,—স্বপ্নের ও সুষুপ্তির। এই দুই অভিজ্ঞতাই আমাদের জানিয়ে দেয়—জাগরণের জগৎ, তার সুখ-দুঃখময় যাবৎ সম্ভোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা-পরিকল্পনা

সবই কোন্ শূন্যে মিলিয়ে যায়—ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়। স্বপ্নকালে জাগ্রতের জীবন কোথায় মুছে যায়! আবার সুষুপ্তিতেও আমাদের জাগরণ-কালের সমস্ত তেজ, শক্তি, দম্ভ, সম্পদ, অহঙ্কার ইত্যাদি কোথায় যেন বিলীন হয়ে যায়। প্রত্যহই তো এই দুই অভিজ্ঞতার আবেশে আমরা জাগ্রৎকে ভুলে যাই। এই দুই অনিবার্য আগন্তুক এসে আমাদের কাছে পরিহাস করে যেন বলে যায়ঃ ওহে শোন শোন বাছা! তোমার ঐ-সব ছাই-ভস্ম জাগ্রতের খেলনা-সামগ্রীর উপর এতো টান কিসের জন্য? কী দাম আছে ও-সবের? তার চেয়ে চল চল—স্বপ্নলোকের কুহেলিকায়, বিচিত্র চিত্রশালায়। এসো এসো—সুষুপ্তির শান্ত-শীতল নীড়ে,—বিশ্রামের পরিপূর্ণ আরামে,—এক অভূতপূর্ব সর্বশূন্যতার সুখালয়ে।

জাগ্রৎকালে স্বপ্ন-জগৎকে অলীক বোধ হয় ঠিকই,—কিন্তু স্বপ্নকালেও তো জাগরণের জগৎ-সংসার সবই অস্তিত্বহীন। সুষুপ্তিতে তো সবই একাকার এক বৃহৎ 'না'-এ পর্যবসিত। কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি আমাদের আসক্তি কতোখানি অন্যায্য তা' এখন সুস্পষ্ট। তাই এক অর্থে যেমন সবই মিথ্যা—জাগরণ, স্বপ্ন সবই সমান। আবার অন্য দিক থেকে বলা চলে, জাগরণও যতোখানি সত্য, মিথ্যাও তথৈবচ।

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণকে লক্ষ করে শ্রীভগবান একদিন বলেছিলেনঃ

"বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়,-স্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিস্বরূপ—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষিস্বরূপ।... স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য।...

"...চাষা জ্ঞানী, তাই দেখেছিল স্বপ্ন অবস্থাও মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি মিথ্যা; এক নিত্যবস্তু সেই আত্মা।

"আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।" (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১৩।৬)

মোট কথা আত্মা যেন এক স্বাধীন অবাধ সঞ্চরণশীল মহামৎস্য। নিজে একান্তই অলিপ্ত থেকে জগৎ নদীর একবার একূল জাগ্রৎ, আর একবার অন্যকূল স্বপ্ন—এই ক্রম অনুসরণে উভয় কূলকেই তুল্যরূপে দেখেন। তাঁতে কোনও পক্ষপাত নেই—কাউকেই তুচ্ছ বোধ করেন না। তিনি দুই-ই তুল্য সত্য বুঝে, সুখ ও দুঃখের সহ ভোগ করে থাকেন। এই আত্মাই আবার জগৎ-নদী থেকে বিনিষ্ক্রান্ত হয়ে

অকূল সমান-সমুদ্র সুষুপ্তিতে অবগাহন করেন। তখন তাঁর কাছে জগৎ-নদীর উভয় কূলে সঞ্চারণাই তুল্য স্বপ্নাভিনয় স্বরূপ বোধ হবে,—আত্মা তখনই জগন্মুক্ত—জীবন্মুক্ত।

সব অবস্থা যদি সমান,—শ্রীভগবান স্বয়ং যখন তিন অবস্থাই লন,—তখন আর সন্দেহের লেশমাত্র থাকা উচিত নয় আমাদের,—তিনি যেমন জাগ্রতে স্থূল দেহধারী কিংবা দেহধারিণী হয়ে জীবকে দর্শন দিতে পারেন, ঠিক তেমনই পারেন স্বেচ্ছায় বা লীলায় স্বপ্নেও প্রকট হতে। জাগরণ বা স্বপ্ন তো তাঁর আবির্ভাবের জন্য এক এক মাধ্যম বা পরিপ্রেক্ষিক পটভূমি মাত্র। যিনি জাগ্রতের পরিপ্রেক্ষিতে লীলাময়ী, তিনিই স্বপ্নের মাধ্যমে নিজেকে দর্শনগম্যা করবেন, তাতে আর বিচিত্র কি? নিত্যলীলাময়ী সারদার ভক্ত-সকাশে বিদেহ-আবির্ভাব বা স্বপ্নাদিতে দর্শনদান তাই বাস্তব অপেক্ষাও সত্য,—আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়। উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ে তাই কোনওরূপ ভ্রান্তির অবকাশ নেই—অলীকত্বেরও লেশমাত্র অনুপস্থিত।

জাগরণাবস্থার প্রতি একটা অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্বই স্বপ্ন তথা স্বপ্নে অনুভূত সমস্ত কিছুকেই লঘুদৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সেটা মোটেই কাম্য নয়, বিচারনিষ্ঠ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসুর পক্ষে। লণ্ডনে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বিশ্বাচার্য স্বামিজীকেও আমরা বলতে শুনেছি :

"...মানুষ যে উপায়ই অবলম্বন করুক না কেন, ইহা সুনিশ্চিত যে, সে তাহার ইন্দ্রিয়সমূহের সীমা অতিক্রম করিতে চায়। ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর মধ্যেই সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় অবস্থায় যাইতে চায়।

"এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাও রহস্যপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় যে, ধর্মের প্রথম আভাস স্বপ্নের ভিতর দিয়াই আসে। অমরত্বের প্রথম ধারণা মানুষ স্বপ্নের ভিতর দিয়া অনায়াসে পাইতে পারে। এই স্বপ্ন কি একটা অত্যাশ্চর্য অবস্থা নয়?...এই স্বপ্নাবস্থার ধারণা অবলম্বনেই মানব-মন ক্রমশঃ উচ্চতর তত্ত্বে উপনীত হয়।"

(—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০-২১)

* * *

নিত্যলীলাময়ী সর্বাভীষ্টদাত্রী মা স্থূল শরীরে বিরাজিতা থেকেও দূরবর্তী ভক্তকে দর্শনদানের জন্য ভক্তের নিকট অদৃশ্যমান সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করেছেন—এমন বহুতর

ঘটনাও আজ আর অজানা নেই। সেটা দর্শনার্থীর স্বপ্নেও সংঘটিত হয়েছে, আবার ধ্যানেও প্রকট হয়েছে। ধ্যানে এ-রকম দর্শনলাভ অবশ্যই অতিশয় সুদুর্লভ এবং তার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নও অবান্তর। শ্রীমৎ বিরজানন্দ মহারাজ বলতেন—"ধ্যানে সাক্ষাৎ দর্শন বা উপলব্ধি হয়। যার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না, আর যা লাভ করলে মানুষের জীবন বদলে যায়—মানুষ দেবতা হয়। সে যার তার হয় না, বহু সাধন ও তাঁর কৃপাসাপেক্ষ।" তবে স্বপ্নে দর্শনও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকলে স্বপ্নের দর্শন থেকেও সিদ্ধিলাভ হতে পারে,—এমন কথাও বিরজানন্দজীর মুখে আমরা শুনেছি।

এখানে আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র দু'টি ঘটনার উল্লেখ করব,—যেখানে মা মর্ত-দেহবাসিনী, কিন্তু অশরীরিণী হয়ে দর্শনদানে কৃতার্থ করছেন ধ্যানে বা স্বপ্নে।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—পূজ্যপাদ শশী মহারাজ কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে কঠিন পীড়ায় শয্যাগত। জীবনের ক্ষীণ আশার আলোকটুকুও নির্বাপিত। সহসা বালকের মতো অস্থির হয়ে পড়েন তিনি, শ্রীশ্রীমাতৃ-চরণ দর্শনের জন্য। মা তখন জয়রামবাটীতে। কিন্তু সন্তানের জন্য তিনিও ব্যাকুলা;—কলকাতায় চলে এসে দর্শন-কাতর শশীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তিনি কৃতসঙ্কল্প। এদিকে প্রখ্যাত চিকিৎসক কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ একদিন শশী মহারাজকে পরীক্ষান্তে প্রশ্ন করে বসেন—"মহারাজ, আপনি কি স্বপ্ন দেখেন? স্বপ্নে শ্মশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন কি?" শশী মহারাজ কবিরাজ মশায়কে জানালেন—"ও সব দেখিনা, দেখি দক্ষিণেশ্বর—ঠাকুর, মা, স্বামিজীকে দেখি।" যা'হোক, রোগের গতি ক্রমেই অবনতির দিকে দ্রুত চলেছে দেখে, স্বামী ধীরানন্দ ত্বরায় ছুটে গিয়েছিলেন জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে অবিলম্বেই নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু? কিন্তু মা এলেন না! তথাপি আরও বিস্ময়কর কিছু রয়ে গেছে ঘটনায়। মা এসেছিলেন, এক অলৌকিক পন্থায়,- সন্তানের অভীষ্টও পূর্ণ করেছিলেন তাঁকে দিব্য-দর্শনদান দ্বারা।

শরীর ত্যাগের মাত্র দিনকয়েক পূর্বে, রাত্রি ভোর হতেই সহসা কণ্ঠে উত্তেজনাসহ তিনি সেবককে বলে ওঠেন—"ওরে ওরে,—আসন পেতে দে।" সেবক আদেশ পালন করেন,—কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না, অকস্মাৎ কেন এমন আদেশ। কার জন্য আসন? শশী মহারাজ পলকহীন নেত্রে কোন্ এক অদৃশ্য লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ। দুই নেত্রে তখন অশ্রুধারা।

পরের দিন মহাকবি গিরিশ এলে, তাঁর কাছে তিনি ঐ সূক্ষ্ম দর্শনানুভূতিকে ব্যক্ত করেন এবং তাঁবলম্বনে একটি গীত রচনা করে শোনাতে অনুরোধ জানান। কিন্তু গীতের প্রথম পংক্তিটি পুনঃ পুনঃ শশী মহারাজ নিজেই আবৃত্তি করতে থাকেন। "পোহাল দুঃখরজনী"—ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু দৃপ্ত তেজ সহ বার বার বলছিলেন এই একটি পংক্তি। ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র প্রিয় গুরুভ্রাতার মনের সাধ মিটিয়েছিলেন—তাঁর কাছে শ্রুত সেই দিব্য আবির্ভাবের ভাবচিত্র যেমনটি স্বয়ং উপলব্ধিতে এনেছিলেন, ঠিক তেমনটিই সঙ্গীতের ভাষায় তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত করেন। সুগায়ক পুলিনবাবুকে দিয়ে নবরচিত সেই গানে স্বরারোপও করিয়েছিলেন গিরিশবাবু। রামকৃষ্ণানন্দজী মুদ্রিতনেত্রে আবেগোজ্জ্বল মূর্তিতে শয্যায় শায়িত অবস্থাতেই, বেহাগরাগিণীতে পুলিনবাবুর কণ্ঠে বার বার সেই গীত শুনেছিলেন। অলৌকিক মাতৃ-সাক্ষাৎকারের ব্যঞ্জনা সমন্বিত সেই দিব্য সঙ্গীতটি এই :

"পোহাল দুঃখরজনী ;
গেছে 'আমি' 'আমি' ঘোর কুস্বপন ;
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ ;
হের জ্ঞান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসে জননী॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয় ;
তোল উচ্চতান, গাও জয় জয় ;
বাজাও দুন্দুভি, শমনবিজয় ; মার নামে পূর্ণ অবনী॥
কহিছে জননী, 'কেঁদো না, রামকৃষ্ণপদ ভেব না।
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা' ;
(হের) মম পাশে করুণার দু'টি আঁখি ভাসে।
ভুবন-তারণ গুণমণি॥"

একটি অনবদ্য বিশুদ্ধ উদাহরণ—শ্রীশ্রীমায়ের লোকাতীত সূক্ষ্ম জগতে গমনাগমন কাহিনী—যা মাত্র জাগরণাবস্থাতেই নয়, স্বপ্নাবস্থাতেও সমান উপলব্ধ্য—সমান সত্য—সমান উদ্দীপক—বাস্তব অপেক্ষাও প্রত্যক্ষ।

অন্য দৃষ্টান্তটি পূজ্যপাদ কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা মাষ্টার মশায়ের দিনলিপি থেকে সংগৃহীত। লেখকের সৌভাগ্য হয়েছিল, ঐ দুর্লভ মহামূল্য দলিল যা [illegible] চোখ বুলোবার। দিনলিপির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিচিত্র সব রোমাঞ্চকর ঘটনার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায়, যা দৃষ্টিকে স্বতঃই আকর্ষণ করে। যেমন, দিনলিপির একটি পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে :

"28th Sept. (dream রাত্রি)
"শ্রীশ্রীমা—দর্শন স্পষ্ট এ-বাবার মুখের আদল
বাম পাশ (কিন্তু গৌরবর্ণ)—(to me)
যে যা চায় তাই দান—কেহ কেহ ঔষধ চায়—
তাহার বন্দোবস্ত।"

সঙ্কেত-লিপিকারের রীতি অনুসরণে মাষ্টার মশায় ঐ রূপই অন্যের অবোধ্য পদ্ধতিতে দিনলিপি রক্ষা করতেন। তাই উদ্ধৃত অংশটি আমাদের কাছে খুবই অস্পষ্ট,—যেন হেঁয়ালির ভাষায় লেখা। তথাপি এ-কথাটি অতিশয় প্রাঞ্জল যে, শ্রীম-এক স্বপ্নে তাঁর মাতৃ-দর্শনের ঘটনাটিকেই নথিনিবদ্ধ করে রেখেছেন ঐ দিনের রোজনামচায়। রোজনামচায় তারিখের উল্লেখ থাকলেও কত খ্রীষ্টাব্দ তা লেখা নেই। তবে ঐ পৃষ্ঠার কিছু উপরের দিকে, অন্য ঘটনার বিবৃতি থেকে কিছুটা অনুমান করে নওয়া হয়তো চলে—সেখানেও একটি স্বপ্ন ('Dream')-কথাই নিবদ্ধ আছে, যার মাথায় লিখেছেন 29th Sept. 1898. Thursday শেষরাত্রি ভোর। ঐদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পেয়েছিলেন স্বপ্নে। অর্থাৎ মাকে দর্শন করেছিলেন ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮-র রাত্রে কোন সময়ে,—এটাই অনুমান।

শ্রীম—মাষ্টার মশায়ের অনুভূতিসম্পন্ন আশ্চর্য জীবনের বিচিত্র স্তরে স্বপ্নের প্রভাব ও প্রক্রিয়া কতোখানি ভাস্বর ছিল, তা উপলব্ধির সহায়ক হবে যদি এখানে এতাবৎ অপ্রকাশিত একটি তথ্যকে দিবালোকে এনে ধরা যায়, অতিশয় দুরন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে। আমরা কোনও প্রকার মন্তব্য ছাড়াই কেবলমাত্র মাষ্টার মশায়ের দিনলিপির আরও একটি অংশ এখানে উৎকলিত করতে প্রয়াসী হচ্ছি,—যাতে সুস্পষ্ট দেখা যাবে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনের বেশ কয়েকদিন পূর্বেই তিনি নিজের বাড়িতেই এক সন্ধ্যায় তাঁর সূক্ষ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন। অবশ্য সেই বিশেষ দিব্য দর্শন স্বপ্নযোগে বা জাগ্রতে, তা' কিছুই নিজে ব্যক্ত করেন নি তিনি,—তবে উক্ত দিনলিপিতে লিখিত অন্যান্য দর্শন-বিবৃতি থেকে অনুমান করে নওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, সে-সন্ধ্যার দর্শনটিও অনুরূপ স্বপ্ন-মাধ্যমেই হয়ে থাকবে।

কথামৃতকার শ্রীম তাঁর অনুপম লেখনীতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনের যে চিত্রখানি কথামৃত, প্রথম ভাগে এঁকেছেন, তার প্রারম্ভিক বর্ণনা নিম্নরূপ :

'"প্রথম দর্শন—১৮৮২ ফেব্রুয়ারী মাস।

'"গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ি। মা-কালীর মন্দির। বসন্তকাল, ইংরেজী

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ্ কুক্ সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ঠাকুর ষ্টীমারে বেড়াইয়াছিলেন—তাহারই কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন।..."

(—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১।২)

উদ্ধৃত বিবৃতিতে এ-কথা স্পষ্টই ব্যক্ত যে, ১৮৮২-র ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবে মাষ্টার মশায়—শ্রীম-অনুপস্থিত ছিলেন এবং তখনও পর্যন্ত তিনি স্থূলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে চাক্ষুষ দর্শনই করেন নি।

কথামৃতের উক্ত পরিচ্ছেদে কিছু পরে, শ্রীম-তাঁর প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন প্রসঙ্গে পুনরায় লিখেছেন :

"মাষ্টার সিধুর সঙ্গে বরাহনগর এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই ফাল্গুন—অবসর আছে, তাই বেড়াইতে এসেছেন, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাঁড়ুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, 'গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে, সে-বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন'।"

জাগ্রতের দেখা বা স্থূল চর্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সঠিক বিবৃতি এই-ই। কিন্তু কথাটি সত্য হলেও, আরও কিছু অমুক্ত জ্ঞাতব্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি শ্রীম'র দিনলিপি থেকে, যা এখনও অবধি দিবালোকে অস্পষ্ট। উক্ত দিনলিপির একস্থানে তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাঙ্কেতিক ভঙ্গিতে নিবদ্ধিত করেছেন :

"Did I see the Lord on the evening of this day ?"

ফা— ও— ২য়া
৮ই ফা—19th Feb. 82, Sunday
Birthday festival of the Lord.
Cele by Ram, Suresh (I absent)
23rd Feb. Thursd. On steamer with Cook & Keshabj
26th Feb. Sunday
was it on this day that I first
saw the Lord"

'Did I see the Lord on the evening of this day ?'

আমি কি ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীভগবানকে দর্শন করেছিলাম ?

১৯ ফেব্রুআরি, ১৮৮২ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের তারিখটিই 'on this day' বা এইদিন। রোজনামচায় শ্রীম'র স্বগত জিজ্ঞাসা : 'আমি কি এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীভগবানকে দর্শন করেছিলাম ?' কেননা. এ-দিন তো 'I absent'—আমি অনুপস্থিত! উল্লেখ বাহুল্য 'Lord' বা শ্রীভগবান কথায় উদ্দিষ্ট হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই দর্শনলাভ কি তবে স্বপ্নেই সংঘটিত নয় ? যদি তা না হয়ে, জাগ্রতাবস্থায় প্রত্যক্ষই হয়েছিল, তবে কেন তিনি প্রকাশ্যে প্রথম দর্শনের তারিখ নির্দিষ্ট করলেন জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরের ২৬ ফেব্রুআরি, রবিবার ? আরও লক্ষণীয় যে, স্থূল চক্ষে সেই দর্শনকে 'প্রথম দর্শন' বলে নিজেই প্রকাশ করেছেন,—করেও কিন্তু নিজ অন্তরের অন্তিকে, অতি সংগোপনে লালন করেছেন একটি সন্দিৎসু বিপ্রশ্নিকা : ঠিক সেই দিনটিতেই (২৬ ফেব্রুআরি) কি আমি শ্রীভগবানকে প্রথম দর্শন করেছিলাম 'was it on this day that I first saw the Lord ?'

স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শন কোন্‌টি ? পূজ্যপাদ মাষ্টার মশায়ের বুভুৎসা কি এটাই ছিল না ? এই ব্যাকুল ঔৎসুক্যই কি অনুরণিত হয়নি তাঁর উক্ত দিনলিপির পৃষ্ঠায় ?

জ্ঞানীর কাছে তাই জাগ্রতের প্রত্যক্ষ, আর স্বপ্নের দর্শনানুভূতি প্রায় সমতুল —দুই-ই তো বৃহৎ মনের রচনা, মায়ারই কার্য। বিশেষতঃ জাগরণাবস্থায় দেব-দর্শন এবং স্বপ্নে দেব-দর্শনের প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া প্রায় অনুরূপই দেখা যায়। যদি ভুলে যাবার কথাটিই ধরা হয়, তা'হলেও বলা চলে—স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মনে থাকে না অনেক সময়, আবার তেমনই জাগ্রতেরও সব ঘটনাই কিছু চিরদিনই মনে রাখা যায় না সকল ক্ষেত্রে। অতএব আমাদের এমন পক্ষপাত থাকাই উচিত নয় যে, সব সময়েই সব স্বপ্নই অলীক, আর জাগ্রতের যা কিছু প্রত্যক্ষ সবই সত্য।

বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ দেব-মানবদের জীবন-কাহিনীতে স্বপ্নের ভূমিকা মোটেই বিরল নয়,—বরং বিশেষভাবে স্বীকৃত উজ্জ্বল তথ্য। তাঁদের জীবনবৃত্তে স্বপ্নের অবদানও কিছু লঘু নয় কদাপি। এ-সব চিন্তা থেকেও আমরা স্বপ্নের দর্শনকে কখনোই অবিশ্বাস্য বলে সরিয়ে রাখতে পারি না। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন যেন দুই পৃথক ধরণের পর্দা—যার উপরে প্রতিফলন ঘটে মিথ্যা অসার

অবস্তর, আবার তেমনি সত্য, সার ও বস্তর। চলচ্চিত্রের পর্দায় যেমন ছায়াছবিকে দেখা যায়, তেমনি দৃশ্যমান হয় কোনও সত্য ঘটনার বা উদ্দীপনাকর প্রেরণাদায়ী চিত্রেরও। চলমান ছায়াছবির মূল্য ততোক্ষণই, পর্দার উপরে যতোক্ষণ ভাসে,—কিন্তু পর্দায় দেখা সত্য-সংবাদের বা আভাসমান উদ্দীপক বস্তুটির প্রভাব মনে দাগ কেটে যায় অনেককালের জন্য, তাই মূল্যহীন নয় কখনোই। পর্দা হচ্ছে মাধ্যম,—জাগ্রৎ ও স্বপ্নও তেমনই পৃথক উপাদানে গড়া দুই ভিন্ন মাধ্যম। স্বয়ং মায়াধীশ কিংবা ইচ্ছাময়ী মহামায়া কেন পারবেন না এই দুই মাধ্যমকেই ব্যবহাব করতে—তাঁর অনুগৃহীত জনকে কিছু জানাবার জন্য, বা দিব্য বোধ প্রদানের উদ্দেশ্যে?

জাগরণাবস্থার জগতে বহুতর অর্থহীন, অসার অনিত্য দৃশ্যের মাঝে যদি ক্বচিৎ কোনও পুণ্যবলে কেউ কোনও দিব্য দর্শন পেতে পারেন,—তা'হলে অনুরূপ-ভাবে কেনই বা তাঁর পক্ষে স্বপ্নকালেও সম্ভবপর হবে না, অজস্র মিথ্যা স্বাপ্ন দৃশ্যসারির মধ্যে অকস্মাৎ দেবদেবীর অলৌকিক সাক্ষাৎকার লাভ? জাগরণাবস্থার প্রভূত মিথ্যা জঞ্জালকে বিস্মৃত হয়ে, যেমন সুকৃত সৎ ও শুভ ঘটনা কিংবা পুণ্য সন্নিধিকেই মাত্র স্মৃতির মণিকোঠায় অতি যত্নে লালন করি আমরা,—তেমনি কেনই বা আমাদের স্বপ্নের সুখদুঃখময় অসম্ভবিত অঘটনীয় অতিতর অতথ্যকে উপেক্ষা করে দৈবাৎ দৃষ্ট প্রেরণাদায়ী কোনও দেব-স্বপ্নকে স্মৃতিতে জাগরূক রাখব না?

* * *

নিত্যলীলাপরা সারদার অবাধ গতিবিধি জাগ্রৎ-পথেও যেমন, স্বপ্ন-মার্গেও তেমনই। চিদ্রূপিণী তিনি, তাই স্থূলাপেক্ষা অনুভবগম্যাই সমধিক। কি জাগরণ, কি স্বপন,—অনুভব সমানই। ভক্তের আর্তিই তাঁকে সদা চঞ্চলা রাখে,—ভক্তাভীষ্টপ্রদাত্রী নিয়ত কৃপাম্বুমুখী। শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম আশ্রিত সেবক মহাদেবানন্দ তখন ব্যাঙ্গালোরে কর্মনিরত। মায়ের শেষ অসুখের কালে তিনি অনুপস্থিত,—মায়ের সেবা থেকে বঞ্চিত থাকায় অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলেন। মনের কষ্টে তিনি আহার-নিদ্রাহীন অবস্থায় দিনপাত করছেন। বহু চেষ্টা ও আবেদন নিবেদন সবই ব্যর্থ হয়েছিল,—কর্মের ছুটি মেলেনি। তথাপি মনের ব্যথা মনেই রুদ্ধ রেখেছিলেন। কাউকেই প্রকাশ করে জানান নি এ-কথা,—এমন-কি মাকেও ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতে দেন নি। এদিকে মা মহাসমাধিতে প্রবেশোন্মুখ তখন। কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে তিনি মূলতঃ শেষ শয্যায় শায়িতা,—

লীলাসম্বরণের আর বিলম্ব নেই। শ্রীঅঙ্গে প্রবল জ্বর চলছে,—সেবক-সেবিকাগণ সকলেই দিশাহারা। সহসা নিকটবর্তী সকলেই শুনলেন—মা বেশ আকুল কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন: "ব্যাঙ্গালোরে যাব। ব্যাঙ্গালোরে যাব।"—ব্যাঙ্গালোরের সেই দর্শন-কাতর সন্তান-বক্ষের নিরুদ্ধ বেদনাই বুঝি মাকে তৎকালে অস্থির করে তুলেছিল। জানা গিয়েছিল, সুদূর দক্ষিণ ভারতে অবস্থানকারী সেই সন্তানকে তিনি শান্ত করেছিলেন ঐ কালে।—কৃতপুণ্য মহাদেবানন্দ কি শ্রীশ্রীমাকে জাগ্রতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অথবা স্বপ্নে অনুভব করেছিলেন? তিনি স্থূলভাবে মাতৃ-সকাশে উপস্থিত না হয়েও, সূক্ষ্ম অলৌকিক ভাবে এই যে মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন, এর মূল্যায়ন করা যাবে কোন্ যুক্তি সহায়ে? সকল যুক্তি স্তব্ধ এখানে।

অপর একটি স্বপ্নদর্শনের বৃত্তান্ত শুনেছিলাম, আজীবন অদ্বৈতনিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী অভয়ানন্দ—ভরত মহারাজের মুখে। সে- বৃত্তান্তটিও আমাদের উপরোক্ত আলোচনার একটি অনুপ্রেরক। পূজনীয় ভরত মহারাজ জীবনের অন্তিম পর্বে উপনীত তখন। স্বপ্রচারবিমুখ স্বভাবগম্ভীর এই বর্ষীয়ান্ সাধুর কণ্ঠে একটি বিশেষ দিনে কেবল মাতৃপ্রসঙ্গই অনুরণিত ছিল। একাকী তন্ময় হয়ে শুনছিলাম,—তিনি ধীরে ধীরে বলে যাচ্ছিলেন:

"মাকে আমি শেষ দর্শন করি উদ্বোধনে। তখন তিনি ভয়ানক অসুস্থ। আমি মায়াবতী যাব—সেখান থেকে যাত্রা করব মানস সরোবরের উদ্দেশ্যে। মার আশীর্বাদ চাইতেই গিয়েছিলাম উদ্বোধনে। মার কাছে প্রণাম করেই, সব নিবেদন করলাম। মা শুনে আমাকে বলেছিলেন: 'বাবা, আমি শুনেছি, মানস বড় দুর্গম তীর্থ। খুব সাবধানে যেও। যা-ই করবে, সব ঠাকুরকে ধরে। সর্বদা ঠাকুরকে ধরে থেকো।'

"মানস যাত্রা করেছি।…পথে আমার একটি আশ্চর্য দর্শন হয়েছিল—স্বপ্নদর্শন। আমার জীবনে ঐ ধরণের কোনও দর্শনাদির অভিজ্ঞতা ছিল না আগে। মানস সরোবরের যাত্রাপথে আলমোড়া জিলার মধ্যে একটা জায়গায় গিয়ে কারও কাছে অতিথি হতে হয়েছিল দু'একদিনের জন্ত। ছোট্ট একটা বাড়িতে ছিলাম আমরা। বোধ হয় সেখানে দ্বিতীয় রাত্রিতেই আমি একটি স্বপ্ন দেখে চমকে উঠে মাঝরাত্তেই জেগে উঠেছিলাম। ঘুম ভাঙতেই ঘড়ি দেখেছিলাম—রাত তখন প্রায় দু'টো। শ্রীশ্রীমাকেই দর্শন করেছিলাম ঐ রাত্রে। স্বপ্নে—কিন্তু এতো স্পষ্ট যে, আজও তা মনে উজ্জ্বল।

"দেখেছিলাম, শ্রীশ্রীমাকে অপূর্ব সাজে সাজানো। মায়ের চরণপদ্ম আলতা-রঞ্জিত। ধব্‌ধবে পরিষ্কার শাড়ী ছিল মায়ের অঙ্গে—গলায় ফুলের মালা। অপূর্ব সে-রূপ,—বড় জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। যেখানটিতে মা ছিলেন—সেই জায়গাটিও স্পষ্ট দেখেছিলাম এবং দেখেই চিনেছিলাম। বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে যে জায়গাটার উপরে এখন মায়ের মন্দির গড়া হয়েছে,—জায়গাটা ঠিক সেটাই দেখেছিলাম। মাকে ঘিরে তখন অনেক লোক—আমার চেনা অনেক মুখ বেশ স্পষ্টই ছিল।

"যা'হোক, এই স্বপ্নদর্শনের স্মৃতি মনেই রয়ে গেল। মানস সরোবরের পথে চলা শুরু হয় আবার। মানস দর্শনও তো হ'ল। অতঃপর দিন কয়েক বাদে ফেরার পথে আমরা তাকলাকোটে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেখানে ভারত সরকারের একজন মস্ত অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়। অফিসার ভদ্রলোক ছিলেন পাঞ্জাবের লোক। একদিন তিনি আমাকে দেখেই নমস্কার করে, তাঁর তাঁবুতে নিয়ে যাবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। হাতজোড় করে বলেছিলেন—'মহারাজ, আপনাদের জন্যই আমি এখানে অপেক্ষা করছিলাম।' যা'হোক, শেষ পর্যন্ত তাঁর তাঁবুতে যেতেই হয়েছিল আমাদের। ওখানে বেশ কয়েকদিনের পুরানো খবরের কাগজ দেখে হাত বাড়িয়ে দেখতে যাচ্ছি,—কিন্তু ভদ্রলোক কাগজ-গুলি টেনে নিলেন, পড়তে দিলেন না। প্রথমে চা-জলখাবার ইত্যাদি দিয়ে খুব আপ্যায়ন করলেন আমাদের। পরে বেশ করুণ স্বরে তিনি জানালেন, 'আপনাদের জন্য এক দারুণ দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে।' এই কথা বলেই পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত একখানা খবরের কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। খবরের পৃষ্ঠায় প্রথমেই চোখ পড়ল—শ্রীশ্রীমা দেহত্যাগ করেছেন। মোটামুটি বিশদ আকারেই খবরটি ছাপা হয়েছিল।

"আলমোড়ার গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে সেই রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম,—পরের দিন সেটি আমি সঙ্গী সতীশকে (স্বামী সত্যানন্দকে) আনুপূর্বিক প্রকাশ করে বলেছিলাম। সতীশও তার ডাইরিতে তা লিখে রেখেছিল—আমি বলেছিলাম তাকে লিখে রাখতে। তখন তো আমরা মায়ের মহাসমাধির কোনও খবরই পাইনি,—খবরের কাগজও তো চোখে পড়েনি কোথাও। কিন্তু মিলিয়ে দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছিলাম,—ঠিক আমার স্বপ্নের দিনেই শ্রীশ্রীমা দেহত্যাগ করেছেন—সময়ও মোটামুটি ঐ রকমই ছিল।

"শ্রীশ্রীমাকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলাম,—কিন্তু সে দর্শন অতি স্পষ্ট। খুব স্পষ্টই দেখেছিলাম—মায়ের মুখ, মায়ের দু'টি চোখ এবং তাঁকে ঘিরে কতো লোক!

মনে আছে, অপূর্ব সুষমায় ভরা সেই মুখমণ্ডল। আমার স্বপ্নে দেখা মায়ের সেই অপূর্ব স্নিগ্ধ মুখচ্ছবি।"

(তুলনীয় : 'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে প্রকাশিত স্বামী অভয়ানন্দের মাতৃস্মৃতি, পৃঃ ১২৬—১২৭)

অখিল বিশ্বগুরু শ্রীসারদা তাঁর স্ব-ইচ্ছাতে আশ্রিত জনের যে-কোনও অবস্থাতেই —জাগ্রতের বা স্বপ্নের যে-কোনও মাধ্যমেই নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারেন এবং করেও থাকেন সে-সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তাঁর স্থূল দেহধারণও যে-মায়া সহায়ে, সূক্ষ্ম রূপে প্রকট হওয়াও সেই একই মায়ার সাহায্যে।

মায়াতনু ত্যাগকালেও তাঁর লীলার বিরাম ছিল না, সে-লীলা স্থূল জাগরণাবস্থাতেই মাত্র সংঘটিত হয়নি, হয়েছে সূক্ষ্মে অতিজাগরণাবস্থাতে—স্বপ্নে বা ধ্যানেও। স্বামী নির্বাণানন্দ—সূর্য মহারাজ-কথিত শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি থেকে আমরা জেনেছি :

"মায়ের শেষ অসুখের সময় মহারাজ (শ্রীমৎ রাখাল মহারাজ—স্বামী ব্রহ্মানন্দজী) ছিলেন ভুবনেশ্বরে। আমিও ছিলাম সেখানে তাঁর সেবায়। মায়ের মহাসমাধির দিন (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ জুলাই, মঙ্গলবার) রাত দেড়টা নাগাদ আমি মহারাজের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি একটি আলোয়ানে সারা শরীর ঢেকে ইজি চেয়ারে বসে আছেন। মুখ খুব গম্ভীর। আমাকে দেখে মহারাজ বললেন : 'সুজ্জু, রাত এখন কত? কেন জানি না, মা-ঠাকরুনের জন্যে মনটা কেমন করছে। তিনি কেমন আছেন কে জানে।' আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : 'শোবেন না?' মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না। মহারাজের মুখের ঐ গম্ভীর ভাব দেখে এবং মায়ের জন্য তাঁর মন-খারাপের কথা জেনে, তাঁর মন একটু হালকা করার জন্য বললাম : 'তামাক সেজে নিয়ে আসব মহারাজ?' মহারাজ কোনও উত্তর না দিয়ে একইভাবে বসে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। আস্তে আস্তে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরদিন সকালে মহারাজকে একটু অস্থির বলে মনে হল। অন্যান্য দিন সকালে একটু বেড়াতে বেরোতেন। সেদিন গেলেন না। সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। সেদিনই পোস্টাপিস থেকে পিওন একটি টেলিগ্রাম নিয়ে এল। শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দের) টেলিগ্রাম : আগের রাত্রে দেড়টার সময়ে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমা দেহরক্ষা করেছেন। আমার মনে পড়ল : গতরাত্রে প্রায় ঐ সময়েই মহারাজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিলেন আর বলেছিলেন, মায়ের জন্য মন কেমন করছে। খবরটি পেয়ে মহারাজের মুখ এক অব্যক্ত বেদনায় থমথম্ করতে

লাগল। তিনি শুয়ে পড়লেন। খানিক পরে আবার উঠে বসলেন। ..তিনদিন কারও সঙ্গে কথা বলেননি।...একদিন বললেনঃ 'এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম'।"

(—'শতরূপে সারদা', পৃষ্ঠা ৭১৮—৭১৯)

উল্লিখিত দু'টি উদাহরণই বেশ অভিনিবেশযোগ্য আমাদের আলোচ্যমান মননাংশে। একজন অতিশয় যুক্তিপ্রবণ অদ্বৈতভাবের তরুণ,—কিন্তু একটি মাত্র স্বপ্নদর্শনে চিরদিনের জন্য অভিভূত থেকেছেন,—শ্রীশ্রীমায়ের প্রত্যক্ষ-সন্নিধিকে বুক-ভরে অনুভব করেছেন জীবনের প্রতি পর্যায়ে—জাগরণে নিদ্রায়! নিজ মুখেই কতোবার ব্যক্ত করেছেন—"মানসের পথে আমার আশ্চর্য দর্শন হয়। স্বপ্ন দর্শন।" স্পষ্টতঃ জানিয়েছেন—"আমার সাধারণতঃ দর্শনজাতীয় অভিজ্ঞতা হয়না।...কিন্তু ঐ একবার দেখেছি, সেই একবারই। শ্রীশ্রীমা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন—একবারই। কিন্তু সে-দর্শন অতিশয় স্পষ্ট।" স্বপ্ন কি জাগরণাপেক্ষা সর্বক্ষেত্রেই নিষ্প্রভ? স্বপ্নের প্রভাব কি উপেক্ষণীয় সকল অবস্থাতেই? দেব-স্বপ্ন তবে না মেনে কি পারা যায়?

অপর চিত্রটিও বড় হৃদয়স্পর্শী। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, ব্রহ্মবিদোত্তম ব্রহ্মানন্দ দেবী সারদার অশরীরী বিমূর্ত আবির্ভাবে নিদ্রাত্যাগী! শ্রীশ্রীমায়ের এই সূক্ষ্ম প্রকটলীলা কি জাগ্রতের স্থূল দর্শনের চেয়ে কোনও অংশে কম ভাস্বর?

দেবী সারদা—অখিল জীবের সম্বিদ্রূপা চেতনা-উদ্দীপনাকরী,—জীবের জাগরণে জ্ঞানোন্মেষকারিণী, নিদ্রায় তিনিই সংজ্ঞান। সাধক রামপ্রসাদ তাই সর্বাবস্থায় মাকে নিয়েই ভজনসুখে ছিলেন। "শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।"—স্বপ্ন সুষুপ্তিতেও তাঁর ভজনের বিরাম ছিল না—মা-ছাড়া তিনি কোনও অবস্থাতেই ছিলেন না। জাগ্রতাবস্থায় যাবতীয় বিচরণ—সকল ক্রিয়া-কর্ম চলা-ফেরা, তা'ও তো সবই মাকে ঘিরে। "নগর ফের, মনে কর,—প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।"

আমরাও আপন সামর্থ্যানুযায়ী মাকে প্রদক্ষিণ করেই চলেছি। আমাদের এই সারদা-প্রদক্ষিণ বিরামহীন হোক—তবেই তো প্রদক্ষিণের কৃতকার্যতা। দক্ষিণামূর্তি শ্রীগুরুবিগ্রহ সারদাকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত রেখে আমাদের প্রদক্ষিণ চলুক জীবনাবধি। শুধু জাগরণেই প্রদক্ষিণ নয়, আমাদের শয়ন-স্বপন হোক প্রণামস্তীর্ণ, নিদ্রা-সুষুপ্তিও হোক ধ্যানময়।

*　　　　*　　　　*

দেবী সারদাকে দেখার প্রয়াস হয়েছে আদ্যাশক্তি ভগবতী পরমাপ্রকৃতি রূপে। দেখেছি তাঁকে শান্তিপ্রদাত্রী শান্তিস্বরূপা জীবদুঃখকাতরা। আবার সম্প্রতি তাঁর পূজার চেষ্টা হ'ল—মোক্ষবিধায়িনী শ্রীগুরুমূর্তিতে। গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন—এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে স্বতঃপ্রমাণিত রূপে প্রকট দেখলাম শ্রীশ্রীসারদার চরিতালেখ্যে। তবুও যেন কিছুই বুঝা হল না—তাঁকে মননের যথার্থ রূপরেখাটি আমাদের অগোচরেই থেকে গেছে বলে আশঙ্কা জাগছে। মনে পড়ছে, মাতৃপদাশ্রয়ী ললিত মহারাজ—স্বামী কমলেশ্বরানন্দের একদিনের উক্তি। কলকাতার ভবানীপুরে গদাধর আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-জয়ন্তী উপলক্ষে একটি সভানুষ্ঠানে (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি বলেছিলেন:

"যেদিন মা কৃপা করলেন, সবই বললেন মনে হল। নিজের সম্বন্ধে তো কিছুই বললেন না! তখন কিছুই বুঝলুম না। পরে যখন একদিন শ্রীচরণে নিবেদন করে জানালুম—'মা গুরুও বুঝলুম, ইষ্টও শুনলুম। মা, আপনাকে কি বলে ভাবব?' মার মুখে সে-কথার জবাব নেই,—নীরব। শেষে বললেন, বাবা ঠাকুরকে ভাবলেই হবে। আমি আর কে? আমার আর কি!' কিন্তু নীরব ভাষায় তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন,—তাঁর দাস, চিরদাস—ইহ জনমে দাস, পর জনমে দাস, জনমে জনমে দাস—এবার মার কৃপায় সেই রহস্য সে বুঝেছে। সে বুঝেছে—মা যে ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রিয়, প্রিয়াতিপ্রিয়, অতি প্রিয়, প্রিয়তম। প্রিয় ব্যক্তি কি আর তার প্রিয়ের কাছে 'আমি অমুক', 'আমি তমুক' ইত্যাদি বলে পরিচয় দেয়? যিনি ভাগ্যবান, যাঁর এমন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ের সঙ্গে জীবনে মিলন হয়েছে, তিনিই প্রাণে প্রাণে এ-রহস্য বুঝবেন। তিনিই রস পাবেন, রসে ডুবে যাবেন। আমরা মায়ের শ্রীমূর্তি হৃদয়-আসনে বসিয়ে আজ এখানেই সব কথা শেষ করছি।"

'গুরুও বুঝলুম, ইষ্টও শুনলুম!'—পূজনীয় ললিত মহারাজের ভাষার প্রতিধ্বনি আমাদেরও বক্ষমধ্যে। আমরাও বলি,—"কি বলে ভাবব তোমাকে? ভগবতী দেবী, শান্তিপ্রদাত্রী, জ্ঞানদা গুরু ইত্যাদি বহু-বন্দিত রূপকে ছাপিয়ে সদা প্রোজ্জ্বল সারদার মাতৃরূপ। আমরা এ-কথা পূর্বেও একাধিকবার বলেছি—এখানেও তাঁর শ্রীগুরু-ভাবের ইতি করা অসম্ভব বুঝে ঐ কথারই পুনরুক্তি না করে পারছি না। কমলেশ্বরানন্দ স্বামীর উপলব্ধি আমাদের ভাবনাকেই সঞ্জীবনী সমর্থন প্রদান করে।

শ্রীসারদা দেবী—একাক্ষরা মা। দুর্বল আমাদের জন্ত সহজ সরল সুখোচ্চারণ এই একাক্ষর মন্ত্র মা। এই 'মা'-মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী আমাদের মা সারদা—শ্রীশ্রীমা। মন্ত্রময়ী মা—সর্বমন্ত্রপ্রণেত্রী সারদা। আমাদের সর্বভাব-ভাবিনী সারদা—সর্বব্যাপিনী মা। তাই তো সুখেও বলি 'মা', দুঃখেও ডাকি 'মা'। ভয়েও কাঁদি 'মা' বলে, জয়েও ধ্বনি দেই 'মা'। আমাদের জানার প্রয়োজন নেই কণ্টকে আছি, না কুসুমে আছি। বুঝতে চাই না, কর্দমে রয়েছি, না কুসুমে রয়েছি। শুধু জানলেই হ'ল, বুঝলেই হ'ল—"মা আছি তোমারই কোলে।" আমাদের সকল বিচার, সমস্ত মনন, যাবৎ অনুচিন্তনের পর্যবসান এখানেই। এখানে মানে যেখানে মা সর্বানন্দনন্দিতা—সারদা সর্বভয়ভয়ঙ্করী।

মায়ের মিষ্টি কণ্ঠ অনাহত ধ্বনির মতো অহর্নিশ জীবের কানে বাজছে। কিন্তু শোনার অবসর কোথায় আমাদের? অনুদিন অনুপহত সেই মিঠা স্বর:

"সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে মাটিতে। উপরে সূর্য নিচে জল। জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সূর্য, আমাকে তুমি টেনে তুলে নাও উপরে? সূর্য নিজের স্বভাব থেকেই টেনে নেয়। তেমনি আমি সকলের মা। সকলকে স্বভাববলেই টেনে নেব। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না।"

"লোকে বোঝে, আমি মা—তোমরা আমার সন্তান।"

"কেন আমাকে পাওনি? কখনো কি অনুভব করনি যে আমি আছি—তোমাদের সাথে সাথে? আর কেউ না থাকে না থাক, তোমাদের একজন মা আছে—এ কি মনে প্রাণে অনুভব করনি বাবা?"

"আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি বাবা? আমি আছি সর্বদাই তোমাদের সাথে সাথে সর্বাবস্থায়—তোমাদের পিছনে, তোমাদের সামনে, তোমাদের চারিদিকে। আর আমি আছি তোমাদের অন্তরে—তোমাদের প্রাণে মিশে। সাধ্য নাই তোমরা আমাকে ছাড়, আমি তোমাদের ছাড়ি। এ কি কম পাওয়া বাবা।"

"আর সর্বদা মনে রেখো, তোমাদের ভালমন্দের সকল ভার আমি নিয়েছি, তোমাদের প্রকৃত পরিচয় আমি, আর তোমাদের প্রতিষ্ঠা আমাতে। সর্বদা জেনো—মনে রেখ যে তোমাদের একজন মা আছেন।"

'তোমাদের একজন মা আছেন।'

দেবী ভগবতী সারদা, শান্তিস্বরূপিণী সারদা, এবং চৈতন্যদায়িনী মোক্ষদা

গুরুমূর্তিধারিণী সারদা—সব রূপ একাকার হয়েছে এই মা সারদাতে। উৎকলিত মাতৃ-উক্তিগুলির মধ্যে শ্রীসারদার সকল রূপেরই ভোতনা সুপরিস্ফুট—কিন্তু সর্বোপরি তিনি মা, এই ভাবটিই যেন ধ্রুবতারার মতো সদা ভাস্বর। এখানে স্মরণ করতে ইচ্ছা হয়, শ্রীশ্রীসারদাদেবীর বিশিষ্ট জ্ঞানী সন্তান স্বামী সারদেশানন্দজীর হৃদয়-মথিত সেই কথাগুলি ঃ

"পবিত্রতম, মধুরতম সুন্দরতম শব্দ 'মা'। অভয়প্রদ, আশাপ্রদ, শান্তিপ্রদ রূপ মাতৃমূর্তি। বর্তমান পৃথিবীর অশান্ত মানবহৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করতে ভগবৎ-করুণা মাতৃরূপে আবির্ভূতা। দেখাও যাচ্ছে, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভেদ-বিসম্বাদ ভুলে পৃথিবীর সকল দেশের নরনারী মাতৃদর্শনে ছুটে আসছে, মাতৃচরণে লুটিয়ে পড়ছে, 'মা' 'মা' শব্দে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে তুলছে। আর জগজ্জননী মায়ের সেই কথাগুলি আমাদের কানে অনুরণিত হচ্ছে ঃ 'ওরাও আমার ছেলে'; 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা'; 'আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে'।"

(—'শতরূপে সারদা', পৃষ্ঠা ২৩৮)

আমাদের আলোচ্যমান মননমালার পরবর্তী এবং শেষ কুসুমটি তাই গ্রথিত হবে—শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মাতৃরূপ,—তাঁর অখিল 'মা' রূপের আলেখ্য-অঙ্কন। শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণের ঋষির কণ্ঠোচ্চারিত মাতৃ-মাহাত্ম্যানুবাদের ভাষার অনুকরণে আমরাও মাকে প্রণতি নিবেদন করে এখানেই বর্তমান অভিধ্যানের ছেদ রেখা টানছি। আমরাও যুক্ত করে বলি ঃ মা তুমিই চৈতন্যদাত্রী স্বয়ং শ্রী—গুরুরূপ-ধারিণী সারদা। আবার তুমিই স্নেহ-শান্তি করুণা-বিগ্রহা গৌরী উমা জগন্মাতা। দুস্তর সংসার-সমুদ্রের তরণীস্বরূপা তুমিই মা ব্রহ্মময়ী। তোমাকে প্রণতি জানাই বারবার, পুনঃপুনঃ।

"মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥"

(—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।১১)

হে দেবি, যাঁর কৃপায় লোকে সর্বশাস্ত্রের—বেদের মর্মার্থ অবগত হয়, সেই

মেধারূপিণী শ্রীবিদ্যা সরস্বতী তুমি—তুমিই অখিল জ্ঞানমূর্তি গুরু। তুমি দুস্তর সংসার সমুদ্রে পারাপারের তরণী অদ্বিতীয়া অসঙ্গা ব্রহ্মময়ী। তুমিই নারায়ণের হৃদয়বিহারিণী লক্ষ্মী—শিবহৃদয়বাসিনী পরম কল্যাণময়ী শিবানী উমাও তুমি।

হে সারদে, তোমাকে প্রণতি নিবেদনের অন্য ভাষা নেই আমাদের।

'প্রকৃতিং পরমাং' গ্রন্থের
তৃতীয় খণ্ডে
"সং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ"
সম্পূর্ণ॥

॥ চার ॥

"শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে"



॥ চার ॥

"শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাম্
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে"

দুঃসংবাদবাহী একটি টেলিফোন-বার্তা পেয়ে কলেজ থেকে ছুটে গিয়েছিল ছেলেটি সোজা মেডিকেল কলেজে,—যেখানে তার মায়ের অগ্নিদগ্ধ দেহটি রাখা ছিল। কিন্তু হায়! দাহিত বিকৃত নিষ্প্রাণ একটি শরীর মাত্রই সে দেখেছিল,—দেখেনি তার মাকে। খুঁজে পায়নি তাঁকে, কাপড়ে ঢাকা ঐ শায়িত দেহখানির কিঞ্চিৎ দৃশ্যমান দগদগে ঝলসানো মুখের আকৃতিতেও।

রাজারহাট বিষ্ণুপুরে ওদের বাড়ি। ছেলেটি কলকাতায় তার মাতুল-গৃহে থেকে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ত। রান্নার উনুন থেকেই অসাবধানে আগুন ধরে গিয়ে ঐ মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটেছিল ছেলেটির মায়ের, তথা সমগ্র পরিবারের। নিয়তি অপ্রতিরোধ্য। এমনই ভাবে একটি সংসার যেন চিরদিনের জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। নিতান্তই অপরিণত বয়সে মা চলে যান—অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই নানা দুর্নিমিত্তও একের পর এক ঘটতে থাকে মাতৃহারা সন্তানদের জীবনে। চোখের জল তখন বিরামহীন ওদের সবার চোখগুলিতে। মায়ের একখানি ফোটোও ছিল না বাড়িতে,—যা দেখে ছেলে-মেয়েদের মনে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার আলোকরেখা হয়তো কখনও কখনও ফুটে উঠতে পারত। বিধাতার এমনই নির্মম ব্যবস্থা! মা ওদের নিছকই স্মৃতিতে পর্যবসিত—যা' কালের নিয়মে ক্রমেই মিলিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। স্বভাবতই যা ক্ষীয়মান বিলীয়মান,—ওদের মা তখন রয়েছেন শুধু সেই স্মৃতিরূপেই।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। কলেজের পড়া শেষ করে ছেলেটি এখন কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে,—বলা চলে বাহ্যতঃ সুপ্রতিষ্ঠার পথেই সে এগোচ্ছে। কিন্তু মনের রাজ্যে তার প্রবহমান ঝড়,—স্রষ্টা বিধাতার একমাত্র নিষ্ঠুর-স্বভাবটাই যেন তাকে উত্তরোত্তর তাঁর প্রতি বিদ্রোহী করে তুলছিল,—ধীরে ধীরে সেই অন্ধ-ঝড় অবিশ্বাসের আস্তরণ টেনে দিচ্ছিল তরুণের দৃষ্টিতে। জীবনে ও জগতে ঈশ্বরের

কোনও প্রয়োজনকেই সে অনুভব করতে পারে না তখন। কোনও দেবালয়ে যায় না,—কোনও ধর্মস্থানের দিকে ফিরেও তাকায় না। তার দেব-দেবী-ঈশ্বর-ভগবান একমাত্র মা,—তা'ও শুধুমাত্র চিন্তায় ও নীরব অশ্রুপাতে। মায়ের চেহারা, মায়ের স্মিত মুখশ্রীকে খুবই কষ্ট করে মনের পটে এঁকে নিতে হয় তাকে। বহু অনুসন্ধানেও মায়ের কোন রকম একখানা ফোটোগ্রাফ্ বা ছবি কিছুতেই মেলে নি কোথাও,—ফোটো তোলাই হয়তো হয়নি। এই আক্ষেপই মাতৃভক্ত পুত্রকে দগ্ধে মারছিল অন্তরে।

জনকয়েক বন্ধুবান্ধব মিলে এক ছুটির দিনের বিকেলে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল বেলুড় মঠে,—নিছক বেড়াতেই বটে, মঠ-দর্শনের উদ্দেশ্যে মোটেই নয়। হাসি গল্প করে করে গঙ্গার তীর ধরে পায়চারি চলছিল সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে। বেড়াতে বেড়াতে চলে এসেছিল তারা শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের সোপানশ্রেণীর সম্মুখে। সহচরদের সকলেরই মুখের কথা সাময়িক স্তব্ধ হ'ল,—একজন বাদে সবাই মন্দিরের বারান্দায় উঠে গিয়ে, মন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারদেশে মাথা ঠেকিয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম নিবেদন করল। দলের একজন মন্দির সোপানের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপলকে শুধু মন্দির-বেদিকায় স্থাপিত শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর আলেখ্যের দিকেই তাকিয়ে ছিল,—মন্দিরের দ্বার-সমীপে যায়নি, বারান্দায় ওঠেনি, পায়ের জুতাও খোলে নি,—হাত জোড়ও করেনি! সঙ্গীর দল মন্দির থেকে নেমে এসে যে যার জুতা পরে নিল,—সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে থাকা তাদের সেই বন্ধুকে কাঁধে হাত দিয়ে ডাকল। কিন্তু দণ্ডায়মান যুবক যেন চুম্বকাকৃষ্টের মতো নির্নিমেষ নেত্রে এক স্থানেই স্তম্ভিত।...পায়ের জুতা খুলল সে,—ধীর পদে ঐ মাতৃ-প্রতিকৃতির সম্মুখপানে না এগিয়ে থাকতে পারেনি সে-ও। অশ্রুজল দুই গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পরতে শুরু করেছে। দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে,—আয়ত তার দুটি চক্ষু যেন কোথায় গিয়ে হারিয়ে গেছে, কোন্ অতলে ডুবে গেছে।

"ডুবল নয়ন, এলো না ফিরে... ॥"

সুদিনের জীবনে প্রকৃত সুদিন সেই ক্ষণ থেকেই। মায়ের সঠিক আলোকচিত্র—তাঁর অঙ্গের হুবহু প্রতিচ্ছবি—একেবারে নিজ গর্ভধারিণীর সজীব ছায়াকে, নিখুঁত ছবিকে, সুদিন এতোদিনে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিল ঐদিন সন্ধ্যাতে। যার জন্য এতো অন্বেষণ, যাকে না পেয়ে এমন উচাটন, তার চির অবসান ঘটেছিল শ্রীশ্রীমায়েরই এক অলৌকিক করুণাসম্পাতে। সুদিনের সুদিন ফিরে এসেছিল এই ভাবেই।

মন্দির থেকে তাকে ডাকাডাকি করে নামিয়ে আনা হলে, বাকৃষ্ণ সুদিন তার বন্ধুদের কাছে জানতে চেয়েছিল,—এই মায়ের ফোটো আমাকে সংগ্রহ করতেই হবে, যেমন করেই হোক। ফোটোও পাওয়া গিয়েছিল, বেলুড় মঠেরই সংলগ্ন শিল্প বিত্তালয়ের 'শো রুম' (show room) থেকে। ছল ছল চোখে ঐ ফোটোর দিকে দেখতে দেখতে, গদগদ কণ্ঠে সে বলেছিল: "আমার মায়ের চেহারা—তাঁর মুখ, তাঁর চাহনি, তাঁর হাত, তাঁর মাথার চুল—ঠিক এমনই ছিল। আমার নিজেরই মায়ের ফোটো যেন।"

মা-হারা এক সন্তানের অশান্তিতে শান্তিবারি অভিবৃষ্ট হল,—ভগ্নপ্রায় অশান্ত হৃদয় খণ্ডিত হতে পারল না শ্রীশ্রীমায়েরই হস্তপাতে। যে-মৃত্যু এসেছিল সুদিনের জীবনে অভিসম্পাত হয়ে,—সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুর রূপও যেন পরিবর্তিত হয়ে দয়াস্বরূপ হয়ে নবতর বেশে আবির্ভূত হয়েছিল। সুদিন সুদিন হয়েই নবজন্ম লাভ করেছিল শ্রীশ্রীমায়েরই অমোঘ কৃপাতে।

আমরা অবগত আছি ঐ মাতৃ-আলেখ্যই মাতৃ-সেবক সুদিনের নিত্যপূজ্যা চির আরাধিতা ছিলেন। একদা অবিশ্বাসী বিদ্রোহপরায়ণ এই তরুণই উত্তরকালে ভগবদ্-নিবেদিতপ্রাণ সুদিন মহারাজ (স্বামী ভীমানন্দ)—যিনি অত্যন্ত অপরিণত বয়সেই শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে বিলীন হয়েছেন,—যাঁর প্রয়াণ সংবাদ জেনে পূজনীয় স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী আমেরিকা থেকে বর্তমান লেখককে এক পত্রে লিখেছিলেন:

"কুড়ি বৎসরের স্মৃতি ভিড় করে আজ একক্ষণে
হাসিমাখা মুখখানি তব বার বার পড়িতেছে মনে,
যে আহ্বান উঠেছিল বেজে একদিন অন্তর-গভীরে
অনুসরি তাহা ক্লান্তিহীন চলে ব্রত বিশবর্ষ ঘিরে,
নাহি ছিল ভয় ও সংশয়, নাহি ছিল দুঃখ শোক মোহ
রামকৃষ্ণ-অনুরাগে বাঁধা সদা-জাগা পরম উৎসাহ।

পৃথিবীর অজস্র বিক্ষেপে নাহি যাঁর কাঁপে মনঃপ্রাণ
মানুষের সেবা তৎপর একলক্ষ্যে যিনি আগুয়ান,
তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ভক্ত ধন্য তাঁর জনক-জননী
সত্যের আলোকদীপ্ত সার্থক জীবন তাঁর গণি।
ঠাকুরের অতি প্রিয়জন গুরুপ্রাণ হে সন্ন্যাসী সুদিন
স্মৃতি তব মোদের হৃদয়ে চিরদিন রবে অমলিন।"

একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত—দেবী সারদার সর্বকালীন সর্বজয়া সর্বগামিনী সর্বব্যাপিনী সর্বশুভদা প্রমূর্ত মাতৃত্বের। মা—মাতা তো মাত্র স্নেহসাগরা জননীই নন, তিনি যে সর্বজ্ঞা, সর্বপ্রয়োজন-সাধিকা, পরিমাতাও বটে। যিনি সংসারের সকল কিছুর পরিমাণ বুঝে, যা'র যা' প্রয়োজন তা'ই বিধান করেন,—যার যা' পেটে সয়, তা'ই তাকে দিয়ে থাকেন, তিনিই মাতা। যিনি সবারই মাপ জানেন—তিনিই প্রমাণ-কারিণী মা। মাতা শব্দের নিহিত ভাব এতোখানি,—বাহ্যতঃ যাকে দেখি আমরা সন্তানবৎসলা দয়ার্দ্রহৃদয়া মাধুর্যময়ী এক জননীমাত্রই। 'মা' ধাতু থেকেই ব্যুৎপত্তি হয়েছে 'মাতা' শব্দের। অতএব তাৎপর্যার্থ বুঝা কিছু কঠিন নয়। 'মা'—পরিমাণ বা পরিমাপ—জ্ঞান ও দীপ্তির দ্যোতক। আবার 'মা' হচ্ছে নিষেধার্থকও বটে,—অর্থাৎ মাতা সন্তানকে অশুভ শ্রেয় থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেন, শাসনও করে থাকেন। আমাদের নিত্যকার সংসারের ব্যষ্টি মাতৃমূর্তিতে উক্ত মায়ের লক্ষণগুলি সর্বদা প্রকট থাকে না,—পরন্তু স্নেহ-করুণা-বাৎসল্য এবং দয়ার ভাবরাজিই মাত্র অধিক উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু, সমষ্টি মাতৃত্বের মধ্যে,—মূর্ত জগন্মাতাতে সর্বলক্ষণ-দ্যোতনাময়ী মাকে উপলব্ধি করা যায় অনায়াসেই।

সমষ্টি মাতৃশক্তির ঘনীভূতা বিগ্রহ শ্রীসারদা। তিনি যতোদিন স্থূল দেহধারিণী ছিলেন, ততোদিন তাঁর বিশ্বমাতৃত্বের প্রভা ছিল ব্যক্ত কিন্তু সীমিত,—সাধারণের বোধ বা দৃষ্টিসীমার মধ্যে সব সময়েই তা থাকত না। লজ্জাপটাবৃতা মা কি তখন সকলেরই নয়নপথবর্তিনী হয়েছেন? কিন্তু যখন থেকে তিনি নিত্যলীলায় অন্তর্হিতা, তখন থেকেই যেন তাঁর মাতৃত্বের আলোকতরঙ্গ, মায়ের দৃষ্টি-কিরণসম্পাত নির্বিচারে সবারই প্রত্যক্ষগোচর,—দেদীপ্যমান নিরবধি নিরন্তর। মাতা – তিনি সকল জীবেরই মা। দুঃখ ও সুখ, মরণ বা জীবন,—দুই-ই তাঁর দয়ার দান। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই অমৃতের ভাস্বরতা অবলোকন করান তিনি। স্নেহে করুণায় এবং শাসনে দমনে—সেই একই মা। তিরস্কারেও তিনি, পুরস্কারেও সেই তিনি মাতা। মায়ের দৃষ্টিপাত সর্বত্র,—সকল হৃদয়েই তাঁর আলয়। কেন যে কী করেন, কার জন্য কী ব্যবস্থা তাঁর,—তা'ও তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তাঁর নয়ন-রশ্মি সুখী-দুঃখীকে একই ভাবে স্পর্শ করে। মাতৃতত্ত্ববিদ্ মহর্ষি বিবেকানন্দ তাই শ্রীশ্রীমাকে উদ্দেশ করে স্তুতি করেছেন: হে অম্বে, তোমার পদ্মনেত্রের দৃষ্টি শত্রু-মিত্র উভয়ের প্রতিই সমভাবে ন্যস্ত,—সুস্থ অসুস্থ,—সুখী দুঃখী উভয়কে তুমি একই ভাবে স্পর্শ করে রয়েছ। ওগো মা, মৃত্যুচ্ছায়া ও জীবন দুই-ই তোমার দয়া। হে পরমা দেবি, তোমার শুভদৃষ্টি থেকে আমাকে যেন সরিয়ে রেখোনা।

"মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রং
স্বস্থে-অসুখে তু অবিতথ তব হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃত্যেঃ তব দয়া তু অমৃতঞ্চ মাতঃ
মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে ॥"

(—অম্বা-স্তোত্রম্ ৫)

মা তাই স্নেহের পাথার যেমন,—সর্বদুষ্টভয়ঙ্করীও ঠিক তেমনই। সর্বদুঃখহা সারদা, সর্বদোষবিঘাতিনীও এই কারণেই। শান্তিস্বরূপা, মোক্ষদা, জ্ঞানদা প্রভৃতি সারদার যে-কোনও রূপের পশ্চাতে নিয়ত বিচ্ছুরিত এই 'মা' রূপের বিভাই চিরন্তন সুপ্রভ আমাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতেও। আমরা পূর্বেও পুনঃ পুনঃ এ-কথার উল্লেখ না করে পারিনি। এখানে বর্তমান পরিচ্ছেদে, শ্রীসারদার সেই 'মা'-রূপখানিকেই বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র মাত্রায় মননে প্রয়াসী আমরা। আমরা কিছু আগেই স্মরণ করেছি, এক মাতৃহারা শূন্য হৃদয়কে শ্রীশ্রীমা কেমন অলৌকিক অতীন্দ্রিয় উপায়ে ভরে দিয়েছেন,—সন্তানের হৃৎস্পন্দনকে সুনিয়ন্ত্রনে আনীত করেছেন, তার মাতৃশোককে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন মাতৃ-সন্নিধিলাভের পরম চরিতার্থতায়, প্রাপ্ত-প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা আনন্দে। শ্রীমান সুদিন মাকে হারিয়ে, মাকেই পেয়েছিলেন। অথবা মা একরূপে অন্তর্ধান করে, নিত্য ভাস্বর রূপে তাঁর অক্ষিগত হয়েছিলেন। মৃত্যুচ্ছায়া ও অমৃত দুই-ই তো শ্রীশ্রীমায়েরই পদ্মহস্তের দান—মরণের শোক জীবনের শান্তি উভয়ই মায়ের দয়া। অবিতথ এই হস্তপাত—মায়ের কৃপাদৃষ্টি।

"মৃত্যু বা অমৃত, দু'য়ে তব কৃপা ঝরে।"

* * *

মা হচ্ছেন পরিমাতা,—জানেন তিনি ঠিক ঠিক পরিমাপ, কোথায় কতটুকু ফাঁক, কেমন করে কী দিয়ে ভরে দিতে হবে সেই ফাঁককে—অপূর্ণতার অশান্তিকে, রিক্ততার যাতনাকে। পূর্ণরূপা সারদা। তিনি তো সকলের, সকলেই তাঁর সমান সন্তান। অনন্তরূপিণী মা। প্রতিজনের কাছে গর্ভধারিণী জননী,—বহুরূপ-ধারিণী, স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরিণী, দেশ-দেশান্তরচারিণী, সর্বকালাধিবাসিনী।

পঠিত বা শ্রুত নয়—একান্তভাবেই গোচরিত একদিনের এক ঘটনা। উত্তরবঙ্গের

কোনও জায়গায় যেতে হবে। অতদূর একটানা রেললাইন তখনও পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়নি। নদী পার হতে হবে। স্টীমারের জন্য অপেক্ষারত। শীতের রাত। একটা বিড়ির দোকানের পাশেই একটা জ্বলন্ত উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে একটু আরাম খোঁজা হচ্ছিল। বিড়ির দোকানের এক আশ্চর্য শ্রী মনোহরণ করেছিল লেখকের। বাইরে থেকে দেখে সহজেই বুঝে লওয়া গিয়েছিল,—দোকানটি এক মুসলমান যুবকের. যে পরম উৎসাহ ভরে, নিবিষ্ট মনে, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বিড়ি বাঁধছিল। কারও দিকে তাকাবার তার অবসরই ছিল না। কিন্তু এক অবিশ্বাস্য ও বিরল দৃশ্য অত্যন্ত কৌতূহল জাগাচ্ছিল মনে। বিড়ির দোকানে তাকের উপর—দোকানীর পিছনে, পাশে, সম্মুখে সর্বত্রই থরে থরে দিয়াশলাই সিগারেট, বিড়ির সম্ভার সাজানো। আর সেই বিচিত্র পরিবেশের মাঝে একটা মানানসই জায়গাতে ঝুলানো রয়েছে দু'টি ছবি—একটি কাঁচ-লাগানো ফ্রেমে বাঁধানো মক্কার কাবা মসজিদের—যার উপরে আরবী ভাষায় কিছু লেখাও রয়েছে,—অপর চিত্রটি শ্রীশ্রীমায়ের,—কোন পুরাতন কাগজের বাক্স থেকে ছিঁড়ে লওয়া এক টুকরা পিজবোর্ডের গায়ে আঠা দিয়ে সাঁটানো। মায়ের ছবিটিকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে ওটি কোন বই বা পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মায়ের ছবির দিকে নির্দেশ করে সবিস্ময়ে সেই মুসলমান ছোকরাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"ভাই, এ-ছবি কার রেখেছ তুমি?" ঘাড় না তুলেই তৎক্ষণাৎ সহজ জবাব শুনেছিলাম তার মুখে: "আমার আম্মার"। মাকে মুসলমানরা আম্মা বলেই ডাকে—কথাটা আরবী 'উম্ম' থেকে অপভ্রংশ, কিম্বা সংস্কৃত 'অম্বা' শব্দের স্খলিত রূপ। যাই হোক, হতবাক্ করে দিয়েছিল ঐ আশ্চর্য জবাবটি। আমাদের বিস্ময় তাকেও কিছু মনোযোগী না করে পারেনি। আমাদের অমন অযাচিত সতৃষ্ণ আলাপ সেই ইসলামধর্মী অশিক্ষিত যুবকের অন্তরে কী যেন এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখন, সেটা লক্ষ করতে কোনও অসুবিধা হয় নি। অতঃপর তার সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল, তা' থেকে সার নিষ্কাষণ করে এখানে উপস্থাপিত হচ্ছে। বিড়িওয়ালা সেই মুস্লিম তরুণ, ঐ রাত্রে যা আমাদের দিয়েছিল,—তার মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আজও অর্জিত হয়নি। তরুণের বিড়ি বাঁধার কাজ বন্ধ হয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই। দুই চোখ ভরা জল নিয়ে, আবেগের সঙ্গে সে তার মাতৃ-আবিষ্কার-কাহিনী আমাদের শোনাচ্ছিল। আমরাও শ্রদ্ধান্বিত একাগ্রতা সহ তার মুখে শুনছিলাম, এক অশ্রুতপূর্ব দেবী-পুরাণ—চিত্তাকর্ষী মাতৃ-মাহাত্ম্য।

যুবকটি মাতৃহারা শৈশবেই। মায়ের অকাল মৃত্যু তাদের সংসারকে একেবারে ছন্নছাড়া করে দেয়—স্থিতিহীন হয়ে পড়ে সব কিছুই। বাপকে সে দেখেনি যা মনে নেই—তিনি কবরপ্রাপ্ত আগেই। ছেলেটি বড়—তার ঘাড়েই ছোট ছোট ভাই-বোনদের যাবতীয় ভার। দিশাহারা সে। মরহুম আম্মার জন্য দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে. যেন সে-ফুরসতটুকুও আল্লাহ তাকে দেন নি। আব্বা কিছুই রেখে যাননি,—দিনমজুরী করে যা পেতেন তা দিয়েই দানাপানির সংস্থান করতেন। আম্মা বিড়ি বাঁধতেন ঘরে বসে, আর আব্বা তা' বিড়ির দোকানে দিয়ে আসতেন। এ-সবই তার শোনা কথা। তার আব্বার মতো সে-ও ছোটবেলায় আম্মার বাঁধা বিড়ি দোকানে দোকানে বেচতে যেত। কখনও কখনও পুরাতন কাগজ-বইপত্র কিনে আনত গৃহস্থ-বাড়ি থেকে,—তা' দিয়ে তার আম্মা ঠোঙা তৈরী করে দিতেন, তা' বেচেও কিছু রোজগার হ'ত। মাকে হারিয়ে এখন তার রুজি-রোজগারও ভীষণ ঘা খেয়েছে। এমনিভাবেই কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে তার। মনে পড়ে আম্মার কথা। বুক ফেটে কান্না আসে। আম্মার মুখখানা থেকে থেকে চোখে ভেসে ওঠে। অশেষ শূন্যতার মাঝেও যেন ক্ষণেকের জন্য মনটা কেমন করে ওঠে, আম্মার গলার আওয়াজও যেন শুনতে পায়। বড় দেখতে ইচ্ছা করে আম্মাকে। কিন্তু একখানা ছবিও যদি তাঁর পাওয়া যেত, তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে পারত। রাত্রে চোখের জলে বালিশ ভেজে। মনকে প্রবোধ দেয়—তসবির গুনাহ্,—ইসলামে ছবি রাখা পাপ। অন্তরটা শুধুই খাঁ খাঁ করে ছেলেটির। এমনিভাবেই কয়েকটি বছর কেটে যায়।

ঠোঙা বানাবার জন্য পুরাতন কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করছিল একদিন,—সহসা একটা কি পত্রিকা হাতে এল। পত্রিকার পাতা উলটাতে গিয়ে হঠাৎ ছেলেটির চোখ এক জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল। ইন্‌শা আল্লাহ্,—আল্লাহর কী মরজি! মা-হারা ছেলে তার মায়ের ছবি পেয়ে গেল অত্যন্ত দৈব যোগাযোগে। ঐ পত্রিকাতেই মুদ্রিত ছিল শ্রীশ্রীমায়ের একখানি নিখুঁত চিত্র। সন্তানের তপ্ত বক্ষ সেদিন থেকেই জুড়াল। ছেলে তার মাকেই যেন ফিরে পেয়েছে সেই থেকে। জীবনের গতিও মোড় ফিরতে শুরু করে তখন থেকে। ছোটখাটো একটি দোকানও করেছে সে নিজেই। তার আদরের আম্মা এখন চোখের সম্মুখেই বসে আছেন,—সে আন্তরিক বিশ্বাস করে। ঐ তসবিরের মধ্যে থেকেই তিনি তাঁর সন্তানের প্রতি দোয়া দিয়ে যাচ্ছেন,—আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন অহর্নিশ। ঐ তরুণ মুসলমান এই ভাবেই বার বার খোদা তায়ালার কুদরতকে—আল্লাহর আলৌকিক

করুণাকে মুখের ভাষায়, চোখের চাহনিতে,—সর্বাঙ্গের অনুভূতি দিয়ে যেন প্রকাশ করছিল। আর মাঝে মাঝেই তার মরহুম আম্মার তসবিরের দিকে—সবার মা সারদার চিত্রপটখানির পানে অশ্রুভরা নয়ন মেলে দেখছিল। কিন্তু সে তখনও পর্যন্ত জানেনা—জানতে আদৌ আগ্রহীও নয়, ঐ ছবিখানি কার! সে জানে তার নিজের মা—আপন আম্মাই ঐ ছবিতে বিরাজ করছেন, তাঁর ডাগর ছাওয়ালকে দেখাশোনা করার জন্য!

মুস্লিম সেই মাতৃমান যুবকের মুখে মুগ্ধ আবেশে সেই রাত্রিতে ভাগবত-কাহিনী শুনছিলাম—অপূর্ব অকথিত অপ্রকাশিত দেবী-ভাগবত। ইতিমধ্যে স্টীমার আসার সঙ্কেত পেয়ে, অমন মাতৃমহিমা শ্রবণ-সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। অমন তন্ময়-সুখের মধ্যেও একটি দুঃখ থেকে গেছে, আজও যা মর্মপীড়ার কারণঃ যুবকটির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি! অবিদিত-নাম সেই মুসলমান ভাইটির উদ্দেশেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, আমাদের কাছে মাতৃ-গরিমা প্রকাশক এক অনির্বচনীয় শক্তিধর যন্ত্র হবার জন্য,—মায়ের দুর্বেদ করুণাধারা ধারণের উপযুক্ত পাত্রতা লাভের নিবন্ধন।

* * *

অনুরূপ আরও একটি সুষমামণ্ডিত স্মৃতিচিত্র এখানে তুলে ধরতে ইচ্ছা হয়ঃ সেই স্মরণালেখ্যখানিও সন্তান-ক্লেশহরা অখিল মাতৃশক্তির একটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল উদাহরণ। নিত্যলীলাধারা মা—সর্বজীবের লালনকারিণী সারদা,—সমস্ত সৃষ্টি জুড়েই বিচরণ করছেন, যেন প্রাণস্বরূপা বাতাস। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে আছেঃ পরব্রহ্মময়ী আদ্যাজননী মহর্ষি অম্ভৃণ-কন্যা-রূপিণী মন্ত্রদ্রষ্ট্রী বাক্ বলছেন—আমিই ভুবনের সর্বভূত-জননী,—সৃষ্টি করেই বায়ুর মতো স্বচ্ছন্দে সকলের অন্তরে বাহিরে বিচরণ করে বেড়াই। "অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা…।" (—ঋক্, ১০।১০।১২৫।৮)

গয়ানাথ মণ্ডল—একটি মাতৃহীন শিশু, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখন। থাকে কোচবিহার জিলার মেকলিগঞ্জস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত ছাত্রাবাসে। একবার আশ্রমের অতিথি হয়ে দিন কয়েকের জন্য সেখানে বাস করতে হয়েছিল বর্তমান গ্রন্থকারকে। ছোট্ট শিশুটির মুখ-চোখ ছিল উজ্জ্বল—বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু সর্বদাই চোখ দু'টি কেমন ভিজা ভিজা দেখাত। কথায় কথায় জেনেছিলাম

—সে সারারাত কাঁদে, মায়ের জন্ত কাঁদে। শিশু গয়ানাথকে রেখে তার গর্ভধারিণী গত হয়েছেন সম্প্রতি। মায়ের অভাবকে সে কোনও মতেই ভুলতে পারছে না। দরিদ্র পিতার সাধ্য ছিল না, শিশুসন্তানের মনের শূন্যতাকে সর্বতোভাবে ভরে দেবার মতো। ছেলেটির পড়াশোনাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ, কিছুই করার ছিল না কারও পক্ষেই।

শ্রীমান গয়ানাথ লেখককে পেয়েছিল, তার এক সমব্যথী বন্ধু হিসাবে। ছাত্রাবাসে থাকে, স্কুলে যায়—সময় পেলেই ছুটে আসে বন্ধুর কাছে, মায়ের কথা শুনতে ও শোনাতে। বন্ধুকৃত্য করা হয়েছিল এক আশ্চর্য কৌশলে। বলা হয়েছিল—"ভাই গয়ানাথ, তোমার মায়ের একখানি ছবি আমি পেয়েছিলাম কোন জায়গা থেকে। তোমাকে সেই ছবিটি আমি দেখাতে পারি। কিন্তু ভয় আমার এই : তুমি কি চিনতে পারবে তোমার মাকে ঐ ছবিতে?" গয়ানাথ আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছিল যেন। আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে ঐ ছবির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। আমিও তার ব্যাকুলতা পরীক্ষার জন্য, তক্ষুণি তক্ষুণি তাকে কিছুই দেখাই নি। কিন্তু গয়ানাথ এত ঘন ঘন আনাগোনা আসাযাওয়া শুরু করল যে,—দিনে রাত্রে ঘরে ও বাইরে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। অগত্যা একদিন ভোরে তাকে ডেকে শ্রীশ্রীমায়ের একখানি ছোট ফোটো তার চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছিলাম,—ফোটোখানিকে সে আমার হাত থেকে প্রায় ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে করে দেখতে থাকল,—বিস্ফারিত দু'টি চোখ ভরে! অনেকক্ষণ ধরে দেখতে দেখতে, তার দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে নেমেছে ততক্ষণে! অবশেষে আমায় ধরে বসল—ঐ ফোটোখানি সে আমাকে ফেরৎ দেবে না। তার মায়েরই ছবি ওখানি! আমিও তাতে সায় দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম,—স্বস্তি, শান্তি ও আনন্দও বোধ করেছিলাম কতোখানি তা' ভাষায় প্রকাশ্য নয়। শিশু গয়ানাথের চোখের জল মুছাতে পেরে, তাকে তার মায়ের সুনিশ্চিত সন্ধান বাতলানোর কৃতার্থতায় আমার স্বস্তি ও শান্তি হয়েছিল ভূয়িষ্ঠ। আর জগজ্জননী সারদার লোকাতীত মাতৃত্ব-বিভূতিকে আরও একবার আপন অবলোকিত সত্য বলে জেনে, আনন্দে বাক্যহারা তখন আমি।

মা-হারা শিশু গয়ানাথ সেদিন থেকেই তাঁর নিজ গর্ভধারিণীকে আবার নিকটেই পেয়েছিল। তার জীবনে নেমে আসতে সূচনা করে নবীন উত্তম, উৎসাহ, প্রাণাবেগ এবং মানুষ হবার উত্তোগ। সে প্রতিদিনই ঐ মাতৃ-প্রতিকৃতিকে আপনভাবে পূজা করে আসছে,—সে-সংবাদও নানা সূত্রে অবগত আমরা। গয়ানাথ

তার হারানো মাকে ফিরে পেয়ে, নবজন্ম প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই,—মণ্ডল-কুলে প্রথম জন্মের পরে, শ্রীমান গয়ানাথ কোন্ অলক্ষিত পদ্মনেত্রের কিরণসম্পাতে এখন ব্রহ্মকুলে জাত হয়ে দ্বিজত্ব লাভে কৃতকৃতার্থ! হয়তো বা সে নিজেও জানে না এতো কথা। তার জীবনে এখন স্থিরতা এসেছে,—জীবন-কেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা তার মা,—না, সে-মা কেবল গয়ানাথেরই জনয়িত্রী নন্, তিনি সকলের মা, বিশ্ব-ভুবনের প্রসবিত্রী মা—শ্রীশ্রীমা। শ্রুতিজননীর স্বীকারোক্তি স্মরণীয় এখানে: "অহমেব বিশ্বাভুবনা অনু-বিতিষ্ঠে" (—ঋকবেদোক্ত দেবীসূক্ত, ৭)। আরও স্পষ্ট করেই তো তিনি জানিয়ে রেখেছেন: আমিই ত্রিভুবন-জননী, সর্বভূতের প্রসবিতা,—স্বয়নান্তে আমিই সঞ্চরমান বাতাসের মতো সবার অন্তরে ও বাহিরে অবলীলায় পরিক্রমণ করে থাকি। "অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা...।" এবারে আমরা তাঁরই স্ব-মুখের কথা শুনেছি সহজ সরল প্রাণের ভাষায়:

"আমি মা, তোমরা সন্তান।...আমি সবার মা। ইতর জীবজন্তুরও মা।... আমি আছি তোমাদের সাথে সাথে সর্বাবস্থায়—তোমাদের পিছনে, তোমাদের সামনে, তোমাদের চারিদিকে। আমি আছি তোমাদের অন্তরে—তোমাদের প্রাণে মিশে।...তোমাদের প্রকৃত পরিচয় আমি, আর তোমাদের প্রতিষ্ঠা আমাতে। ...মনে রেখ যে তোমাদের একজন মা আছেন।"

বেশ কত বছর কেটে গেছে! পরম্পরা শুনেছি, শ্রীমান গয়ানাথ এখন বড় হয়েছে—তার জীবন-গঙ্গায় বহুতর জোয়ার-ভাটা খেলে গেছে, অনেক বারি প্রবাহিত হয়েছে ইতিমধ্যে। আশ্রমের শিশু-ছাত্রাবাসের অন্তেবাসী সে আর এখন নয়,—স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে গয়ানাথ তার গ্রামের বাড়িতে বাস করছে। সংসারের সমগ্র বোঝা এখন যুবক গয়ানাথকেই বইতে হচ্ছে,—কিন্তু সে-বোঝা তাকে হৃতসর্বস্ব করে দিতে পারেনি এখনও অবধি। কেননা দিনান্তে সে সমস্ত বোঝার ভারকে শ্রীশ্রীমায়ের পদে সমর্পণের কৌশলটি জেনে গিয়েছে, শিখে ফেলেছে শরণাগতির সাধন। গয়ানাথের স্মৃতি তাই অশেষ প্রেরণাপ্রদ আমাদের কাছে,—বিশেষ করে শ্রীশ্রীমায়ের সর্বানুভূ মাতৃ-স্বরূপের অনুচিন্তনে সহায়তা করে বলে। কোন্ লেখনীতে এই সর্বসন্তান-অভাব-ভাবকারিণী মাকে বর্ণনা করা যাবে,—বস্তুতঃ চিন্তনীয় আমাদের সেটাই। জ্ঞানী কবি পরমভক্তিভাজন স্বামী প্রেমেশানন্দজীর প্রদত্ত মাতৃপদে অঞ্জলিকেই—তাঁরই অনুকরণে পুনর্নিবেদন করছি অসমর্থ আমরাও। প্রেমেশ মহারাজ লিখেছিলেন:

"দেহ ধরি বার বার এসেছি ধরায়,
প্রথম নয়ন মেলি,
হেরিয়াছি মা, তোমারই মুখ।
আমার প্রথম ভাষা 'মা' ডাকা তোমায়,
মা সেজে, মা, দিলে মোরে
অভয়-আশ্রয় তব বুক।"

* * *

মহাকাশ সীমাহীন অনন্ত। আবার তাকেই খুব কাছে পাওয়া যায়, ঘটে-ঘাটে, প্রান্তরে-প্রাচীরে, সিন্ধুতে-বিন্দুতে, পাটে-পটে,—কোথায় নয়? অরূপ তখন রূপে আবদ্ধ হয়ে যায়,—অনামেরও নাম-বন্ধন স্বীকার করতে হয়। মহাকাশকে আমরা নশ্বর ইহলৌকিক করে পাই তখনই। প্রাকৃতিক নিয়মেই রূপের সীমা, নামের বন্ধন ঘুচে গেলেই যে আকাশ সেই আকাশ,—মিলেমিশে এক মহাকাশ। একই মহামাতা আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক এক 'মা' হয়ে ধরা দেন। 'মা'-শরীরের বিলয়ে, শরীরখানি অদৃশ্য হলেও, তাঁর মহামাতৃত্ব চির অক্ষয় হয়েই বিদ্যমান থাকে নিত্যকাল।

যেমন আকাশ, তেমনি আকাশ-সঞ্চারী বাতাস। অপ্রতিবোধ্য গতি তার, অলক্ষ্য প্রকৃতি। কিন্তু সেই বাতাসকেও আমরা অনুভবে প্রাপ্ত হই, জগতের প্রতি পদার্থে যখন সে অনুপ্রবিষ্ট। কঠশ্রুতি তাই জানিয়ে দিয়েছেন:

"বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

(—কঠোপনিষৎ, ২।২।১০)

সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হয়েও নানা রূপের অনুরূপ হয়েই ব্যক্ত থাকেন—আবার প্রতি রূপ থেকে স্বতন্ত্র অবিকৃতভাবেই তিনি নিয়ত বিদ্যমান।

সর্বজীবের অন্তর্যামিনী মহামাতৃশক্তিও এক অবিকারিণী,—যদিও তিনি সর্বভূতেরই 'মা' সাজে অগণ্য নামে রূপে তাঁর আপন সৃষ্টির সংরক্ষণ ও লালনে

নিরতা। "বাত ইব প্রবামি আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা"—বাতাসের মতোই সকলের মধ্যে বিচরণকারিণী মা। এক এক নামে তাঁর পরিচিতি, এক এক রূপেও দৃশ্যমানা তিনি। অমুকের মা কিংবা অমুকের গর্ভধারিণী —তমুক বালা, কি তমুক সুন্দরী,—যে নাম, যে পরিচয়ই তিনি বহন করুন, তিনি সেই একই অখিল মাতা —'সবার মা'—বড় মিষ্টি মা শ্রীশ্রীসারদা। জগতের যাবৎ স্ত্রীমূর্তি তো জগন্মাতারই এক এক মূর্তি : "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" (—শ্রীশ্রীচণ্ডী,—১১।৬)

এক এক পার্থিব মা —সেই সমষ্টি-মায়েরই বিভিন্ন রূপ। পার্থিব মাতৃ-প্রতিমা ভেঙ্গে গেলেও, সেই মহামায়ী সমষ্টি মাতৃত্বেই বিলীনা থাকেন। সন্তানের আর্তি ও আকুতি অনুযায়ী তাঁকে প্রয়োজনে ঠিকই পাওয়া যায়—আবার সুকৃতি থাকলে সমষ্টি-মাতৃত্ব স্বয়ংই স্বরূপে সন্তানের অনুভূতিতে এসে ধরা দিয়ে থাকেন। শ্রীশ্রীমা সারদা সাকার সমষ্টি-মাতৃত্ব,—তা তিনি শরীরিণী অবস্থাতেও যেমন সত্য, আবার তাঁর শরীরের অপ্রকটাবস্থাতে, অশরীরিণী অরূপেও তেমনই সমান অনুভবনীয়। কেবলমাত্র সন্ন্যাসী সুদিনকৃষ্ণ, সেই অজ্ঞাত অখ্যাত মুস্লিম তরুণ, শিশু গয়ানাথ প্রমুখরাই আমাদের চাক্ষুষ উদাহরণ নয়,—এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আমাদের গোচরে রয়েছে, যাতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বাবগাহী মাতৃত্বের দ্যোতনা অত্যন্ত সহজভাবে ব্যক্ত।

* * *

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মাতৃত্ব-বিভাব পরিবিস্তৃত ভূমণ্ডলের সর্বত্র—সর্বজীবে। কোনও দেশে বা কালে কদাপি তা গণ্ডিবদ্ধ ছিল না, এখনও নেই,—কোনও জাতি-ধর্ম-বর্ণের মধ্যেও তা সীমাবদ্ধ নয়। শ্রীশ্রীমা যখন স্থূল দেহে প্রকট ছিলেন তখনও তাঁর এই মাতৃভাব এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ত যে, নিকটবর্তী জনের কাছে সেটাও অত্যন্ত বিস্ময়কর ও নিদারুণ শিক্ষাপ্রদ মহৎ ঘটনা বলে উদ্ভাসিত হত,—তাঁরা চমকিত হতেন, নির্বাক হয়ে যেতেন। স্বামী তারকেশ্বরানন্দ জানিয়েছেন—একবার কোনও বিশিষ্ট স্বদেশভক্ত কর্মীকে লক্ষ করে মা বলেছিলেন : "ছাখ, তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে যে যা ইচ্ছে কর, কিন্তু তারাও তো আমার ছেলে বটে।" উল্লেখ বাহুল্য, 'ভাইয়ে ভাইয়ে' কথায় মা ইঙ্গিত করছেন তাঁর ইংরেজ সন্তান ও ভারতীয় সন্তানদের। আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শ ও তত্ত্বের কথা কতো শত মহাপুরুষদের মুখে শুনে আসছি, নিজেরাও বলে

থাকি। কিন্তু আমরা কি একক্ষণের জন্যও চিন্তায় আনয়ন করতে পারি যে, আমরা একই মায়ের সন্তান? এবং এই সর্ববিবাদ-সমন্বয়কারী শুভ ভাবনার মূল উৎসটি কোথায়? স্বয়ং বিশ্বজননী নিজেই খেদোক্তি করেছেন, 'তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে যে যা ইচ্ছে কর'! অন্ততঃ যদি আমাদের এটুকুও মনে থাকত যে, আমাদের বিবাদ-বিরোধ যেন প্রকৃত ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর মনান্তর বা মতান্তর পর্যায় পর্যন্তই থাকুক,—শত্রুর সঙ্গে শত্রুর হিংস্র বিদ্বেষে যেন না গড়িয়ে যায় হিংসার ও প্রতিহিংসার পাশব লড়াই না হয়ে ওঠে!! শ্রীশ্রীমায়ের মুখের অতি ছোট্ট একটি অভিব্যক্তি—কিন্তু কী তীক্ষ্ণ শাণিত স্নেহ-শর, যা অতি বড় বলদর্পীর হৃদয়কেও বিদ্ধ করে, তার সহিংস তেজ ও অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে সক্ষম! কিন্তু হায়, আমরা কি মায়ের সে-কথা স্মরণ রাখি? বিশ্ব-সংসারের ইতিহাসে এই সর্বাবগাহী মাতৃত্ব সত্যই অনবদ্য। এমন মাতৃমূর্তি সৃষ্টির মাঝে নিরুপমা।

"মা জগদম্বে! জগতের কল্যাণ কর।"—এই ছিল শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠে উচ্চারিত নিত্যকার প্রার্থনা। প্রতিদিন ভিজা বসনে দাঁড়িয়ে, যুক্তকরে, অস্ফুট স্বরে এই মিনতিই নিবেদন করতেন,—কে জানে কার উদ্দেশে? জগতের মায়ের প্রার্থনা জগৎ-অম্বা বিশ্বেশ্বরীর কাছে!! নিরন্তর জগৎময় তাঁর সন্তানদের জন্য কল্যাণ-ভাবনা সমীপবর্তীদের কাছে দেবী সারদার জগন্মাতৃত্বের গূঢ় স্বরূপটিকেই প্রকট করত। এবং সে-আত্মপ্রকাশও ছিল অত্যন্ত সহজ ও অনাড়ম্বর। কোনও প্রকার লৌকিকতার সামান্যতম বিধি-বিধানও অনুপস্থিত থাকত সেখানে। মায়ের বিশেষ অনুরক্ত সেবক সন্তান ডাক্তার কাঞ্জিলাল। তাঁর সহধর্মিনীও ছিলেন মায়ের আশ্রিতা কন্যা। কলকাতায় একদিন বিকেলে মা তখন একা বসে, হাতে জপমালা। মাকে জপনিরতা দেখেও ডাক্তার কাঞ্জিলালের স্ত্রী এসে চরণে ভূমিষ্ঠ হন। মা সস্নেহে তার মুখের পানে তাকাতেই, কাঞ্জিলাল-গৃহিণী করজোড়ে প্রার্থনা জানালেন, "মা, আশীর্বাদ করুন, আপনার ছেলের যেন উপায় হয়।" শুনেই মা তৎক্ষণাৎ ভৎ'সনার সুরে বলেছিলেন: "বৌমা, এমন আশীর্বাদ করব আমি? —সকলের অসুখ হোক্, কষ্ট পাক? আমি তো তা করব না মা। সকলে ভাল থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক্ মা।" (দ্রষ্টব্য: 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী'—অক্ষয়চৈতন্য, পৃষ্ঠা ১১৭)

এখানে লক্ষণীয়, অতি স্নেহের পাত্রের জন্যও তিনি পক্ষপাত বা বৈষম্যসূচক কোনও প্রকার আশীর্বচন উচ্চারণ পর্যন্ত করলেন না! তিনি যে জগতের মা,—তাঁর দৃষ্টিতে সকল সন্তানই সমান। একজনকে অনুগ্রহ করতে, অন্যকে নিগ্রহ

প্রদর্শন তিনি করতেই পারেন না,—করেনও নি কখনও। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কৃপা-কৃতার্থ সন্তান ছিলেন। বাহ্যতঃ তাঁর মুখে এরূপ কঠোর বাক্য শুনে, কারও মনে হ'তে পারে যে মা তাঁর ছেলেটির প্রতি কৃপা-বিমুখ ছিলেন বোধ হয়। কিন্তু সেটাও যে কতো বড় ভ্রান্ত ধারণা, তা ভাষায় বিচার্য নয়। একটিমাত্র ঘটনার স্মৃতিই এখানে যথেষ্ট,—ডাক্তার কাঞ্জিলাল কিরূপ আধার ছিলেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ তাঁর প্রতি কী পরিমাণ ছিল তা উপলব্ধির পক্ষে। আরও অবধারণ করা যাবে, যিনি স্বতঃই আশিস্‌বর্ষী তিনি কোনও প্রকার উমেদারি, সুপারিশ অথবা আবেদন-আর্জির অপেক্ষা করেন না। তিনি তাঁর স্ব-স্বভাবগুণেই যার যেমন পাত্র, তাকে তেমনই দিয়ে থাকেন। যদি কাউকে না-দেন, তো সেটাও তারই মঙ্গলের জন্য। পাত্র যদি দূষিত থাকে, তাতে দুধ ঢাললে দুধই কেটে যায়। ছিদ্রযুক্ত পাত্রে কিছু দেওয়া হলে, তাও বিনষ্ট হয়ে যায়—অস্থানে পড়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু পাত্রের উপযুক্ততা অনুযায়ী মা দেবার জন্যই সদা ব্যস্ত থাকেন,—দিয়েই চলেন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যথা প্রয়োজন।

১৩১৪ সাল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল মাতৃসকাশে জয়রামবাটীতে তখন। তিনি যখনই জয়রামবাটীতে যেতেন, তখনই তিনি বহু ওষুধপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। ঘুরে ঘুরে অসুস্থ গ্রামবাসীদের ঘরে যেতেন,—মায়েরই স্বগণ ঐসব গ্রামের মানুষজন, এই বুদ্ধিতে তিনি পীড়িতদের সেবা করতেন—ওষুধ-পথ্যাদিও দিতেন। বহু অসুস্থ স্ত্রী-পুরুষ অনেক দূরপথ পায়ে হেঁটে মায়ের বাড়িতে আসত—ডাক্তার দেখাতে। ডাক্তার কাঞ্জিলালের নাম তখন গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফিরত। শ্রীশ্রীমা তখন নিজ সন্তানের এ-হেন সেবাপরায়ণতা দেখে এতোই প্রসন্না হয়েছিলেন যে, কাঞ্জিলাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "আমার গুণী ছেলে এসেছে,—লোক আসবে না?"

কিছুদিন এইভাবে মায়ের তথা মায়ের আশ্রিত পল্লীবাসী নর-নারীর সেবাদি কার্যান্তে ডাক্তার কাঞ্জিলাল যখন কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা তখন স্বয়ং তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ও যাত্রাপথে আশিস্ সিঞ্চন করেছিলেন—গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরে বহু দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে পথ হেঁটে। উল্লেখ বাহুল্য, এই কাঞ্জিলাল শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত চিকিৎসকরূপেও বৃত হয়েছিলেন—এবং সেই সুবাদে, মায়ের সেবার দুর্লভ সুযোগলাভে ধন্য হয়েছিলেন বহুতরভাবে।

মায়ের এমন পরম স্নেহের 'গুণী' ছেলের জন্যও তার স্ত্রীর উমেদারিকে মা স্বীকার করেন নি,—ডাক্তার ছেলের ভাল উপায়ের জন্য, মা তাঁর অসংখ্য ভক্ত

ছেলে-মেয়েদের পীড়ার ব্যবস্থায় সায় দেন নি মোটেই। তিনি তো শুধু কাঞ্জিলালেরই মা নন,—তিনি যে জগতের মা,—সারা বিশ্বে অগণন তাঁর সন্তান। এই কারণেই তো প্রকৃত অর্থে তিনি মাতা – পরিমাতা – পরিমাণ-প্রণেত্রী।

আমরা একটু আগেই স্মরণ করেছি,—ইংরেজরাও যে মায়েরই ছেলে—তাঁরাও মায়ের সমান স্নেহ-কৃপার ভাগী তা' তাঁর এক উক্তি থেকে স্পষ্টই বুঝেছি। না, মাত্র একদিনের উক্তি থেকেই নয়, আরও এমন অনেকবারই এমন কথা মা ব্যক্ত করেছেন, যাতে আমাদের ধারণা খুবই সত্য বলে দৃঢ়মূল হয়েছে যে, মায়ের দৃষ্টিতে আদৌ কোন ভেদ ছিল না জগতের সকল জীবের, সব সন্তানের প্রতি। মাতৃ-দৃষ্টিতে যথার্থই সমভাব—সাম্যের দ্যোতনা সুপ্রকট ছিল চিরদিন। শ্রীশ্রীমায়ের ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচর সেবক পূজনীয় রামময় মহারাজ—স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর মুখে আমরা শুনেছি যে, একবার কয়েকজন মায়ের বিপ্লবী-সন্তান ইংরেজদের অত্যাচারের অবিচারের নানা রকম দুঃসহ বর্ণনা মায়ের কাছে এসে দিয়ে যাচ্ছিলেন। মাও সেই সব মর্মন্তুদ্ বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন,—তাঁর নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল। সুযোগ বুঝে এবং পরে অধৈর্য হয়ে তাঁরা সমবেত কণ্ঠে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন : "মা তুমি একটিবার মুখ ফুটে বলো, 'ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক্'।" বিপ্লবকর্মী ঐসব সন্তানদের নিদারুণ অন্তর্ঘাতনাকে বিশ্বমাতা নিজ হৃদয়ে অনুভব করলেও কিন্তু মুখ ফুটে তাঁরই অপর সন্তানদের উদ্দেশে অভিসম্পাতবাক্য উচ্চারিত হয়নি। পরন্তু গভীর আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিলেন : "আমি মা হয়ে ওদেরকে উচ্ছন্নে যেতে কি করে বলবো ? ইংরেজ কি আমার সন্তান নয় ? আমি বলি, সকলেরই কল্যাণ হোক্।"

এই-ই হল সত্যিকার মাতার অন্তরের কথা—মাতৃপ্রাণের ব্যঞ্জনা—স্পন্দিত মাতৃবক্ষের অনুরণন। এখানে মনে আসে, সমতুল্য আর একটি স্মৃতিকথা। স্বামী ঈশানানন্দ—বরদা মহারাজ মায়ের একনিষ্ঠ সেবক। একবার দুর্গাপূজা উপলক্ষে তাঁর উপর জয়রামবাটীতে সকলকে দেবার জন্য কাপড় কেনার ভার ছিল। তখন স্বদেশী আন্দোলন চলছে সারা দেশব্যাপী। তরুণ বরদাও তদানীন্তনকালের হাওয়াতে স্বাজাত্যবোধে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ ছিলেন,—স্বাদেশিকতার প্রেরণায় তিনি কাপড়গুলি সবই দেশী তাঁতের কিনে আনেন। বিলাতী-বর্জন তখনকার দিনে স্বদেশপ্রেমের একটা মূল নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাই হোক, মিহি বিলাতি বা মিলের কাপড় না দেখে, মায়ের বাড়ির অনেকেই একটা চাপা গুঞ্জন শুরু করে দিয়েছিল,—মোটা দেশী কাপড় কারও পছন্দ হয়নি। বরদার স্বদেশ-প্রীতি তাতে

আহৃত হয়। উত্তেজিত হয়ে তিনি ঐ গুঞ্জনের প্রতিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, "ওসব বিলিতি। কেন আনব সে-সব? ও আবার কি কিনব?" শ্রীশ্রীমায়ের কানে এ-কথা চলে যায়। তিনি হাসতে হাসতে উত্তেজিত সন্তান বরদাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন: "বাবা, ওরাও (বিলাতের লোকরাও) তো আমার ছেলে। আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি আর একরোখা হলে চলে? এরা যেমন যেমন বলছে, তাই সব এনে দাও।"

বর্তমান প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ও লক্ষণীয় সংযোজন আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বামী ঈশানানন্দজী তাঁর 'মাতৃসান্নিধ্যে'-গ্রন্থে। সেখানে তিনি লিখেছেন,—

"পরে দেখিতাম কাহারও জন্য কোন বিলিতি দ্রব্য আনিতে হইলে আমাকে না বলিয়া মা অপরকে দিয়া আনাইতেন। কাহারও ভাবে আঘাত দেওয়া তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল।"

শ্রীশ্রীমায়ের এই পরমত-সহিষ্ণুতা ও সামঞ্জস্য-সাধনপ্রিয়তা তাঁর বিশ্বমাতৃত্বকেই সূচিত করে। তিনি যে সত্যিকারের মা, পাতানো মা নন্—দূর ও নিকট সবারই মা,—পরস্পর বিবদমান হলেও সকলেই তো তাঁর সন্তান। তিনি ত্যাগ করবেন কাকে? কেউ কোলে, কেউ পিঠে,—কেউবা খেলায় মত্ত, কেউ বা কলহে রত,—কিন্তু মায়ের দৃষ্টির বাইরে কেউই নয়।

* * *

মা—তিনি সারা বিশ্বের মা। তাঁর কাছে স্বদেশ-বিদেশ কোনও ভেদ ছিল না—বিশ্বসংসারময় মায়ের সন্তান-সন্ততি। শ্রীদুর্গাপুরী দেবীর কথা থেকে জানা যায়, কোনও দেশপ্রেমিক ভক্তের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে, শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন: "কে স্বদেশী, আর কে বিদেশী, তা' আমি কি জানি! সবাই আমার কাছে সমান, সবাই আমার ছেলে। মা বলে কাছে এসে দাঁড়ালে সব্বাইকে আমি আশীর্বাদ করি।"

একটা কথা এখানে স্পষ্ট যে, শ্রীশ্রীমা সারদা তদানীন্তন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রেরণাদাত্রী হয়েও কিন্তু ইংরেজ বা অন্য কোনও জাতির প্রতি কদাপি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তিনি মনে-প্রাণে ভারতের পরাধীনতা-শৃঙ্খল মোচন চাইলেও,—ইংরেজ অপশাসনের অবসান কামনা করলেও, ইংরেজ-জাতি সম্পর্কে কখনোই কোনও রকম মমত্বহীনতা তাঁতে ছিল না। মা সদা সর্বদাই ইংরেজদের



ভারত মাতা

শিল্পী ঃ অসিত হালদার

শ্রীমতী অতসী বড়ুয়ার সংগ্রহ থেকে
শ্রীগৌতম হালদারের সৌজন্যে।

প্রতিও সমান স্নেহশীলা ছিলেন,—নিজ সন্তান বলেই জানতেন ও ব্যক্ত করতেন। অথচ, ইংরেজদের অপকীর্তিকে বা খলতাকে,—কিংবা তাদের প্রজাপীড়নকে বা স্বৈরাচারকে মা তাঁর বজ্রহস্তে প্রতিবোধ করেছেন—এমনকি ইংরেজ-শাসনের অবসানও কামনা করতেন মনে-প্রাণে। এখানে তাঁর জননী-মূর্তি ছিল যেন প্রকৃতই যুগপৎ পালিনী ও লয়কারিণী কালীরূপা—একাধারে বরাভয়া ও অসিমুণ্ডকরা। একরূপে তিনি নিরন্তর স্নেহসুধা বিতরণে পাগলিনীপ্রায়ঃ "শুভ্র শশী যেন হাসিরাশি, যত স্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাধামে॥" আবার অন্যরূপে সন্তান শাসনরতা কঠোরা উন্মত্তাঃ "পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় বেগে॥" কবি মহর্ষি বিবেকানন্দ মাকে এই দ্বিমূর্তিতেই উপলব্ধি করেছিলেন—তাই তাঁর মাতৃরূপ-চিত্রণের ভাষাও ছিল এই রকমই।

করুণা ও কোপ—মায়েরই দুই বিভাব[১]। এই দ্বিরূপিণী জননীতত্ত্বের দ্যোতনাই মহাকাল-কৃত স্তবে আমরা পাই। সেখানে মাকে স্তুতি করা হচ্ছে এই বলেঃ হে জননী, তুমি সংসারকে প্রসব কর, পালন কর, আবার প্রয়োজনে (প্রলয়কালে) নিজের সৃষ্টিকে নিজেই সংহার করে থাক।

"প্রসূতে সংসারং জননী ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।"

বর্তমান গ্রন্থের 'মায়া ভগবতী তুবি'—এই অনুধ্যান-পর্বে উত্থাপিত প্রসঙ্গের বিশদ আলোচনা হয়েছে। ('প্রকৃতিং পরমাং'—প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১৩-২৩ দ্রষ্টব্য।) ধরায় প্রকটিতা রক্ত মাংসের মাতৃ-মূর্তিতেও তাঁর অতিলৌকিক দেবী-স্বভাব সর্বদাই বিলুপ্ত থাকে না,—বরং প্রকাশ হয়েই পড়ে ছোট-বড় অনেক উপলক্ষেই। এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি—এটাই লক্ষণীয়।

'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত স্মৃতিচিত্রগুলি থেকে আমাদের কাছে আজ এ-কথা দিবালোক অপেক্ষাও সুস্পষ্ট যে, মা কেবলমাত্র ইংরেজ সরকারের কেন, তাঁর অশেষ কৃপাধন্য আশ্রিত ব্যক্তিরও অন্যায় ও দুর্নীতি-

১ অবনীন্দ্র-শিষ্য প্রখ্যাত শিল্পী অসিত কুমার হালদার ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতমাতা'-র যে চিত্ররূপ অঙ্কিত করেছেন, সেটি আমাদের কাছে গভীর অর্থবহ ও ভাবদ্যোতক এবং আলোচ্যমান প্রসঙ্গে বিশেষ তুলনীয়। সর্বাগ্রে চিত্রিত মুখমণ্ডলে মা-সারদারই আশ্চর্য সমরূপতা, —সেই মাথায় ঘোমটা, সদৃশ মুখের আদল এবং সেই আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তির বাম করদ্বয়ে অন্ন ও বস্ত্র, দক্ষিণ দুই করে ত্রিশূল ও খড়্গ—করুণা ও কোপ এই বিভাবের ব্যঞ্জনা,—যুগপৎ পালন ও লয়ের সূচক।

পরায়ণতাকে তীব্রভাবে শাসন করেছেন। আমরা মায়ের শ্রীমুখোচ্চারিত "ওরাও তো আমার সন্তান" ইত্যাদি যেমন বহু প্রসঙ্গে শুনেছি, তেমনই আমরা অবগত আছি মায়েরই গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস সহ সকরুণ খেদোক্তিঃ "হে ঠাকুর, আর কতদিন তুমি এই সরকারের অনাচার সইবে?" স্বদেশী বিপ্লবের অভিযোগে অন্তরাবদ্ধ মায়ের আশ্রিত সন্তান শ্রীসুরেন করের আত্মহত্যার সংবাদ শুনেই ঐ মন্তব্য স্বতঃ উৎসারিত হয়েছিল মায়ের মুখে। পুলিশী বর্বরতা ও নির্যাতন অসহ্য হওয়াতেই সুরেন করের ঐ আত্মহত্যা। স্বামী সারদেশানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা'-তে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১৫-১৬):

"সেই সময়ে দেশের অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক। বৃটিশ গবর্নমেণ্টের অমানুষিক অত্যাচার লোকের অন্তরে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছে, চারিদিকে পুলিশের কড়া নজর। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধুগণও সন্দেহভাজন বলিয়া বিবেচিত; কোয়ালপাড়া, জয়রামবাটীতে পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই অঞ্চল ম্যালেরিয়া-কবলিত, দুরধিগম্য, অশিক্ষিত গরীব লোকের বাসভূমি, সেজন্য সুস্থ সবল যুবক দেশপ্রেমিকগণকে তথায় অন্তরীণ রাখিয়া সায়েস্তা করার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন। এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক থানাতেই ঐরূপ অন্তরীণ যুবক দেখা যাইত। তাঁহাদের মধ্যে মায়ের স্নেহাশীর্বাদের পাত্রগণও ছিলেন। মায়ের মন তাঁহাদের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিত। কেহ কেহ সুবিধামত পত্র লিখিতেন—সেই সকল পত্রে পুলিশের ছাপ মারা থাকায় দেখিয়া দেখিয়া মা চিনিয়াছিলেন। এইরূপ পত্র পাইলেই মা হাতে করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিতেন সেই পুলিশের ছাপের দিকে। কখনো কখনো দু'-একটি বাক্যে তাঁহার হৃদয়বেদনা ফুটিয়াও বাহির হইয়া পড়িত।"

ইংরেজ-রাজের অত্যাচার ও দমন-পীড়ন যখন তুঙ্গে—দেশের তরুণ-তরুণীদের প্রতি একটা সাধারণ আক্রোশাত্মক নীতিই যখন ইংরেজ শাসনতন্ত্রের প্রায় অঙ্গীভূত, তখন কিন্তু মায়ের স্নেহমধুর কণ্ঠেও তীক্ষ্ণ সত্য ব্যক্ত হয়েছে অতীব অবিশাস্য দৃঢ়ভাবেই। মাকে একটি ছোট্ট কিন্তু জটিল প্রশ্ন করা হয়েছিল একবার—"মা, আজকাল সরকার যে ছেলেদের ধরে ধরে আটক করে রাখছে, এর পরিণাম কি হবে?" মায়ের তাৎক্ষণিক উত্তর ছিল: "...বড় অন্যায়। এর একটা প্রতিকার শীঘ্রই হবে। আর বেশি দিন নয়,—ভাল হবে।"

মাতৃচরণাশ্রয়ী কিন্তু সর্বদাই নির্ভয়,—কি ভারতীয় বা কি বিদেশীয়, মায়ের নিরপেক্ষ সন্তান-দৃষ্টি সকলেরই প্রতি সমান,—এ কথা বহুবিদিত সত্য ও তত্ত্ব। তথাপি বহুবিদিত কথারও পুনরুক্তির প্রয়োজন আছে,—মননের মালাটিকে সুগ্রথিত

করতে। হয়তো বা কোনও রকম রাজনৈতিক কারণেই, অনেক দেশভক্ত যুবক সম্পর্কে, মায়ের কাছে কিছু অনুসন্ধান করতে গেলে, স্পষ্ট উত্তর শোনা যেত :

"কে স্বদেশী, আর কে বিদেশী, তা আমি কি জানি! সবাই আমার কাছে সমান, সবাই আমার ছেলে। মা বলে কেউ কাছে এসে দাঁড়ালে সব্বাইকে আমি আশীর্বাদ করি।" সর্বভূত জননীর অন্তরের গূঢ় ভাষা এইরূপই স্বাভাবিক। অথচ দেশসেবার নামে, কিংবা রাজনৈতিক সন্ত্রাশবাদীদের সহিংস বা হননাত্মক কার্যকলাপ কোনও কালেই জগন্মাতার কাছে প্রশ্রয় তো পায়ই নি,—তথাকথিত সেই বিপ্লবী দেশসেবী মায়ের আশ্রয়ও লাভ করেনি। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রসিদ্ধ মাতৃ-চরিতকার ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যজীর সূত্রে জানা গেছে : "নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের কাজ করলে, আন্দোলন করলে, মা কখনও বিরূপ ভাব দেখাননি—বরং তাদের এলেই মা দীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু তারা দেশসেবার নামে চুরি-ডাকাতি করবে মা তা অ্যাপ্রুভ্‌ (approve) করেন নি।" একটি উদাহরণ :

শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান যদুনাথ মজুমদার একবার চট্টগ্রামের জ্ঞানেন্দ্র বসু এবং একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে শীতল মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় মাতৃ-চরণসমীপে উপনীত হয়ে, ওঁদের দুজনকেই দীক্ষাপ্রদানের জন্য মিনতি জানান মায়ের কাছে। মা উত্তরে বলে দিলেন—নীচে যেয়ে বসতে। মার কিন্তু কারও সঙ্গেই পূর্ব পরিচয় ছিল না,—এবারেও তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি দু'জন আগন্তুক দীক্ষার্থী সম্পর্কে। কিছু সময় পরে, জ্ঞানেন্দ্র বসুকে মা দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে অনুমতি প্রদান করেন, কিন্তু অপর জন অর্থাৎ শীতল সম্বন্ধে মা শুধু নীরব আশীর্বাদই প্রেরণ করেছিলেন। হতাশ শীতলচন্দ্র তখন বাস্তবিকই শীতলতাপ্রাপ্ত। বড় করুণ ছল ছল চোখ নিয়ে সে তথাপি অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় বসেই থেকেছিল সেখানে। দীর্ঘসময় পরে স্বামী অরূপানন্দজী নীচে এসে, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু যদুবাবুকে ওখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে বলেন : "যদু, মা বললেন, আজকাল এমন অনেক ছেলে এসে দীক্ষা নিয়ে যায় যাদের গভর্নমেণ্ট্‌ পরে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে, আর তাদের মা-বাপ দুঃখ জানিয়ে পত্র দেয়।" যদুবাবু এ-কথা শুনেই চমকে উঠেছিলেন,—তিনি জানতেন যে, শীতল তেমন গুরুতরভাবে প্রত্যক্ষ সংযোগ না রাখলেও, সে যাঁর অতি প্রিয় অনুগামী, তার সেই শিক্ষক মশায় ত্রিবেণীবাবু কিন্তু তখন সরকারের কঠোর নজরবন্দী—অন্তরীণ। তিনি এ-সম্পর্কে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হলেন এবং অরূপানন্দজীকে কথা দেন যে, শীতল সম্পর্কে তিনি আরও ভাল করে খোঁজখবর নেবেন—এবং তার পরেই তাঁকে তা

জানিয়ে যাবেন। অরূপানন্দ স্বামীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসে যদুবাবু শীতল সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন,—এবং শীতলকেও অঙ্গীকার করিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সে আর কদাপি ঐ সব গুপ্ত সমিতি বা সহিংস আন্দোলনের সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখবে না। যদুবাবু ফিরে গিয়ে স্বামী অরূপানন্দকে সবই ব্যক্ত করেন। বিশ্বস্ত যদুবাবুর মুখ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে অরূপানন্দজী উপরে চলে যান মায়ের সকাশে। অল্প কিছু সময় বাদে নেমে এসে বন্ধু যদুনাথকে চুপিচুপি জ্ঞাপন করেন—"তুই যদি দায়িত্ব নিতে পারিস্ শীতলের ব্যাপারে, তা'হলে ছেলেটা মায়ের কাছে আশ্রয় পাবে।" যদুবাবু এই কথা শুনে যেন আকাশের চাঁদকে নাগালের মধ্যেই পেয়ে গেলেন। ছুটে যান শীতলের কাছে—তাকে বহুবিধ জেরা-সাবুদ করে সন্তুষ্ট হয়ে পুনরায় মায়ের বাড়িতে এসে পূজনীয় অরূপানন্দ মহারাজকে করজোড়ে নিবেদন করেন—"আমি শীতলের ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য জামিন রইলাম।" উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, মাতৃকরুণার ধারাও বিগলিত হতে অধিক সময় লাগেনি,—শীতলও শ্রীশ্রীমায়ের সুশীতল চরণতলে আশ্রয়লাভে ধন্য হয়েছিল। মা তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।

মায়ের দৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী—প্রজ্ঞার আলো অনন্তভেদী। তাই তাঁতে সাধারণ মনুষ্যমাতার মধ্যে অভিব্যক্ত স্নেহ-ক্ষমা আর বাৎসল্যই মাত্র পরিলক্ষিত হয়নি, শ্রীশ্রীমায়ের করুণাবর্ষণ ও কটাক্ষপাত ছিল সর্বশ্রেয়স্করী—অনেক ক্ষেত্রেই তা সন্তানের প্রিয় প্রেয়প্রদ না হলেও। দেখা গেছে, মা সত্যকার দেশাত্মবোধকে যেমন উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন,—তেমনি 'স্বদেশী ডাকাতি'—উগ্র বিপ্লব কিংবা হিংসাত্মক 'মুক্তি-সংগ্রাম'-মূলক স্বদেশীয়ানাকেও অত্যন্ত কঠোর ভৎর্সনা করেছেন। মা হয়তো-বা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন,—এই তথাকথিত স্বদেশী সহিংস বিপ্লবান্দোলন স্বদেশপ্রেমকে কোথায় কোন্ পরিণতিতে নিয়ে চলেছে! জাতীয়তা-বোধ জাগরণের—যথার্থ দেশাত্মকতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে মা সারদাদেবী তদানীন্তন কালে কতো উজ্জ্বল প্রেরণালোকদাত্রী ছিলেন, তা ধারণায় আনতে সাহায্য করবে, যদি আমরা তৎকালীন (১৩১৩ বঙ্গাব্দের ১০ চৈত্র সংখ্যা) 'স্বরাজ' পত্রিকায় প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-লিখিত একটি নিবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি এখানে। ঐতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে—সমগ্র জাতি তখন অস্থির উদ্বেল। সেই কালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় চঞ্চল অশান্ত দেশবাসীর উদ্দেশে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে লিখেছিলেন ঃ

"যদি তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্ণ-পূজিত লক্ষ্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হইয়া রামকৃষ্ণ—শশিসুধা পান করিও—তোমার সকল পিপাসা মিটিয়া যাইবে।"

উল্লিখিত কিংবা এতাদৃশ আহ্বান তখনকার দেশব্রতী তরুণদের কানে প্রবেশ করে অন্তরের কত দূর গহনে গিয়ে আলোড়ন জাগিয়েছিল, তার উদাহরণস্বরূপ একটিমাত্র আত্মচরিত বিবৃতি থেকে কিছু কথা এখানে পুনরায় আহরণ করছি। স্মৃতি-বিবরণীটি এক বিশিষ্ট জনের—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের। 'উদ্বোধন', বৈশাখ ১৩৬১-সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন :

"স্পষ্ট মনে আছে, ১৯০৭ সালে পুজোর পর একদিন সন্ধ্যায় বাগবাজারে গিয়ে শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শন করি। ঠাকুরঘরে একখানি আসনে মা পা ছড়িয়ে বসেছিলেন, মাথায় অবগুণ্ঠন; মুখের আদলটা একটু দেখা গেল। পর পর প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে এলাম। তখন আমার বয়স তের বৎসর।

... ...

"তখন মার কথার বড় বেশী প্রচার ছিল না! স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে দেশপ্রেমের দীপ জ্বলে উঠেছে। সেই সেদিনের তরুণ সমাজ বঙ্কিম ও বিবেকানন্দকে নূতন করে দেখলো! 'বন্দেমাতরম্' 'সন্ধ্যা' 'যুগান্তর'-এ দেশনায়করা বিবেকানন্দের বাণী প্রচার করতে লাগলেন। এই সময় 'সন্ধ্যা'য় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব একটি প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে লিখলেন, 'হে পাঠক, যদি শোকতাপদগ্ধ জীবনে শান্তি পাইতে চাও, তাহা হইলে একদিন অপরাহ্নে গিয়া সেই করুণাময়ীর পদপ্রান্তে উপবেশন করিও।' —এই প্রবন্ধ পড়ে আমার ভগিনীপতি সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক আমাকে নিয়ে একদিন মায়ের বাড়িতে গেলেন। সে কথা গোড়াতেই বলেছি। পুলিশ রিপোর্টে স্কুল থেকে আমার নাম কাটা গিয়েছিল আগেই। ··

"স্বদেশী আন্দোলনের উজ্জ্বল বন্যায় বাঙলার ভদ্রশ্রেণীর চিন্তার ও চরিত্রের অনেক মালিন্য ধুয়ে গেল—পারিবারিক জীবনের মানুষ সামাজিক কর্মক্ষেত্রে মুক্তি পেল। বলা বাহুল্য নানা উপলক্ষে এর প্রভাব আমার উপরেও পড়েছিল।···এমন সময় একদিন দার্জিলিং-এ স্বামিজীর শিষ্য পুলিন মিত্রের সঙ্গে দেখা। তখন সেনাটরিয়ামে আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলও থাকতেন। একদিন তিনি বললেন,— 'তোর লেখাপড়া কিছুই হল না।···বড় হলে ভদ্র শিক্ষিত সমাজে মিশবি কি করে? তোর বাবা অত বড় পণ্ডিত ছিলেন, আর তুই কি হচ্ছিস, বল্‌ তো?···এক কাজ কর্, একজন বিখ্যাত লোকের সব রচনা পড়ে ফ্যাল্‌,—তারপর পথের সন্ধান

পাবি।'…সে-কথা শুনে পুলিনবাবু বললেন, 'তা ভাল। তবে বিবেকানন্দের বই পড়।'…তিনি স্বামিজীর পত্রাবলী ও জ্ঞানযোগ দিলেন। এ যেন তৃষিত শুষ্ক মাটির উপর নব বরষার বারিধারা। ভূমিতলে নিশ্চেষ্ট বীজে প্রাণসঞ্চার হল ও অঙ্কুরিত বিকশিত হয়ে উঠলো জীবন।…

"‥ এমন সময় কলকাতায় এসে দেখি, বড় দাদা বদলেছেন আশ্চর্য রকমে।… একদিন সন্ধ্যায় নিয়ে গেলেন বাগবাজারে, দোতলার ঘরে মা বসেছিলেন। প্রণাম করতেই বড়দা বললেন,—'এটি আমার ছোট ভাই।' মা মুখাবরণ সরিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন। স্নেহ ও করুণা-হাস্যে অনুরঞ্জিত সেই অপরূপ মুখের দিকে চেয়ে পলকে মনে পড়ল, নিজের মায়ের কথা। মনে আছে, উদ্ধত দুর্বিনীত আমি, যার সামনে দাঁড়াতাম ঋণ-পরিশোধে অক্ষম খাতকের মতো। এ মার মুখের দিকে চেয়ে ঠিক তেমনি ভাবে আমার সমগ্র সত্তা সঙ্কুচিত হয়ে গেল, ভয়ে নয়, ভক্তিতে নয়, এক অনির্দেশ্য লজ্জায়। প্রথম প্রথম একটু বাধা অনুভব করতাম, পরে প্রশ্রয় পেয়ে সঙ্কোচ কেটে গেল।…

"…দেখেছি…শ্রীশ্রীমার অভয় আশীর্বাদের মন্দাকিনী-ধারা। এর একটি দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল, চরিত্রবান হৃদয়বান স্বদেশপ্রেমিক যুবকরা যে সান্নিধ্যে গিয়ে জীবনের গভীর সার্থকতা অনুভব করতো।"

উৎকলিত কথাগুলির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত একটিই সুর : শ্রীশ্রীমা সত্যি সত্যিই সকলের 'নিজের মা'—যিনি স্বরূপে ও স্বভাবে ছিলেন, 'অভয় আশীর্বাদের মন্দাকিনী-ধারা'। সে-মন্দাকিনীর দুর্বার আকর্ষণ তৎকালীন ভারতের 'স্বদেশপ্রেমিক' প্রায় সকল তরুণই অন্তরে উপলব্ধি করে তাঁদের স্ব-স্ব জীবনের 'গভীর সার্থকতা' ও ভিন্নতর লক্ষ্যকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বিশেষ লক্ষণীয় আরও একটি অপ্রত্যাখ্যেয় ঐতিহাসিক তথ্য আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে : ঐ কালের সমাজ-চিত্তে বিবেকানন্দ-তড়িৎশক্তি কেমনভাবে ক্রিয়ান্বিত হয়েছিল,—ক্রমবর্ধিষ্ণু যার তেজে প্রায় গোটা তরুণ ভারতই সমিদ্ধ সন্দীপ্ত তখন।। তেজস্কর সেই সমিন্ধনকে সৌলক্ষণ্য ও কল্যাণরূপ প্রদান করেছিল সেই শ্রীশ্রীমায়েরই 'অভয় আশীর্বাদের মন্দাকিনী-ধারা'।

* * *

জানা যায়, আলিপুরের বোমার মামলায় জড়িত শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ যখন তাঁর

অনুগামীদের সহ বন্দী হয়েছিলেন—রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোতে নেতৃত্ব-প্রদানের অভিযোগে ('১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২ মে),—তখন তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ শোকে ও ত্রাসে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন, এমনকি সিদ্ধান্ত করে ফেলেছিলেন, এই রকম পতিহীনা অবস্থায় বেঁচে থাকা অপেক্ষা মরণই ভাল। কেননা তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর অভিযুক্ত স্বামীর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সতীর্থ শ্রীদেবব্রত বসু—উত্তরকালে যিনি রূপান্তরিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবস্নাত মনীষী সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ—তাঁরই সুযোগ্যা ভগিনী, শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিতা সুধীরা দেবী, পতি-শোক-বিধুরা মৃণালিনীকে সঙ্গে করে বাগবাজারে মায়েরই চরণপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। সুধীরা দিদি মাকে আর্তি নিবেদন করেছিলেন, ব্যথাচঞ্চলা মৃণালিনীর জন্য। সমস্ত ঘটনা মা অতিশয় সহানুভূতির সঙ্গে শুনেছিলেন এবং পরিশেষে মৃণালিনীকে অশেষ কৃপাসিক্ত মিষ্টি কথায় আশ্বাস প্রদান করেছিলেন। বলেছিলেনঃ "চঞ্চল হয়ো না মা, চাঞ্চল্যে কিছুই লাভ নেই। তোমার স্বামী শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রিত,—ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি অতি সত্বর নিষ্পাপ প্রমাণে মুক্ত হয়ে ফিরে আসবেন।" অরবিন্দ-পত্নী মৃণালিনীকে মা মানসিক শান্তির জন্য 'সব সময় ঠাকুরের বই' পড়তে বলে দিয়েছিলেন। তদনুসরণে মৃণালিনীও প্রতিদিন মধ্যাহ্নে কথামৃত পাঠ করতেন। (দ্রষ্টব্য : 'শ্রীঅরবিন্দের সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবীর স্মৃতিকথা'—শৈলেন্দ্র নাথ বসু)

অরবিন্দ স্বয়ং কারামুক্ত হয়ে সস্ত্রীক বাগবাজারে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণবন্দনা করে এসেছিলেন, সে-কথাও আজ আর অজ্ঞাত নেই। অরবিন্দের সুহৃদ, প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার ছিলেন ইতিমধ্যেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কৃপাশ্রিত সন্তান। মজুমদার মহাশয় 'উদ্বোধন' ৪৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যায় অরবিন্দের শ্রীশ্রীমাকে দর্শন প্রসঙ্গে একখানি জীবন্ত চিত্র পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন :

"অরবিন্দবাবু একাকী নহেন, সস্ত্রীক শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে প্রণাম করিতে উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন। এই ঘটনা তাঁহার চন্দননগর যাইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল।...আমার বিশ্বাস এই দেবী দর্শনের ফলে তাঁহার যাত্রাপথ ও সাধনপথ বিঘ্নমুক্ত হইয়াছিল।

"...আমি আসিয়া পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজীকে জানাইলাম, 'অরবিন্দবাবু শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীকে প্রণাম করিতে আসিতে চান।' তিনি বলিলেন, 'লইয়া আইস'। কুমার অতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ঘোড়ার গাড়ি লইয়া আমি কৃষ্ণকুমার বাবুর বাড়ি গেলাম। এই সময় অরবিন্দবাবুর স্ত্রী ওখানে থাকিতেন। অরবিন্দ

বাবু প্রস্তুত ছিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ও তাঁহার স্ত্রী গাড়িতে আসিয়া বসিলেন।...অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা উদ্বোধন আপিসে আসিয়া পৌছিলাম। অরবিন্দবাবু সস্ত্রীক উপরে গেলেন। সেদিন গৌরীমাও উপস্থিত ছিলেন। উভয়ে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং উপদেশ দিলেন। অরবিন্দবাবু চৌকাঠের বাহিরে আসিলে গৌরীমা তাঁহার চিবুক ধরিয়া স্বামিজীর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, 'যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়/হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ'-জগতে নাহি তব স্থান ॥' অরবিন্দ বাবু কম্পিত পদে কতকটা ভাবস্থ হইয়া নীচে আসিয়া শরৎ মহারাজের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন।...শুনিয়াছিলাম, অরবিন্দবাবুকে দেখিয়া শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'এইটুকু মানুষ, এঁকেই গবর্ণমেণ্টের এত ভয়!' আরও শুনিয়াছিলাম যে, মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার বীর ছেলে।' আমরা যখন গাড়িতে উঠি তখন কৃষ্ণবাবু (বেদান্তচিন্তামণি)[১] উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন।"

অরবিন্দ-সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী ছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহের পাত্রী—তাঁর প্রশংসায় মা মুখর ছিলেন। মায়ের উক্তি: "অরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিণী বেশ মেয়েটি -- খুব সরল।" শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মৃণালিনীর দীক্ষালাভের সংবাদ অরবিন্দ পেয়েছিলেন পণ্ডিচেরিতে.—পরে মন্তব্য করেছিলেন: "I was glad to know that she had found so great a spiritual refuge."—আমার আনন্দ হয়েছে জেনে যে, সে এতো মহৎ এক আধ্যাত্মিক আশ্রয় পেয়েছে।

এখানে মনে পড়ছে, মাণিকতলা বোমার মামলার অন্যতম আসামী ষোড়শ বর্ষীয় বালক খুলনার বিজয়কুমার নাগও একদিন রামচন্দ্র মজুমদারের অনুপ্রেরণায় বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে এসেছিল। শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে উপনীত হয়েই দেখে—তিনি মাথায় ঘোমটা টেনে দণ্ডায়মান। তেজস্বান বীরভক্ত বিজয়কুমার অমনি নির্ভয় কণ্ঠে বলে উঠেছিল: "আমি তোমাকে দেখতে এলুম, তুমি যে মুখ ঢেকে রইলে।" মা তৎক্ষণাৎ মাথার ঘোমটাকে সরিয়ে দিয়ে, স্মিত-স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত সহ তার চিবুক ধরে আদর করেছিলেন। মাতৃকরস্পর্শে বিজয়কুমারের ধমনীতে

---

১ অরবিন্দ-সম্পাদিত 'Bande Mataram' (বন্দে মাতরম্) পত্রিকার সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণ ঘোষ, বেদান্তচিন্তামণি "Sri Aurobindo—An Episode of his life" শিরোনামে একটি, নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন ,Hindustan Standard' আনন্দবাজার সংস্থার তৎকালীন ইংরেজী দৈনিকে (June 5, 1945)। তাতেও অরবিন্দের মাতৃ-সকাশে গিয়ে দর্শন-লাভের বিবরণী প্রকাশ করেছেন।

শোণিতপ্রবাহ অন্য খাতে বইতে শুরু করেছিল সেদিন থেকেই,—তার জীবনধারার তেজঃশক্তিকেও অন্তর্মুখ গতি প্রদান করেছিল মায়েরই একক্ষণের করুণা-নয়ন-সম্পাতে। (দ্রষ্টব্য—অক্ষয়চৈতন্য-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী'।)

আমরা এ-কথাটিই ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হচ্ছিলাম যে, মায়ের স্নেহ ছিল অকৃপণ, উদার, সর্বাবগাহী এবং সর্বৈব পক্ষপাতহীন,—সর্বশ্রেয়স্করী। আপাত নজরে তা কারও কাছে বৈষম্য-রেখাযুক্ত কিংবা ভেদসূচক বলে প্রতিভাত হলেও, আখেরে কিন্তু ঐ নজরই দোষমণ্ডিত বলে প্রমাণিত হয়েছে বার বার। স্বদেশী-আন্দোলনকে মোড় ঘুরিয়ে যথার্থ দেশমাতৃভক্তিতে পরিশোধিত নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন শ্রীশ্রীমা-ই,—এবং তা করেছিলেন অত্যন্ত নীরবে সন্তর্পণে ও সবার অগোচরে – কোনও প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, বাক্‌চাতুর্যে নয় নিতান্তই শান্ত এক ঝলক দৃষ্টিপাত, অথবা কোমল সুস্নিগ্ধ স্পর্শ-প্রদান সহায়ে। দেশপ্রেমিক, 'মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত' সন্তানের দল তখন এককভাবে কিংবা জোটে এসে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে যেতেন—প্রকাশ্যে, কখনও বা গোপনে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের পরবর্তী কালে—যখন আলিপুর বোমার মামলার ছেদ ঘটেছে, তখন যেন সহসা এক প্রবল ভাববন্যা এসেছিল—সে-বন্যা বাস্তবিকই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বন্যা,—যার সাকারা প্রবাহিনী ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা।

ভগিনী নিবেদিতার লেখা এই কালের পত্রগুলির মধ্যে আমাদের উক্ত মন্তব্যের প্রভব-সূত্রকে খুঁজে পাওয়া যাবে। কুমারী জোসেফিন্ ম্যাকলাউডকে একখানি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন ৫আগস্ট, ১৯০৯: "The Holy Mother is PERFECT. Bo came last night, to touch her feet. Wasn't this nice ? All the great nationalists do it now—all recognise that the call came through Swamiji—and when I said the other day—'Mother, the day foretold by S. R. K when you would have too many children, is almost here—for the whole country is yours !' She said 'I am seeing it'."—শ্রীশ্রীমা হচ্ছেন পূর্ণা। বো (অবলা বোস) গতরাত্রে এসেছিলেন তাঁর চরণ স্পর্শ করতে। কী শুভ ইঙ্গিত! সকল মহান জাতীয়তাবাদীই ইদানীং এই কর্ম—মায়ের চরণ স্পর্শ করে থাকেন। সবাই এখন মানছেন যে, এই প্রেরণা আসছে স্বামিজীরই মাধ্যমে। আর আমি একদিন যখন বলেছিলাম, 'মা, শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলে গিয়েছিলেন, তোমার অনেক অনেক সন্তান হবে,—তা' বোধ হয় সত্য হচ্ছে এখন,—সারা দেশই এখন তোমার !"

শ্রীশ্রীমা উত্তর দিয়েছিলেন—'আমিও তাই দেখছি'। (দ্রষ্টব্য : 'Letters of Sister Nivedita', Compiled by Sankari Prasad Basu, Vol. II, Nababharat Publishers, pp, 990।)

উল্লিখিত পত্রের আরও কয়েকদিন বাদেই অজ্ঞাতনামা অন্য একজনকেও ভগিনী নিবেদিতা ঐ একই কথা লিখেছেন। পত্রের তারিখ ১১ আগস্ট ১৯০৯। সেখানেও বলেছেন : কী অদ্ভুত এক পরিবর্তনের জোয়ার সারা দেশময়। সকলেই নিজেকে বলছে স্বামিজীর শিষ্য। অসংখ্যের মাঝে তিনি এক !!! সেদিন শ্রীশ্রীমাকে আমি বলেছিলাম, 'সেই দিন আগতপ্রায়, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিশ্রুত তোমার অজস্র ছেলেমেয়ে হবে! সমগ্র ভারতই তোমার সন্তান।' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—'দেখছি তো তাই-ই'।—"Such a change has come over the country. All call themselves disciples of Swamiji. He amongst the number !!! The other day I said to the Holy Mother, 'The time is very near that was promised by S. R. K. when you should have too many children. The whole India is yours !' She answered 'I am seeing it.!' "

('Letters of Sister Nivedita', Vol. II, pp. 995)

ভগিনী নিবেদিতার অপর একখানি চিঠি—যা তিনি সম্ভবতঃ শ্রীমতী ওলি বুলকে লিখেছিলেন, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে—তা' থেকেও কিছু উৎকলিত না করে পারা যায় না এই প্রসঙ্গে। এখানেও তিনি একই উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করেছেন, যা' আমাদেরও হৃদয়তন্ত্রীতে একটিই মাত্র ঐতিহাসিক সত্যকে অনুরণিত করে : শ্রীশ্রীমাই ভারতীয় মুক্তি সাধকদের সকলের আরাধিতা শক্তিমূর্তি ছিলেন। নিবেদিতার ভাষা : "...And everyone says now that the Swamiji was the source of the new ideas and they come to touch the feet of the Holy Mother and Saradananda will not consent for any reason to turn away !! Isn't this wonderful ?"—প্রত্যেকেই এখন স্বীকার করছে যে, স্বামিজীই হচ্ছেন এই নব-আলোড়নের উৎসকেন্দ্র। সবাই এসে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে নত হচ্ছে। আর 'স্বামী সারদানন্দ (ব্যাপারটি ঘোরতর রাজনৈতিক বিপদসঙ্কুল হওয়া সত্ত্বেও) কাউকেই বাধা দিচ্ছেন না। দারুণ আশ্চর্যজনক কাণ্ড নয় কি?

('Letters of Sister Nivedita', Vol II, pp. 1000)

*   *   *

উত্তরকালীন আরও প্রচুর ঘটনাচিত্রকে আমরা স্মরণার্হ মনে করছি,—যা' থেকে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়েছে যে, শ্রীশ্রীমায়ের চরণপাতে ভারতের স্বাধীনতার্জন-যজ্ঞ সত্য সত্যই এক পুণ্য আহবে রূপান্তরিত হয়েছিল। সুখ্যাত 'বাঘা যতীন'—বিপ্লবী নায়ক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহধন্য ও আশিস্পুষ্ট। বুড়িবালাম-সংগ্রামের বীর অধিনায়ক বাঘা যতীন পলাতক অবস্থায় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে যে-দিন বাগনান থেকে বালেশ্বর যাত্রা করেন, সেদিন স্টেশনে এসেই কানাঘুষা শুনতে পান যে, শ্রীশ্রীমা ঐ ট্রেনেই দেশের বাড়ির উদ্দেশে চলেছেন। সম্ভাব্য সমস্ত রকম বিপদকে তুচ্ছ করে তিনি তৎক্ষণাৎ মায়ের পদপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন,—মা'ও তাঁর বীর সন্তানকে অভয় করকমল দ্বারা আশীর্বাদ করেছিলেন প্রকাশ্যেই। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মাকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাঘা যতীনের সঙ্গে তাঁর কি কথা হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা বিমর্ষমুখে শুধু বলেছিলেন, "দেখলাম আগুন।" এখানে উল্লেখ্য, মাত্র মাস কয়েক বাদেই (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদধন্য, ব্যাঘ্রতেজ-সমন্বিত সেই বীর 'বাঘা যতীন' বালেশ্বর হাসপাতালে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মাতৃপদে বিলীন হয়েছিলেন।

(দ্রষ্টব্য : 'Two Great Indian Revolutionaries'—Uma Mukherjee)

অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য, তরুণ দেশসেবী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ[১] নীতিগত কারণে সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে,—সহিংস আন্দোলন-সূচীর বিরোধী হওয়াতেই তাঁকে অনুশীলন সমিতির বাইরে চলে আসতে হয়েছিল। তাঁর জীবন-স্মৃতি থেকে জানা যায়, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শনের সুযোগ লাভ করে ধন্য হন। তাঁর মাতৃ-অনুভূতিকে ব্যক্ত করতেন এক অনবদ্য বলিষ্ঠ ভাষায়। তাঁর মতে "শ্রীমা মানুষ নন। সাক্ষাৎ ভগবতী। যুগাবতারের লীলাসঙ্গিনী।" তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আবেগভরে, মাকে প্রথম দর্শনের স্মৃতিচারণ করেছেন : "শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে মাথা রেখে চরণ-বন্দনারও সুযোগ পেয়েছি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীশ্রীমা আমার মাথায়

---

১ প্রথিতনামা গান্ধীবাদী নেতা, প্রখ্যাত মনস্বী, রসায়ন-বিজ্ঞানী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—উত্তরজীবনে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।

হাত রেখে সেদিন আশীর্বাদ করেছিলেন। সেদিনের স্মৃতি আমার জীবনে অক্ষয় সম্পদ। আমি জীবনে যখনই কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বা এখনও হই, তখন সেই মুহূর্তটি আমি স্মরণ করি: আমি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম করছি এবং তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন।"

(আলোকনীয়: ‘জীবন স্মৃতির ভূমিকা’—প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ)

দেশপ্রেমী বেশ কয়েকজন যুবক বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একে একে এসে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে সমুপস্থিত হয়েছেন—তাঁদের মধ্যে আবার অনেকেই চিরতরে সংসারপাট চুকিয়ে মাতৃপদাশ্রয়ী সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন। এই সব তেজস্বী তরুণের জীবনব্রতই ছিল—দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন, স্বাধীন ভারতমাতার শ্রীপদে আত্মবলিদান। দেবী সারদাই তাঁদের সকলের চোখে তখন মূর্তিমতী ভারতমাতা—মহাশক্তি মহামায়া। শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়—উত্তর জীবনে যিনি স্বামী তপানন্দ নামে শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম কৃপাধন্য সন্তান,—তাঁর ‘আত্মকথা’-গ্রন্থে যা' লিখেছেন, তা' থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে উপস্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে করি। তিনি লিখেছেন:

“এই সময়ে সন্ধ্যা, যুগান্তর প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা, ওজস্বিনী ভাষায়, যেন প্রতি অক্ষরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বা বিদ্যুতের স্রোত, প্রতি ব্যক্তির ধমনীতে ধমনীতে একটা অপূর্ব শক্তির সঞ্চার করিয়া বৃদ্ধের শরীরে পর্যন্ত নবীন যুবা বীরের তেজবীর্য আনিয়া দিতে লাগিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদেশীর পরাধীনতা পাশ ছিন্ন করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল, পাগল করিয়া দিতে লাগিল। এই স্বাধীনতা-যজ্ঞের যজমান সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে, হোতা বিপিন পাল, উদ্গাতা কাব্য-বিশারদ, অধ্বর্যু অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—নিজেদের ইহকাল পরকাল আহুতি দিয়াছেন, বলি দিয়াছেন নিজেদের শরীর, মন, প্রাণ।…

“ইহাদেরই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন সেই মহাশক্তি মহামায়া, স্বদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি কামনায় ইঁহারা যাঁহার শ্রীচরণে আত্মবলি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মহামায়া ইঁহাদের শুভেচ্ছা পূর্ণ করিয়া বরপ্রদা হইয়া দেশকে ইংরেজরাজের কবল হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন করিলেন।…

“…ক্রমে ১৯০৮-০৯ সাল অতীত হইতে চলিল। আমারও এইরূপ জীবন কাটানো দুঃসহ হইয়া উঠিল। স্থির সঙ্কল্প করিলাম চাকরি ছাড়িয়া গৃহত্যাগী হইব…। শ্রীশ্রীমার অনুমতি ও আদেশ অবশ্য প্রয়োজন এই বিষয়ে, তাই বাগবাজারে মার ওখানে যাইবার দিন একটি স্থির করা হইল।…চোখের জলে

মায়ের পা ধুইয়া দিয়া মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন মনের কথা। আমি বলিলাম, 'মা তুমি তো সব জান, তোমাকে আর কি বলব, আমি কিছু বলতে পারছিনা'।" ('আত্মকথা'—স্বামী তপানন্দ, পৃঃ ১৫০-১৫২)

বিপ্লবীদলভুক্ত শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত—শ্রীশ্রীমায়ের এক বিশিষ্ট সন্তান—পরবর্তিকালে ইনিই স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ নামে অত্যন্ত ভক্তিভাজন হয়েছিলেন। সকলের প্রিয় 'প্রিয়দা' একদা বেলুড় মঠের অন্যতম সঞ্চালকপদেও আসীন ছিলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'উদ্বোধন'-এ এসে মাতৃচরণাশ্রয় লাভ করেন। ঘটনাচক্রে পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়াতে, তাঁকে প্রায় বছর দেড়েকের জন্য অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। পূজনীয় আত্মপ্রকাশানন্দজী—'প্রিয়দা', 'উদ্বোধন' পত্রিকার শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যাতে "মাতৃস্মরণে" শিরোনামে যে প্রবন্ধ লিখেছেন, তা' থেকেই আমরা এ-খবর জানতে পেরেছি। তিনি ব্যক্ত করেছেন :

"একদিন শ্রীমা কৃপা করিয়া উদ্বোধনের বর্তমান ঠাকুরঘরে বসিয়া আমাকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। এখানে আসিবার পূর্বে তৎকালীন বিপ্লববাদী দলের সহিত সংস্রব থাকায় পুলিশের নজর আমাদের উপর খুবই ছিল। আমি উদ্বোধনে আছি, এই সন্ধান পুলিশ পাইয়া গেল।...ইহার ফলে আমাকে প্রায় দেড়বৎসর উদ্বোধন হইতে বাহিরে গিয়া থাকিতে হয়।...যখন মায়ের কাছে বিদায় লইতে উপরে গেলাম, তখন তিনি যেন আমার দুঃখে অভিভূতা হইয়া গেলেন এবং অসীম স্নেহকরুণা দিয়া আমাকেও অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। আমাকে বার বার অভয়বাণী শুনাইতে লাগিলেন, 'ভয় কোর না, ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন'। তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে বাণী সেদিন নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা আজও আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আজও সে-কথা স্মরণ করিলে মনে অপার্থিব শক্তি ও শান্তি আসে। সেদিন তাঁহার আশীর্বাদে ধন্য হইয়া গিয়াছি।"

* * *

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগে দেদীপ্যমান হোমশিখার মতো প্রত্যক্ষীভূতা

মহাশক্তি ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা। দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা তাই তাঁরই পদপ্রান্তে ছুটে যেতেন, তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে, সেই মূর্তিধারিণী হোমাগ্নি থেকে তেজ ও শক্তি সঞ্চয় করতে, কিংবা স্ব-স্ব উদ্‌ভ্রান্ত শক্তিপ্রবাহকে সংহত করার সাধন-শিক্ষার্থে। এ-প্রসঙ্গে আরও একটি রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তকে স্মরণ করতে ইচ্ছা হয়। বাংলাদেশের একমাত্র মহিলা 'স্টেট্ প্রিজনার' যিনি স্বৈরাচারী ইংরেজ রাজের প্রবর্তিত বেঙ্গল স্টেট্ প্রিজনার্স অ্যাক্টের '৩ নং রেগুলেশন (১৮১৮)'-এ ধৃত হয়েছিলেন ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে—সেই অগ্নিকন্যা, চব্বিশ বছর বয়সী বিধবা ননীবালা দেবীর কথাই বলা হচ্ছে এখানে। পেশোয়ার থেকে বন্দী করে তাঁকে কাশীতে আনা হয়েছিল। পরে সেখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। অকথ্য অবর্ণনীয় দৈহিক নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সেই ননীবালার উপর—তথাপি তিনি নত হননি ঐ পশুপ্রতিম জেল-প্রহরীদের কাছে। অবশেষে তিনি জেলের অন্ন গ্রহণ বন্ধ করলেন,—সম্পূর্ণ অনশন-ব্রতের মাধ্যমে ঐ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাতে থাকলেন। ইংরেজ পুলিশের বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা নড়ে চড়ে উঠেছিলেন ঐ ভয়ঙ্করা নারীর দৃঢ় পণের সম্মুখে। কলকাতার ইলিসিয়াম রো-তে গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ গোল্ডি সাহেব ননীবালাকে তখন এক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি অনশন ভঙ্গ করে অন্ন-জল গ্রহণ করেন, তা'হলে তিনি তাঁর যে-কোনও চাহিদাকে মঞ্জুর করতে সম্মত থাকবেন। পুনঃ পুনঃ গোল্ডি সাহেবের এই প্রতিশ্রুতি শুনে ননীবালা অবশেষে মৃদু কণ্ঠে জ্ঞাপন করেছিলেন: "আমাকে বাগবাজারে রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের সহধর্মিণীর কাছে রেখে দিন, তা'হলেই আমি খাব।" গোল্ডি সাহেব এই শর্ত শুনেই বলেন, "আপনি কাগজে লিখে দরখাস্ত করুন আমার কাছে।" ননীবালা তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে তাঁর আবেদন লিপিবদ্ধ করেন—একটিবার শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয়ে তাঁকে পৌঁছে দেবার জন্য সতেজ অনুনয়। উদ্ধত মিথ্যাচারী গোল্ডি ননীবালা-লিখিত ঐ দরখাস্তখানিকে হাতে নিয়েই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, হাতের মুঠোতে দলা পাকিয়ে বাজে কাগজের টুকরিতে ফেলে দিয়েছিলেন অপক্রোশ ও তাচ্ছিল্যভরে। অভিহত সিংহিনী এবার সমুত্থিত উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদানে,—ননীবালা বজ্রবেগে স্পর্ধিত গোল্ডির মুখে এক চড় বসিয়ে দেন তক্ষুণি। দ্বিতীয় আঘাতটি হানবার আগেই সমুপস্থিত গোয়েন্দা রক্ষীরা তাঁর উত্তোলিত চড়কে প্রতিনিবৃত্ত করেন সেই উদ্যত হাতখানিকে চেপে ধরে। ওঁরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—"পিসীমা করেন কি, করেন কি?"

ননীবালাও জবাব দিয়েছিলেন,—"ছিঁড়েই যদি ফেলবে, তা'হলে আমাকে দিয়ে লেখালে কেন ?" স্মর্তব্য, শ্রীশ্রীমায়ের শরণার্থিনী এই ননীবালা ছিলেন বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিসীমা—ইনি বিপ্লবীদের গোপন অস্ত্রসম্ভারের সন্ধান রাখতেন। (অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত তথ্য : সমাজশিক্ষা' পত্রিকার ১৯৮০ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ও ডিসেম্বর সংখ্যা দ্রষ্টব্য।)

এখানে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, কেবলমাত্র পুরুষ স্বাধীনতা-যোদ্ধারাই নন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশভাগিনী নারীরাও শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে এসে আশ্রয় পেয়েছিলেন অনেকেই। এমন আশ্রিতা কন্যাদের মধ্যে সর্বাগ্রে স্মরণীয় সুধীরা দেবীর নাম—যিনি ছিলেন তাঁর ভাইয়ের সহকারী অর্থাৎ বিপ্লবী কর্মী—এ-কথা লিখেছেন যুগান্তর গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা নলিনীকান্ত গুপ্ত। অরবিন্দ-অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষও তাঁর "অগ্নিযুগ" স্মৃতিচারণায় স্মরণ করেছেন : "...দেবব্রতর ভগিনী সুধীরা ছিলেন ভাইটির মতোই মহামনা তেজস্বী মেয়ে।" এই ভগিনী সুধীরা দেবীর কথা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচরিতের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অতিশয় পরিচিত।

সুধীরা ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত বিশ্বস্ত স্নেহপাত্রী মন্ত্রশিষ্যা। ভগিনী নিবেদিতারও অতিশয় ঘনিষ্ঠ সহচারিণী ছিলেন সুধীরা—নিবেদিতা-বিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ সঞ্চালিকারূপেও তিনি সুপরিচিতা। তাঁর অকাল মৃত্যুতে শ্রীশ্রীমায়ের প্রাণে কী প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল, তার অভিব্যক্তি মাতৃজীবনীর পাঠক-পাঠিকারা সকলেই জানেন।

অরবিন্দ-পত্নী মৃণালিনী ঘোষের কথা আমরা আগেই বলেছি। তা'ছাড়াও গিরিজা গুপ্তা, প্রফুল্লকুমারী বসু প্রমুখ আরও কতো স্বাধীনতা-যজ্ঞে সমর্পিতা নারী শ্রীশ্রীমাকেই জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় করে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন, তার পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব প্রয়াস হবে এখানে। বরিশালের প্রসিদ্ধ নেতা যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতার কন্যা প্রফুল্লমুখী মাত্র তেরো বছর বয়সে বিবাহের মাত্র আটাশ দিন পরেই বিধবা হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে ছুটে গিয়েছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তখন তাঁর বয়স মাত্র যোল বছর। শ্রীশ্রীমা প্রফুল্লমুখীকে আশীর্বাদ করেছিলেন,—বলেছিলেন : "অত নিরাশ কেন মা ? তুমি তো তুচ্ছ নও, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।" কুমিল্লা, হিজলী, বহরমপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় তিনি ইংরেজের জেলে বন্দী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নারী-সংগ্রামীদের মধ্যে একটি

উল্লেখ্য নাম—এই প্রফুল্লমুখী বসু। কুমিল্লার 'সারদাদেবী মহিলা সমিতি' তাঁরই হৃদয়-শোণিতে সঞ্জীবিত ছিল। (দ্রষ্টব্য: 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী' —কমলা দাশগুপ্তা।)

*   *   *

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকতলা বোমার মামলায় খালাস পেয়ে দুই বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক দেবব্রত বসু ও শচীন্দ্রনাথ সেন এসে রামকৃষ্ণ মঠে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন শ্রীশ্রীমায়েরই অভয়-আশিসের বলে। স্বামী গম্ভীরানন্দ-প্রণীত 'History of the Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission'-গ্রন্থে এ-প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায় (pp. 175, Third revised edition, 1983):

"When Debabrata Basu and Sachin Sen, both accused, but afterwards acquitted as not guilty, in what was known as Manicktala Bomb Case, in which many more were arrested for plotting to overthrow the Government by force, sought admission to the Belur Math in 1909, Swami Saradananda, Secretary, known for his intrepidity and largeheartedness, acquisced and stood garuntee for their good behaviour. They got spiritual initiation from the Holy Mother, and soon became honoured members of the Order as Swamis Prajnananda and Chinmoyananda. They never betrayed the trust placed in them by Swami Saradananda, though their presence invited constant police vigilance for the organization. They lived and died—alas, prematurely—as valuable workers of the Math. Swami Prajnananda, especially raised the intellectual level of the organisation by his contribution to its Bengali magazine, Udbodhan as Editor for one year in 1912-13, and then as President of the Advaita Ashrama, Mayavati, and Editor of Prabuddha Bharata for four years, till his death on April 20, 1918. Swami Chinmoyananda followed him on July 19."

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিবৃত্তে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার সারাংশ হচ্ছে এই : মাণিকতলার বোমার মামলাতে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তি পেয়ে দেবব্রত বসু ও শচীন সেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠে যোগদানাকাঙ্ক্ষী হয়ে এসেছিলেন এবং সঙ্ঘের তদানীন্তন সঞ্চালক স্বামী সারদানন্দ, যিনি ছিলেন একাধারে দৃঢ়চেতা ও হৃদয়বান, স্বয়ং তাঁদের উভয়ের ভাবী সাধু আচরণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। এঁরা দু'জনেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে, অচিরেই সাদরে মঠে গৃহীত হয়েছিলেন—যথাক্রমে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী চিন্ময়ানন্দ সন্ন্যাস-অভিধা সহ। তাঁদের উপরে স্বামী সারদানন্দের ন্যস্ত বিশ্বাসকে তাঁরা কখনো কোন অবস্থাতেই প্রবঞ্চনা করেন নি,—যদিও তাঁদের অবস্থানের দরুণ সন্ন্যাসিসঙ্ঘের প্রতি পুলিশের কড়া নজর বরাবরই ছিল। এঁরা দু'জনেই জীবন উৎসর্গ করেছেন—অত্যন্ত অকালেই অস্তমিত হয়েছেন সঙ্ঘের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে। ‘উদ্বোধন’ ও ‘Prabuddha Bharata’ পত্রিকার সুদক্ষ সম্পাদনায় এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের যোগ্য অধ্যক্ষতায় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ১৯১৮-র ২০ এপ্রিল প্রয়াত হন। স্বামী চিন্ময়ানন্দও তাঁকে অনুসরণ করেন পরবর্তী ১৯ জুলাই।

প্রকৃতপক্ষে দেবব্রত বসু ছিলেন বিপ্লবান্দোলনের মহান নায়ক—যুগান্তর গোষ্ঠীর তাত্ত্বিক নেতা। শ্রীঅরবিন্দের অনুজ ও অনুগামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা ‘বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী’ গ্রন্থ থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেখানে শচীন সেনের সুউচ্চ ভূমিকাও বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ দেখা যায়। ঐ গ্রন্থে আছে (পৃষ্ঠা ১০৮-৯):

“তখন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রভাব খুব বেশি। তখন সবে কথামৃতগুলি ও চৈতন্যভাগবত পড়িতেছি।…তখন মেজদাও (অরবিন্দ) শ্রীকৃষ্ণ-সমর্পিত প্রাণ। …তাহার উপর দেবব্রতর প্রেমের সাধনা।…যখন সেসন্স্-কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হইল তখন দেবব্রত, আমি, নরেন বক্সী, বিজয় নাগ ও শচীন্দ্র সেন একসঙ্গে সাধনা করিতেছি।…আমি ধ্যানে নানারকম সাধনা পাইতাম, আর সেইসব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ধরিয়া ধ্যান ও বিচার করিতাম। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে চিন্ময় সমাধির ধ্যান পাইয়াছিলাম—সে যেন অনন্ত চৈতন্যময় আকাশে পাখা মেলিয়া পাখী উড়িতেছে, যেন বামে দক্ষিণে অধঃ উর্দ্ধ পরিপূর্ণ নিথর জলরাশি—আর সাধক তাহার মাঝে কুম্ভ। দেবব্রতও আমার তখনকার সাধনায় অনেক সাহায্য করিয়াছিল। সে নিজের প্রক্রিয়া আমার মাঝে সঞ্চার

করিয়া দিত—সে যাহা চাহিত ধ্যানে আমার মধ্যে তাহা আপনি জাগিয়া উঠিত।"

অরবিন্দ ও দেবব্রত-প্রদত্ত যুগ্মনেতৃত্বই তদানীন্তনের বিপ্লব-আন্দোলনের নিয়ামক ছিল। বারীন্দ্র ঘোষের 'অগ্নিযুগ,' ৮৭, থেকে কিছুটা উৎকলিত হচ্ছে যাতে দেবব্রত-চরিত্রকে অনুধাবন করতে সহায়তা হবে। বারীন্দ্রকুমার জানিয়েছেন ঃ

"নিজের চেয়ে কোনোদিক দিয়ে উপযুক্ততর লোক পেলে আমরা তখন সহজেই সানন্দমনে তাঁকে আসন ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতাম। দেবব্রত এইভাবেই নিজগুণেই আমাদের উপর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু কি অরবিন্দ আর কি দেবব্রত—কারও চাপ বা চালনা পীড়াদায়ক অসহনীয় ছিল না। নিরহঙ্কার শিবতুল্য এই মানুষ দু'টি শান্ত ও মৌন গাম্ভীর্যে আমাদের মাঝে হিমাচল-শিখরের মতো বসে থাকতেন। আমরা তাঁদের আড়ালে কাজ করতাম অন্তরের পাগল প্রেরণায়; নেতা দিতেন নির্দেশ সহাস্য অন্তরঙ্গতায়, যতটুকু একান্ত দরকার ততটুকুই। কাজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার কৌশল তাঁরা জানতেন।"

'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে হেমচন্দ্র কানুনগো অরবিন্দ এবং দেবব্রত সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী হেমবাবুর পরিবেশিত তথ্যাবলী থেকে এ-কথা পরিষ্কার যে, অরবিন্দের ধর্মভাব বৃদ্ধির মূলে ছিল দেবব্রতের প্রভাব। শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই নয়, বৈপ্লবিক যাবতীয় বিষয়ে, আন্দোলন-সংগঠনের সর্বপ্রকার প্রয়াসেই অরবিন্দ ও অরবিন্দসহচর সকলের উপরেই দেবব্রতের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট ছিল। হেমবাবুর ভাষায় দেবব্রত ছিলেন "সকল দলের প্রাণস্বরূপ"।

আলিপুর বোমার মামলার অপর আসামী শচীন সেনও সর্ব ব্যাপারে দেবব্রতের অনুগামী ছিলেন—এমনকি তাঁর তিরোধান-পর্বেও এ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি—দেবব্রত প্রজ্ঞানন্দের মহাপ্রয়াণের মাত্র মাস কয়েক বাদেই চিন্ময়ানন্দ শচীনও চিন্ময়লোকে প্রস্থান করেছিলেন। শ্রীশ্রীমাতৃচরণাশ্রিত বিপ্লবী মাখনলাল সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র শচীনকে রাজদ্রোহী বলে যখন অভিযুক্ত করা হয়েছিল, তখন তিনি মাত্র পনেরো বছরের বালক।

বাস্তবিক পক্ষে বিপ্লবীরা তখন উগ্র হিংসাত্মক আন্দোলনের ধারাকে পরিহার করে একে একে এসে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের সতেজ কিন্তু শুদ্ধ সেবাভাব তথা দেশাত্মবোধের প্রবাহের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন,—শ্রীশ্রীমা সারদারই অলক্ষ্য প্রেরণা-বিকিরণের শক্তিতে। এ-প্রসঙ্গে আমরা প্রখ্যাত মাতৃজীবনীকার ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের উক্তিকে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি এক সাক্ষাৎকারে

বলেছিলেন: "আসলে মা-ই বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন; এ-জন্যই শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দজী) ওঁদের আশ্রয় দেন।" রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত তরুণদের বেলুড় মঠে আনাগোনা,—সেখানেই তাদের আশ্রয়-গ্রহণ মঠের পক্ষে কতোখানি বিপজ্জনক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আপাতদৃষ্টে সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের আদর্শের পরিপন্থীও বটে। এ-জন্য মঠ-পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘোরতর অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল, এ-কথাও সত্য। কর্তৃপক্ষের অনেকেই তাই শঙ্কিত হচ্ছিলেন—ওঁদের স্থান দেওয়ার ব্যাপারে। কিন্তু একমাত্র সর্বাশ্রয়দাত্রী মায়ের স্নেহ ও সহানুভূতির ফলেই মঠের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত প্রবীণ সন্ন্যাসীরা, সমগ্র মঠের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেও দেবব্রত, শচীনের মতো প্রথম সারির বিপ্লবকারীদেরও আশ্রয়দানে সাহসী হয়েছিলেন। পুলিশের অতন্দ্র দৃষ্টি ছিল ঐসব মাতৃচরণাশ্রিত বীর সন্তানদের উপর—তাঁরা যতোকাল ইহধামে ছিলেন। শ্রীশ্রীমাও কিন্তু সদা সতর্ক স্নেহদৃষ্টি-সম্পাতে তাঁর আশ্রিতদের রক্ষা করেছেন—তাঁদের জীবনধারাকে মোড় ফিরিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রবাহিত করতে অবিরাম সহায়তা করেছেন। শ্রীশ্রীমা তখন কাশীধামে—দেশব্যাপী তখন সন্ত্রাসের আগুন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর, দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ সাংঘাতিকভাবে বোমার বিস্ফোরণে আহত হন,—বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল রাসবিহারী বসুর নির্দেশে বসন্ত বিশ্বাসের দ্বারা। ঐকালে বোমার মামলার সঙ্গে জড়িত সবাইকেই পুলিশ ধরপাকড় করতে শুরু করে—দেবব্রতকেও পুলিশ খুঁজছে! দেবব্রত তখন কাশীধামে মায়েরই সঙ্গে। মঠ-কর্তৃপক্ষ ও শুভানুধ্যায়ী সকলেই উতলা হয়ে উঠলেন দেবব্রতকে অন্যত্র সরিয়ে দিতে,—তদনুযায়ী নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী শুনেই বললেন: "কী হয়েছে? ওতো এখন কিছুই করে না। এরা সব ভয় পাচ্ছে কেন?" দেবব্রতকে আর সরতে হল না কোথাও। অভয়ার অভয়পদেই তিনি রয়ে গেলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে দেবব্রত দেহত্যাগ করলে, মা সেদিন অঝোরে অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর এই তীক্ষ্ণধী, বজ্রহৃদয়, অন্যায়দ্রোহী বীর সন্তান দেবব্রতকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন স্থিতধী প্রজ্ঞা-আনন্দে,—মায়ের দৃষ্টিতে প্রজ্ঞানন্দ ছিলেন 'যোগিপুরুষ'।

মনে পড়ছে, দেবব্রতের চিরঅনুচর শচীনের কথা। পুলিশের কড়া নজরে উত্যক্ত-অতিষ্ঠ শচীন এসে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দাঁড়ালেন একদিন। স্মিত গম্ভীর আননে মা তাঁর তেজিষ্ঠ বালক সন্তানকে নিমেষে শান্ত করে দিয়েছিলেন,—বলেছিলেন,—"ঝড়ের এঁটোপাত হয়ে থাক—তোমার অস্তিত্ব থাকবে, ব্যক্তিত্ব

থাকবে না, তাহলে তোমার সব জ্বালা যাবে।" মায়ের এই প্রতিবিধান-উক্তির কার্যকারিতা ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বামী চিন্ময়ানন্দ পরে এক সময়ে জানিয়েছিলেন : "হ্যাঁ, পুলিশ পূর্ববৎ পীড়া দিতে থাকলেও একেবারে উদাসীন ভাব এসে গেল, তাদের কোন ব্যবহারই মনে রেখাপাত করত না—তাদের সব কথা সব কাজ দেখছি বটে, কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া নাই।"

(ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য-প্রণীত 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী' দ্রষ্টব্য)

১৯১৮-র ১৯ জুলাই বাগবাজারে মায়ের বাড়িতেই দেহত্যাগ করেছেন স্বামী চিন্ময়ানন্দ,—আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রয়াণকালে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের চরণস্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল হন,—অবশেষে মায়ের পদকমল মস্তকে ধারণ করেই চিন্ময়ানন্দ নিত্যধামে যাত্রা করেন। মায়ের শ্রীমুখে উচ্চারিত হয়েছিল—"ভাগ্যবান"।

* * *

এখন একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, শুধুমাত্র সর্বাবগাহী মাতৃত্বের অনুরোধেই কি শ্রীশ্রীমা এতো সব রাজনৈতিক কর্মীকে বা মুক্তিসংগ্রামীকে আপন স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন? ঐ-যুগে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত, হিংসার রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষজড়িত বিপথগামী যুবকের দলকে এমন নির্বিচারে কৃপা-বিতরণ কি-ভাবে সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর পক্ষে? অত্যাচারী শাসকও মায়েরই ছেলে-মেয়ে। ইংরেজরাও মায়ের সন্তান, কিন্তু তাদের প্রজাপীড়ননীতি কিছু মায়ের দ্বারা অনুমোদিত ছিল না। মায়ের স্নেহদৃষ্টি বিশ্বভুবনের সকল জীবের প্রতি,—কিন্তু সে-দৃষ্টিতে অন্ধতা ছিল না;—বরং তা' ছিল, সর্বশ্রেয়স্করী, অখিল-দুঃখহারী। তাই দেখি ভারতের শৃঙ্খলমোচনের দিকেও মায়ের সে-দৃষ্টি ছিল সদাজাগ্রত। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর অমরগ্রন্থ 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ', ষষ্ঠ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় একটি বিস্ময়াকুল মন্তব্য করেছেন :

"খুবই বিস্ময়কর মনে হবে, অথচ বাস্তবাধিক বাস্তব ঘটনা হল—বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ সংঘে আশ্রয়লাভ করেছিলেন বিশেষভাবে শ্রীমা সারদা দেবীর আনুকূল্যে। শাসক ইংরেজসমূহ পৃথিবীর সকল মানুষকে যিনি নিজ সন্তান বলে গণ্য করতেন, সেই সারদা-মাতা কিন্তু ইংরেজ-শাসনের অবসান কামনা করে বার বার বলেছেন, 'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো'। রামকৃষ্ণ মঠভুক্ত বিপ্লবীদের অধিকাংশই

শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষিত, এবং পুলিশ প্রাক্তন বিপ্লবী সন্ন্যাসীদের অবিরাম উত্যক্ত করত বলে শ্রীমার মানসিক কষ্টের অবধি ছিল না। তাঁর কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে জেনে 'নির্যাতিত দেশপ্রেমিক, মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবী ও অন্তরীণাবদ্ধ যুবকেরা দলে দলে মায়ের কাছে আসতেন দীক্ষা নেবার জন্য'।"

শ্রীশ্রীমায়ের 'আনুকূল্য'-ই ঐভাবে যুদ্ধক্ষত স্বদেশী যোদ্ধাদের দলে দলে আশ্রয়প্রাপ্তির হেতু। আর অত্যাচারী 'ইংরেজ-শাসনের অবসান'-ও মায়ের অন্তরের ইচ্ছা ছিল,—সে-কথাও ঐতিহাসিক সত্য। ততোধিক সত্য কথা হচ্ছে—হুজুগ-সর্বস্ব স্বদেশীয়ানা, তথা হিংসা ও দ্বেষপ্রসূত সর্ববিধ আন্দোলনকে মোড় ঘুরিয়ে প্রকৃত অর্থে দেশমাতৃকার জন্য উৎসর্গীকৃত হতে জীবন গঠন করাকেই মা-সারদা অনুপ্রাণনা দিয়েছিলেন। তিনি বিপ্লবকে রূপায়িত করেছিলেন সেবায় ও পূজায়, স্বরাজ-আন্দোলনের গড়ন করতে চেয়েছিলেন স্বদেশ-ভক্তির আকারে। দেশের মুক্তিসাধক তরুণদলের চেতনাকে মা জাগ্রত করে দিয়েছিলেন যথার্থ দেশাত্মবোধে। দেশ-ভক্তি ও নীতিবোধ ছিল সারদা-চরিত্রের এক বিশেষ উপাদান,—শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যেও তাই সে-বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্ত হয়ে পড়ত নিতান্ত অনবধানেই। যেমন, জয়রামবাটীর মৃত্তিকা স্পর্শান্তে তাঁকে বলতে শোনা যেত : "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। দেশের জনসাধারণের কোনও প্রকার দুর্দশা কিংবা দুঃখ-বিপর্যয়ের সংবাদ মাকে অতীব বিচলিতা করে তুলত। মর্মবেদনায় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন—দেশের মানুষের কষ্ট নিরাকরণের জন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করতেন।

স্বামী সারদেশানন্দজীর 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' থেকে অংশ বিশেষ (পৃষ্ঠা ১৬৫-৬৭) এখানে উৎকলিত হচ্ছে :

"দুঃখের ঘটনা শুনিলেই মায়ের কোমল মন অধীর হইয়া উঠিত। প্রথম জার্মান যুদ্ধ চলিতেছে, বস্ত্রাভাব ভীষণ, মেয়েদের লজ্জানিবারণ কঠিন হইয়াছে। মায়ের সন্তান বিভূতিবাবু একদিন আসিয়া জানাইলেন—তিনি বিষ্ণুপুরে মায়ের বিশেষ ভক্তসন্তান সুরেশ্বরবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন। সেখানে এক তরুণী মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বলিল, 'কাকা এখান থেকেই প্রণাম করছি। পরনের কাপড়ের অবস্থা এমনি যে, বাইরে এসে আপনাকে প্রণাম করতে পারব না।' শুনিয়া বিভূতিবাবু তাঁহার চাদরখানা ঘরের ভেতর ছুঁড়িয়া দেন। তাহাই গায়ে জড়াইয়া মেয়ে বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া যায়। শুনিয়া মা খুব অশ্রুবিসর্জন

করিলেন। ইহার পরই পাড়ার একজন একখানা সংবাদপত্র আনিয়া মাকে পড়িয়া শুনাইল—কোথাও কোথাও মেয়েরা কাপড়ের অভাবে লজ্জানিবারণে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনার বিবরণ ভাবিতে ভাবিতে মা কাঁদিতে লাগিলেন, প্রথম ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিলেন, শেষে একেবারে বালিকার মতো অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন, 'পরনের কাপড় না পেলে মেয়েরা কি করবে। লজ্জা-সরম বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় কি!'—এই সকল উক্তি করিতেছেন আর ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছেন।··· সারা ভারতের সকল নারীর বস্ত্রাভাবের দুঃখ মায়ের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হইয়া আর্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে···। রাজ্যশাসক ইংরেজ-রাজের দোষেই এই দুর্দিন, মনে করিয়া মা তাহারা কবে এদেশ ত্যাগ করিবে, সেজন্য অধীর হইয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, 'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো'। ইংরেজ কবে দেশত্যাগ করিবে, কবে সেই সুদিন আসিবে জানিতে মা ব্যগ্র হইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন।···তারপর একটু সামলাইয়া লইয়া আপসোস করিতে লাগিলেন—দেশের লোক নিজেদের চরকায় সুতাকাটা ও বস্ত্র তৈয়ারের কাজ ছাড়িয়া দেওয়াতেই আজ এই দুঃখকষ্ট। মা বলিলেন, 'কোম্পানী সুখ দেখিয়ে দিলে—টাকায় চারখানা কাপড়, একখানা ফাউ তার উপর। ঘরে ঘরে চরকা ছিল, সব উঠে গেল, সস্তায় কাপড় পেয়ে সব বাবু হয়ে গেল, এখন সব বাবু কাবু হয়েছে!'

"পুলিশের হস্তে ধৃতা হইয়া সিন্ধুবালা নাম্নী গর্ভবতী যুবতী রমণীর অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিবার সংবাদ শুনিয়াও মা অতীব অধীর হইয়া ক্রন্দন করেন, ইংরেজ-রাজত্বের অবসান কামনা করেন, এবং ঐসকল অত্যাচারের প্রতিবিধান ও প্রতিরোধ করিতে দেশবাসীর উত্তম প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন।···আর্থিক শোষণে দেশে দুঃখ-দুর্দশা দিন দিন বাড়িতে থাকায় লোকে উহাদের উপর অবিশ্বাসী হইয়া উহার প্রতিকার চেষ্টা আরম্ভ করিলে বিরোধ উপস্থিত হইল এবং দেশের লোকের উপর শাসকগোষ্ঠী ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। মা স্বচক্ষে এই সকল ঘটনা অনেক দেখিয়া, স্বকর্ণে অনেক শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে ইংরেজ-শাসনের অবসান কামনা করিতেন। নতুবা ইংরেজ জাতি বা তাহাদের ধর্মসম্প্রদায়ের উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষের ভাব কখনও দেখা যায় নাই, বরং তিনি তাহাদিগকেও নিজের সন্তান বলিয়াই মনে করিতেন। তাঁহার আশ্রিত ইংরেজ ও অপর খ্রীষ্টানেরা সমান স্নেহ-মমতা লাভ করিয়াছেন।"

উল্লিখিত সিন্ধুবালার ঘটনাটি শ্রীশ্রীমায়ের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তাঁর সেই

বিস্ময়কর ভাবান্তর অবলোকন করেছেন. এমন আরও একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাধুর উক্তি এখানে খুব সঙ্গত কারণেই স্মরণযোগ্য। স্বামী ঈশানানন্দ—মায়ের স্নেহের বরদা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যখন কালীমামা এসে সবিস্তারে মাকে জানিয়েছিলেন যে, যুথবিহার গ্রামের দেবেন ঘোষের স্ত্রীকে ও ভগিনীকে (দু'জনেরই নাম ছিল ‘সিন্ধুবালা’,—ভগিনী ছিলেন আসন্নপ্রসবা) বাঁকুড়ার পুলিশ রাত্রিবেলা পায়ে হাঁটিয়ে ইন্দাস থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁদের দু'জনকেই বাঁকুড়াতে চালান করা হয়—বাঁকুড়া রেল স্টেশন থেকে পুনরায় দু'মাইল পথ হাঁটিয়ে, উভয়কেই জেল হাজতে বন্দী রাখা হয়। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল. তাঁদের তিলজলার বাসায় যুগান্তর দলের পলাতক বিপ্লবী ভূপেন দত্ত প্রমুখ কয়েকজন আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বামী ঈশানানন্দের স্মৃতিচারণ :

“সেই দিন মায়ের অগ্নিময়ী মূর্তি দেখিয়া আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম।

“মা প্রথমতঃ ‘বল কি !’ বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, চোখমুখের অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। তারপর গম্ভীর-স্বরে বলিলেন. ‘এটা কি কোম্পানির আদেশ, না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধা স্ত্রীলোকের উপর এত অত্যাচার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় তো কই শুনিনি! এ যদি কোম্পানীর আদেশ হয়, তবে আর বেশীদিন নয়। আচ্ছা, এমন কোন ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না, যে দু'চড় দিয়ে মেয়ে দু'টিকে ছাড়িয়ে আনতে পারতো? দেবেনের ভাইরা সব কোথায় ছিল?’…কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যাকালে আবার যখন সংবাদ আসিল তাঁহাদের ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন ঐ সংবাদ শুনিয়া মা অনেকটা শান্ত হইয়া বলিলেন, ‘এ খবর যদি না পেতাম তবে আজ রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না।’ ইহারই দু'একদিন পরে আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকরবাবুকে মা বলিতেছেন, ‘এ রাজত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে, থাকবে না, এ আর বেশী দিন নয়। যে কয়দিন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুণ্য আছে’।” (—‘মাতৃ-সান্নিধ্যে’, পৃষ্ঠা ৫৭—৫৮)

এখানে উল্লেখ্য, জয়রামবাটী গ্রামের একটি কোণে দৃশ্যমান সেদিনের এই ঘটনাতরঙ্গ উদ্বেল করে তুলেছিল সমস্ত বাংলার প্রাণকে,—অগ্নিময়ী সেই মায়ের মূর্তির বর্ণচ্ছটায় সারা দেশ জেগে উঠেছিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা এটা। সিন্ধুবালাদ্বয়ের প্রতি ঐ বর্বর আচরণে সমগ্র বঙ্গদেশ উত্তেজনায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল তখন! বঙ্গীয় আইন পরিষদ পর্যন্ত গড়াল ঘটনাটি,—পরিষদ উত্তপ্ত হয়ে দীর্ঘ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসে

অবশেষে এই অঘটনের জন্য আইন পরিষদের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ('Modern Review' Vol. 23, 1918, দ্রষ্টব্য)

* * *

বাংলার বুকে এক অশ্রুতপূর্ব বিপ্লবান্দোলনের সূচনা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে—যখন লর্ড কার্জনের স্বৈরাচার ও প্রচণ্ড হঠকারিতায় মানুষ অতিষ্ঠ। ঐতিহাসিক সেই গণ-বিক্ষোভের নামই স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গের জঘন্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার নর-নারী তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—তাদের হাতে ছিল গোপনে সংগৃহীত নানা রকম দেশী অস্ত্র এবং কণ্ঠে ছিল মা-নামের জয়-গাথা—মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্'। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসের গতিপথ সেই থেকেই নতুন লক্ষ্যগামী,—সূচিত হয়েছিল নবযুগের : বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশ-বিরোধী যাবতীয় ভাবধারা পরিহার—'বয়কট' এবং জাগরণী স্বদেশ-মন্ত্রই জাতির তরুণ-তরুণীর কাছে মুক্তিপ্রাপক দীক্ষামন্ত্র হয়ে দাঁড়াল। সেই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতের দল জাতির রুদ্ধ যৌবনকে সেদিন এক অভিনব গতি-প্রকৃতি দান করতে বদ্ধপরিকর। চরকা, তাঁত, স্বদেশীয় শিক্ষা, স্বদেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের কর্মপ্রণালী অনুসরণ করতে ব্রতী হয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই,—দিকে দিকে, ঘরে ঘরে তখন আরব্ধ এই বিপ্লব। নর বা নারী, সকল বয়সের সকলেই সামিল হয়েছিল এই বিপ্লব-আন্দোলনে,—সবারই ছিল সাগ্রহ ও সক্রিয় অংশ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মার্চ, বিপ্লব দমনের আখেরি উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারতীয়দের স্বাধীনতা অপহরণের কৌশলাত্মক এক আইন প্রণয়ন করল ব্রিটিশ-রাজ। স্বৈরাচারী এই আইনের নামই রাওলাট্ অ্যাক্ট্ (Rowlatt Act)। সমস্ত ভারত জুড়ে ঝড় উঠল,—শুরু হয়ে গেল রাওলাট্ সত্যাগ্রহ। ১৯১৯-এর ৬ এপ্রিল, সর্বভারতীয় প্রতিবাদের দিন স্থির করে, সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন মহাত্মা গান্ধী। সারা হিন্দুস্থান—ভারতের শিক্ষিত নরনারী সহ কৃষক, মজুর, ছাত্র, মেহনতী জনতা—সাধারণ মেয়ে-পুরুষ সকলেই ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিলেন সেদিন। বিপুল জন-আন্দোলনের সমুদ্র-তরঙ্গে ভারত তোলপাড় হয়েছিল,—লাহোর, কলকাতা, আমেদাবাদ, দিল্লী ও অমৃতসরে গুলি চালিয়ে তাকে স্তব্ধ করে দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল ইংরেজের পুলিশ ও সৈন্য। ভারত-ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব সফল সেই সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহ-ধর্মঘট। ইতিমধ্যে ১৩ এপ্রিল ঘটে গিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের

কুখ্যাত হত্যাতাণ্ডব। কিন্তু, আমরা স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে এবং অন্যান্য আরও বিশ্বস্ত সূত্র থেকে যতোটুকু জেনেছি, তাতে সমকালীন ঐ-সব রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্রীশ্রীমায়ের মুখে তেমন কোনও মন্তব্য শোনা যায়নি, —যদিও ইতঃপূর্বে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীতে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে অনেকবার। কিন্তু ঐ-কালেই সহসা একটি ক্ষুদ্র ইন্ধন-শলাকা বৃহৎ বহ্নি-বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল,—সেটিও লক্ষণীয় এবং গভীর তাৎপর্যদ্যোতকও বটে। সে-ইন্ধনটি যুগিয়েছিলেন মায়েরই এক প্রিয় সন্তান—বদনগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবোধকুমার চট্টোপাধ্যায়। একদিন বিকেলবেলায় জয়রামবাটীতে এসে প্রবোধবাবু মাকে বলেন, "মা আসতে আসতে পথে কী বীভৎস দৃশ্য দেখে এলাম—ভাবলে এখনও সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে। মা, বদনগঞ্জে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের জঘন্য ভাবে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—মেয়েদেরও রেহাই দিচ্ছে না। মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে পথে।" শ্রীশ্রীমা এই কথা শুনেই কেমন যেন ঝলসে উঠলেন। ক্রোধে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণার সুরে বললেন: 'জান, ইংরেজের পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। দেরী নেই। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।·· যে রাজ্যে নারী নির্যাতন চলেছে, সে-রাজত্বের ধ্বংসের দেরী নেই'।"

(—সুজিত নাগ-সম্পাদিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা স্মৃতি', পৃষ্ঠা ৩২৬—২৭)

শ্রীশ্রীমাকে সর্বদাই স্বদেশ তথা মাতৃভূমির জন্য যে কোনও ত্যাগ বরণে অথবা মুক্তিসাধক সর্বপ্রকার আলোড়নে গভীর সহানুভূতিসম্পন্না দেখা গেলেও, তিনি কিন্তু সদা সতর্ক থাকতেন যাতে তাঁর সন্তানদল কোনও ভাবে বিপথগামী হতে না পারে। স্বদেশী কার্যকলাপের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। পবিত্র মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সহ নিছক একটা হল্লা মাচানোকে তিনি কোন দিনই প্রশ্রয় দেন নি। মায়ের সতত নির্দেশ ছিল, মাতৃভূমির কল্যাণে আত্মনিয়োগমূলক। স্বদেশীর লক্ষ্য হবে গঠনমূলক কর্মে নিয়োজিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন, কল্যাণবিধান,—এইরূপই ছিল মায়ের সব উপদেশ। আর এ-কথাও তিনি পুনঃ পুনঃ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের যাবতীয় আন্দোলন ও গঠনমূলক কর্মের মূল নিহিত থাকবে আধ্যাত্মিকতায়। শ্রীশ্রীমায়ের মুখে কতোবার উচ্চারিত হয়েছে: "শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ।"

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জয়রামবাটীর কাছে কোয়ালপাড়া গ্রামে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক কেদারনাথ দত্তের নেতৃত্বে একটি যুব-সংগঠন তৈরী হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলের কয়েকটি ছাত্র ও পল্লীর আরও কিছু তরুণ উদ্যোগীকে নিয়ে

কেদারনাথ ঐ সংগঠনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে একটি আশ্রম স্থাপনা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের কালে ঐ অঞ্চলে কোয়ালপাড়া আশ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হয়ে উঠেছিল। বিলাতী দ্রব্য বর্জন, বিলাতী জিনিস পুড়িয়ে ফেলা প্রভৃতি স্বদেশী-কর্মসূচীতে ও স্বদেশী প্রচারণার কাজে সেদিনের ঐ যুবকগোষ্ঠী বাঁকুড়া জিলায় বিশেষ অগ্রণী ছিল বলে পুলিশের নজর আশ্রমের উপরে খুব তীব্র ছিল। এমনকি আশ্রমে কে আসছে, কে যাচ্ছে, কত সময় থাকছে, পুলিশ সব নথীভুক্ত করে নিত,—আগন্তুকদের নাম, ধাম, পরিচয়াদিও সবই পুলিশের খাতায় উঠে যেত। ঐ আশ্রমের ছেলেরা নিয়মিত জয়রামবাটীতে যাতায়াত শুরু করায়, শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহদৃষ্টিতে তাঁরা পড়ে গিয়েছিলেন স্বাভাবিক কারণেই। ক্রমে কেদারনাথ, কিশোরী, বরদা প্রভৃতি ছেলেরা মায়ের বিশেষ কৃপালাভের অধিকারীও হয়েছিলেন। উত্তরকালে তাঁরা সকলেই সংসারত্যাগী হয়ে যথাক্রমে কেশবানন্দ, পরমেশ্বরানন্দ ও ঈশানানন্দ নামে সুপরিচিত হন। এঁরা সকলেই মায়ের কৃপাধন্য—তাই তাঁদের আশ্রমটিও জগন্মাতার কৃপাদৃষ্টির অন্তর্বর্তী হয়ে পড়েছিল। মা কলকাতা আসা-যাওয়ার পথে প্রায়ই ঐ কোয়ালপাড়া আশ্রমে থামতেন এবং বিশ্রামাদি করতেন,—মাঝে মাঝে কিছুদিন করে অবস্থানও করেছেন সেখানে। উক্ত আশ্রমের অদূরেই গ্রামের প্রান্তে কেদারনাথের পুরাতন ভিটা-বাড়ি 'জগদম্বা আশ্রম'-এ মা একবার প্রায় ৬ মাস বাস করেছিলেন,—১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা এটা। শ্রীশ্রীমা আশ্রমটিকে বলতেন "আমার বৈঠকখানা"। শ্রীশ্রীমা একদিন ঐ আশ্রমের কর্মীদের ডেকে সহসা বলেন: "ছাখো, তোমরা 'বন্দেমাতরম্' করে হুজুগ করে বেড়িও না,—তাঁত কর, কাপড় তৈরী কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা পেলে সুতা কাটি। তোমরা কাজ কর।" মায়ের এইরূপ আদেশ লাভ করে, আশ্রমের প্রত্যেক কর্মী নতুন কর্মপ্রণালীতে অনুপ্রেরিত হয়ে, সকলেই তাঁত ও চরকা কাটায় মন দিলেন। একদিন তাঁরা নিজেদের তাঁতে বোনা একখানি কাপড় শ্রীশ্রীমাকে পরার জন্য নিবেদন করেন। কাপড়ের বুনন মোটেই ভাল ছিল না, তথাপি মা তাঁর আপন সন্তানদের হাতে তৈরী ঐ মোটা কাপড়খানিকে সাহ্লাদে গ্রহণ করেছিলেন এবং অতিশয় আগ্রহ নিয়ে সেটি বেশ কিছুদিন পরেছিলেনও। ছোট্ট এই ঘটনাটির মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের নিজ উপদেশ ও আচরণের মধ্যে একটা অতি শিক্ষণীয় একত্ব—বিস্ময়কর সামঞ্জস্য আমাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে। তাঁর দূরদর্শিতা, কল্যাণচিন্তা এবং সর্বোপরি এক স্বচ্ছ পরিশীলিত মন—আমাদের শতধা বিক্ষিপ্ত, ভ্রান্ত দৃষ্টিকে কিছুক্ষণের জন্যও সুস্থির করে দেয়।

একদিন কেদারনাথ ও বরদা দু'জনেই জয়রামবাটীতে গিয়েছেন ;—মাতৃচরণে প্রণত হতেই মা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বলেন :

"ভাখো বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর ও আমাদের বিশ্রামের স্থান একটু করেছ, তখন এবার (কলকাতায়) যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো। পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করতে থাকবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে ? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ। যা' কিছু করো না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।"

মা কেদারনাথ, বরদা প্রমুখকে উল্লিখিত কথা ক'টি বলার মাত্র অল্প কয়দিন বাদেই ১৩১৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে (ইংরেজী ১৯১১-তে) একদিন খুব ভোরেই কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌছেছিলেন,—সন্ধ্যায় সেখান থেকে গোরুর গাড়িতে বিষ্ণুপুরে যেয়ে কলকাতায় যাবার জন্য ট্রেন ধরবেন। মায়ের সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মী-দিদি, মাকু এবং রাধু ও তাঁর স্বামী মন্মথ। মা এসেছিলেন একটি স্বতন্ত্র পালকিতে—সঙ্গে রাধু। তা'ছাড়াও আরও তিনটি পালকি ছিল। জয়রামবাটী থেকে আরও অনেকে এসেছিলেন সেবার মায়ের অনুগামী হয়ে—কেউ বা পায়ে হেঁটে, কেউ কেউ গোরুর গাড়িতে।

শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ব-আদেশ মতো শ্রীশ্রীঠাকুরের একখানি বাঁধানো ফোটোগ্রাফ প্রস্তুত রাখা ছিল। কেদারনাথ, বরদা প্রভৃতি কর্মীরা নিজেরা যুক্তি করে—সশক্তিক পূজাবিধিকে স্মরণ করে—শ্রীশ্রীমায়েরও একখানি ফোটোকে কাছেই রেখে দিয়েছিলেন—কিন্তু সে-সম্পর্কে মাকে বিন্দুবিসর্গও কিছু জানানো হয়েছিল না।

কোয়ালপাড়ায় পৌছেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে স্নান সেরে ফেলে, মা পূজায় বসে যান। ভাবে বিহ্বল মাতাঠাকুরানীর সেদিনকার পূজামূর্তিখানিকে যাঁরাই দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁরা এক বিস্ময়কর স্বর্গীয় আবেশে মগ্ন হয়েছিলেন। মা প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিখানিকে আপন মস্তকে স্থাপনা করে, নির্দিষ্ট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। পরে যেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাতেই, কেমন এক ভাবের সঙ্গে নিজের চিত্রপটখানিকেও অনুরূপভাবে মাথায় ঠেকিয়ে সেই সিংহাসনের উপরে ঠিক ঠাকুরের বাম পার্শ্বে বসিয়ে দেন। পটদ্বয় স্থাপনান্তে তিনি স্বহস্তে সচন্দন ফুল, বিল্বপত্রাদি সহযোগে পূজা করেন;—স্ব-প্রতিকৃতিতেও অর্চনা করেন, ঠাকুরকে যেমনটি করেছেন। এখানে স্মরণীয় সাদৃশ্য : দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের পূজিত

শ্রীরামকৃষ্ণ-আলেখ্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ফুল-চন্দনাদি দিয়ে পূজা করেছিলেন। কোয়ালপাড়া আশ্রমে সংঘটিত এই অনুষ্ঠানটিও অনেক কারণেই এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। স্বদেশী আন্দোলন তথা আমাদের যাবতীয় কর্মের মূল হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, মাত্র এই সত্যকেই মা সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা নয়,—সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানও স্বকীয় শক্তি সহায়েই সব কিছুর অবতারণা করে থাকেন এই অপ্রত্যাখ্যেয় তথ্যকেও বাস্তবায়িত করেছিলেন তিনি। তাঁর জগন্মাতৃত্ব-শক্তির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করলেন, এমন অভিনব একটি নীরব ঘটনার মাধ্যমে।

'সবার মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ। যা কিছু কর না কেন, তাঁকে ধরে থাকলে, কোন বেচাল হবে না।'

কেবল স্বদেশী আন্দোলনের নয়, সংসারে বিচরণের সকল দৃষ্টিভঙ্গিরই এক লক্ষ্য,—ঈশ্বর। ঈশ্বরকে ধরে সংসারচক্রে ঘুরলে পতনের আশঙ্কা নেই। নচেৎ নিছক আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম করলে,—তা সে যতো কঠিন প্রযত্নমূলকই হোক না কেন, তাতে বহুবিধ বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আরও একটি কথা, সকল কর্মের মূলে যদি ভগবান থাকেন - ঈশ্বরের প্রীতিসাধনই যদি একমাত্র কর্মলক্ষ্য হয়, তা'হলে কর্মের গতিপথে প্রাকৃতিক নিয়মে আগন্তুক যতো প্রকার সংঘর্ষ, বিবাদ, বিদ্বেষ, বিসংবাদই দেখা যাক না কেন,—সে-সবকেও অনায়াসেই অতিক্রম করা যায়। কোনও আন্দোলনই তখন আর বিভেদসূচক হয় না। অন্যায়দ্রোহিতাও পক্ষপাতহীন এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তখন,—বিবাদের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। শ্রীশ্রীমা তাঁর সন্তানদের সদামঙ্গলার্থিণী বলেই, তাদের প্রতিটি কর্মপ্রয়াসের মূলেই ঠাকুরকে বসিয়ে দিতে চাইতেন। স্বদেশী আন্দোলন, বিপ্লবাত্মক কর্ম, স্বাধীনতালাভের জন্য উদ্যম, বিদেশী অপশাসনের মূলোৎপাটন প্রভৃতি বীরোচিত দুঃসাহসিক কর্মের ক্ষেত্রেও মায়ের ঐ একই ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই কারণেই একটা সুস্পষ্ট ভগবদ্‌ভাব ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে দেখা গিয়েছিল তদানীন্তনের বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের চরিত্রে ও কর্মপ্রণালীতে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, সূর্য সেন প্রমুখদের হৃদয়াসনে শ্রীরামকৃষ্ণ আসীন ছিলেন এবং কী গভীর শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তিনি নিত্য অর্চিত হচ্ছিলেন, তা' আজ আর কারও কাছে অজ্ঞাত নেই। দেবব্রত, শচীন প্রভৃতির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ পরে প্রকাশ্যেই বলেছেন: "জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র নিছক একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়। জাতীয়তাবাদ হল ঈশ্বরপ্রদত্ত একটি ধর্ম। .. তোমরা যদি

জাতীয়তাবাদী হতে চাও, তোমরা যদি জাতীয়তাবাদের ধর্ম গ্রহণ করতে চাও, তা'হলে সেই ধর্মীয় ভিত্তি নিয়ে অগ্রসর হও। মনে রেখো, তোমরা হলে ঈশ্বরের হাতের যন্ত্রমাত্র।" ('Sri Aurobinda'—Vol. I, Sri Aurobinda Birth Centenary Lib. Pondichery. pp. 652-53)

"বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল তাই ভারতের এই নব জাতীয়তাবাদ আন্দোলনকে তত্ত্বতঃ একটি আধ্যাত্মিক আলোড়নের রূপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। "The new nationalist movement in India is essentially a spiritual movement"—এ-কথা বিপিন পালেরই। ('The Spirit of Indian Nationalism'—B. C. Pal. London. p. 11)

আমাদের কথা হচ্ছিল, কোয়ালপাড়ায় বিপ্লববাদী এক যুবকগোষ্ঠীর স্থাপিত একটি কর্মকেন্দ্রে শ্রীশ্রীমা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেখানে ঠাকুরঘর—তথা শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রপট ও তাঁর নিজেরই আলেখ্য একখানি যথাবিধি পূজাদি করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিভৃত এক গ্রামের প্রান্তে, সকলপ্রকার সংবাদসূত্রের অন্তরালে সংঘটিত এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির মধ্যে যে-গভীর তাৎপর্য নিহিত থেকে গেল,—তা' কি সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের পক্ষে অবলোকনীয় হয়েছিল? জয়রামবাটীতে যেদিন মা কেদারনাথ-বরদার কাছে সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেছিলেন—'এবার যাবার সময় ওখানে (কোয়ালপাড়া আশ্রমে) ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব',—মায়ের ঐ উক্তি শুনেই তাঁদের মনের প্রতিক্রিয়া এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মুখে অতঃপর যে বাণী উৎসারিত হয়েছিল, তা' জানতে পারা যায় স্বামী ঈশানানন্দের (বরদা মহারাজের) পরবর্তী কালের স্মৃতি-চারণা থেকে। তিনি লিখেছেন:

'কোয়ালপাড়া আশ্রমে'[১] তখন ধ্যান-জপ পূজাপাঠ অপেক্ষা তাঁত, চরকা ও স্বদেশী-প্রচার প্রভৃতির উপরই সকলের বেশি ঝোঁক, ঐ'জন্য পুলিশের দৃষ্টিও আমাদের উপর খুব ছিল। পুলিশের লোক দৈনিক আশ্রমে আসিয়া সকল খোঁজ খবর লইয়া যাইত এবং জয়রামবাটিতে নূতন লোক যাঁহারাই আসিতেন তাঁহাদের আসা-যাওয়ার সংবাদ, নাম, ধাম, আসিবার উদ্দেশ্য প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া যাইত। শ্রীশ্রীমায়ের কথার ('ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব') উত্তরে কেদারবাবু বলিলেন, "মা স্বামিজী তো দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকদের উৎসাহিত

১ কোয়ালপাড়া আশ্রমকে রামকৃষ্ণ মিশন অধিগ্রহণ করেন ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমানে ঐ আশ্রমটি জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের পরিচালনাধীন একটি শাখাকেন্দ্র

করে নিষ্কাম কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কতো কাজই না দেশের হত।" তাহা শুনিয়া মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি (ইংরেজ সরকার) কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোলা তরোয়াল। বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, 'মা, আপনার আশীর্বাদে এ যুগে লাফিয়ে না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুলুকে গিয়েছি। সেখানেও দেখলাম মা, ঠাকুরের কি মহিমা! কত সজ্জন আমার কাছে তাঁর (ঠাকুরের) কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছে এবং এই ভাব নিয়েছে!'" ঐ কথা বলিয়াই মা আবার বলিতেছেন, "তারাও (বিলাতের লোকরা) তো আমার ছেলে, কি বলো?"'

(—'মাতৃ-সান্নিধ্যে', পৃষ্ঠা ১৫-১৬)

* * *

অবগুণ্ঠনাবৃতা মা সকলের অগোচরে অবস্থান করেও, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দৃষ্টিপাতের দ্বারা কতো শত অগ্নিময় জীবনের গতিমুখকে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন, তার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ আজ অসম্ভব।

অতুলচন্দ্র গুহ ঢাকার ন্যাশনাল এইচ. ই. স্কুলের ছাত্র—মাত্র নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার অবকাশ মিলেছে জীবনে। উগ্র বিপ্লবের নায়ক পুলিন দাসের বিশেষ স্নেহ-ভাজন অতুল তখন নানা রকম অস্ত্রসঞ্চালনে শিক্ষাপ্রাপ্ত—একজন সুদক্ষ যোদ্ধা। বলিষ্ঠদেহী বালক অতুল ঢাকার অনুশীলন সমিতির সকল গুপ্ত কর্মপদ্ধতির প্রতি আস্থাবান ছিলেন না,—রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি সমিতির আদেশকে উপেক্ষা করতেও সাহসী হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে সেই অতুল বেলুড় মঠে চলে আসেন,—শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তেও আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছিলেন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। মায়ের কৃপাধন্য সেদিনের সেই বালক অতুলই উত্তরকালে বেলুড় মঠের ভরত মহারাজ—অগণিত জনের ভক্তিভাজন স্বামী অভয়ানন্দ।[১] বর্তমান গ্রন্থে স্বামী অভয়ানন্দের প্রসঙ্গ পূর্বেও এসেছে কয়েকবার।

শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ স্নেহপুষ্ট আশ্রিত সন্তান স্বামী প্রেমেশানন্দও বাল্যজীবনে

১ দ্রষ্টব্য: 'ধ্রুবতারা', পঞ্চম বর্ষ, পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের "স্মৃতির পৃষ্ঠায় ভরত মহারাজ"।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,—পূর্বাশ্রমে তাঁর স্বগ্রাম ফুলালীতে (শ্রীহট্ট জিলায়) বিপ্লবী সুহৃদ সমিতির ছিলেন তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রেমেশানন্দজী তখন ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য। ইন্দ্রদয়াল-সংস্থাপিত ফুলালী গ্রামের সেই বিপ্লবী সুহৃদ সমিতিই কালে শ্রীহট্ট রামকৃষ্ণ সেবাসমিতিতে রূপান্তরিত হয়—এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে। এখানে স্মরণীয় যে, ঐ বিপ্লবী সুহৃদ সমিতির সৃষ্টি ও তার উত্তরকালীন পর্যায়গুলিতে ইন্দ্রদয়ালের অনুগামী অপরাপর কয়েকজন কিশোরও ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা-লাভে ধন্য হয়েছিলেন—কেউ কেউ চিরতরে সংসারত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। প্রেমেশ মহারাজ একটি বহুউচ্চারিত ব্যক্তিত্ব, যাঁর নামোল্লেখ এই গ্রন্থে বহুধাবিন্যস্ত,—বিভিন্ন প্রসঙ্গে উদাহৃত।

দেবব্রত, শচীন, প্রিয়নাথ, অতুল, ইন্দ্রদয়াল ছাড়াও তখনকার অনুশীলন সমিতির বহু বিশিষ্ট কর্মী শ্রীশ্রীমায়ের পদাশ্রয় লাভ করেছেন,—কেউ কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ না করেও স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কৃতী হয়েছেন। তাদের নামের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান অসাধ্য জেনেও, অন্ততঃ কয়েকজনের নামোল্লেখ থেকে বিরত থাকতে পারছি না এখানে। আমরা স্মরণ করছি যাঁদের নাম, তাঁরা স্বীয় বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হয়ে সকলেরই শ্লাঘনায় হয়েছেন। যেমন—দেবব্রত বসু (প্রজ্ঞানন্দ), শচীন সেন (চিন্ময়ানন্দ), অতুল গুহ (অভয়ানন্দ—ভরত মহারাজ), প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত (আত্মপ্রকাশানন্দ), সতীশ দাশগুপ্ত (সত্যানন্দ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (সহজানন্দ), ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য (প্রেমেশানন্দ), দীনেশ দাশগুপ্ত (নিখিলানন্দ), যতীন্দ্র [ঈশ্বর] চক্রবর্তী (মুক্তেশ্বরানন্দ), বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (তপানন্দ), রাধিকামোহন অধিকারী (সুন্দরানন্দ), ধীরেণ দাশগুপ্ত (সম্বুদ্ধানন্দ), নিতাই দাস (বলদেবানন্দ) —এঁরা সকলেই সন্ন্যাসাশ্রম বরণ করেছিলেন এবং প্রত্যেকেই শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত। মায়ের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত—রামচন্দ্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, বিজয়কুমার নাগ, দীনেশ মুস্তাফি, কর্ণাটক চৌধুরী, সত্যেন্দ্র মজুমদার, রজনীকান্ত প্রামাণিক, নরেশ চক্রবর্তী, গৌরহরি ভট্টাচার্য, সুরেন কর, বিভূতিভূষণ ঘোষ, বিজয়কুমার বসু—এঁরা বিশিষ্ট বিপ্লবী কিংবা দেশকর্মী সকলেই। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদধন্যদের মধ্যে স্মরণার্হ—অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ প্রমুখ। শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিতা কন্যাদের মধ্যে মহিলা বিপ্লবীদের নাম—সুধীরা বসু, গিরিজা গুপ্তা, প্রফুল্লকুমারী বসু এবং অরবিন্দসহধর্মিণী মৃণালিনী বসু।

শ্রীশ্রীমা সারদা ছিলেন যেন নীরব শান্ত এক বনস্পতি, যাঁর প্রসারিত স্নেহ-চ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে ভারতের মুক্তি সৈনিকের দল তাঁদের জীবনের জ্বলন্ত দহনকে জুড়িয়েছিলেন,—এবং মুক্তি-সংগ্রামের উপযোগী সঠিক সপ্রাণ জীবন-রসও সঞ্চয় করেছিলেন মায়েরই করুণা-ধারা থেকে। সে-ধারায় ছিলনা হিংসা, দ্বেষ ও ভেদবুদ্ধির লেশমাত্রও।

ভারতের সেই অগ্নিযুগের এক অগ্রণী পুরুষ—বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ, যিনি বহু-বিখ্যাত দুর্ধর্ষ বিপ্লবী সংগঠন 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক —যিনি জীবিত ছিলেন এই কিছুদিন আগেও (প্রয়াণ : ৩১ অক্টোবর, ১৯৮১)—যিনি সাক্ষাৎভাবে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ, অথচ প্রত্যক্ষভাবে শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে ক্ষণেকের জন্যও উপনীত হতে পারেন নি,—জীবনের অন্তিমে তাঁকে কিন্তু দেখা যেত, কলকাতায় নিজের বাসভবনে যে-কক্ষে তিনি সারাক্ষণ থাকতেন, সেখানে দেয়ালে প্রলম্বিত উৎকৃষ্ট ফ্রেমে বাঁধানো শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর সুদৃশ্য ফোটোগ্রাফ্—ঠিক তাঁর মাথার উপরেই। কৌতূহলী এক জিজ্ঞাসার উত্তরে সেই মহাবিপ্লবী জানিয়েছিলেন :

"হ্যাঁ, মায়ের ছবি রেখেছি আমি। যদিও আমি মনে করি মায়ের স্বরূপ বোঝা খুবই কঠিন। কারণ স্বয়ং ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : 'ও কি যে সে! ও আমার শক্তি। ওর শক্তির আলোতেই আমি শক্তিমান।' দেখুন, স্বামিজী বলেছেন তাঁর শক্তির উৎস ঠাকুর, আর ঠাকুর বলেছেন তাঁর শক্তির উৎস মা। অর্থাৎ স্বামিজীর শক্তির উৎসেরও উৎস তিনি। স্বামিজী তো তাই মাকে ঠাকুরের উপরে স্থান দিতেন। সে তো আপনারা ভাল করেই জানেন। বলতেন 'জ্যান্ত দুর্গা'। এমনি যে-দুর্গার চিত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে তা কল্পনা করতেই মাথা ঘুরে যায়। আবার জ্যান্ত দুর্গা![1] সুতরাং মা যে কী তা ধারণা করা অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু তবু কেন রেখেছি তাঁর ছবি মাথার উপরে জানেন? মাকে আমার ভাল লাগে। মা কী, মা কত বড় তা বুঝি না। বুঝার আকাঙ্ক্ষাও নাই। শুধু বুঝি তিনি মা।"

হেমচন্দ্রের সঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সাক্ষাৎকার (২৬ এপ্রিল, ১৯৮১) থেকে আমরা উল্লিখিত তথ্য জেনেছি। ঐ সাক্ষাৎকার-সূত্রে আরও জানা গেছে হেমচন্দ্রের জবানবন্দি : "বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এই

---

১ শিল্পী অসিত হালদারের অঙ্কিত রূপ-রেখায় 'ভারতমাতা' চিত্রে এই 'জ্যান্ত দুর্গা'-কে খুঁজে পাওয়া কঠিন কি? বর্তমান গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চিত্র তুলনীয়।

সন্দেহে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তখন বেলুড় মঠের উপর অসন্তুষ্ট ছিল এবং মঠকে রাজদ্রোহ-মূলক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে নিষিদ্ধ করার চেষ্টাও হয়েছিল। শুনেছি এই সময় মা-ই এই সব ছেলেদের মঠে যোগদানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই এঁরা মঠে স্থান পেয়েছিলেন।" কথোপকথনের কালে সেই তেজোদৃপ্ত কণ্ঠেও 'মা'-শব্দটি অতিশয় আবেগসহ উচ্চারিত হয়েছিল, সাক্ষাৎকারকারীর বিবরণীতে তা'ও ব্যক্ত হয়েছে।

যন্নবতি বর্ষের উজ্জ্বলিত কিন্তু নিবার্ণোন্মুখ এক আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত বিদায়কালীন স্ফুলিঙ্গরাশি যে এতো স্নিগ্ধ আলোকময়—এমন মাতৃভক্তির কিরণে সমুজ্জ্বল, তা' কি ঐ আগ্নেয়গিরির স্ব-মহিমাতে, অথবা সর্বকল্যাণময়ী বিশ্বমাতৃত্বেরই অলৌকিক বিভূতিতে! অনুধ্যানীয় বিষয় আমাদের সেটাই। অগ্নিযুগের এক বিশাল ব্যক্তিত্বের হৃদয়ানুভূতি আমাদের মাতৃ-চিন্তনের সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে। হেমচন্দ্র ঘোষ স্পষ্টতঃই বলেছেন—তাঁর বিপ্লবীসুলভ ভাষায়ঃ "ঐ শান্ত সমাহিত নীরব জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতিবিপ্লবের বীজ।...নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে তার কাজ ঠিক চলেছে—মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌছে দেওয়াই হল এ-বিপ্লবের প্রকৃতি। আগামীকালের মানুষ দেখতে পাবে যে, এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ সমগ্র জগৎকে প্লাবিত করে দিয়েছে।"

*　　*　　*

"যা হবার হবে ঠাকুরের ইচ্ছায়, ছেলে এখানে আমার কাছেই থাকবে।"

মায়ের দৃঢ় নির্দেশ। কিছুতেই ছাড়বেন না ছেলেকে। ছেলেরও প্রবল আকাঙ্ক্ষা মায়েরই অভয় পদতলে থেকে যাবেন। কিন্তু অন্যান্য সকলেই প্রতিবাদী এ-ব্যাপারে,—তাঁদের যুক্তিজালও ছেদনযোগ্য নয়। অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন সবাই।

সন্তান জ্ঞান—স্বামী জ্ঞানানন্দ জয়রামবাটীতে দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া ভোগান্তে কাটিহারে গিয়েছিলেন চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্তনের জন্য। পরিচিত এক গুরুভ্রাতা কাটিহারে ডাক্তার ছিলেন। জ্ঞানানন্দ তাঁরই গৃহে অবস্থান করে চিকিৎসিত হচ্ছিলেন এবং ক্রমে সুস্থও হয়ে উঠছিলেন। ডাক্তারবাবুর দুই কনিষ্ঠ সহোদর সন্ত্রাসবাদীদের দলভুক্ত এবং তখন পলাতক ছিলেন। ডাক্তারবাবু যদিও সরকারী

হাসপাতালে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি পুলিশ সন্দেহ করতে কসুর করেনি যে আগন্তুক সন্ন্যাসীও সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল, সন্দেহভাজন সন্ন্যাসীকে আটক করে রাখবে। ডাক্তারবাবু রাজকর্মচারী— অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন তখনকার সেই পরিস্থিতিতে। নিজ পদমর্যাদার প্রভাব প্রয়োগ করে স্বয়ং জামিন হয়ে জ্ঞান মহারাজকে মুক্ত রাখলেন—কিন্তু শর্তাধীনে। শর্ত হয়েছিল এই যে, পুলিশের তলব পেলেই, সন্ন্যাসীকে হাজির করে দেবেন তিনি। নজরবন্দী জ্ঞানানন্দ কাটিহারে ডাক্তারবাবুর কাছেই বাস করতে লাগলেন। মাস কয়েক এই ভাবে কেটে যায়। সহসা জ্ঞানানন্দের মন উতলা হয়ে ওঠে মায়ের জন্য। শ্রীশ্রীমা তখন কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে অসুস্থ অবস্থায় অবস্থান করছেন। যা' হোক, মাতৃদর্শন-ব্যাকুল সন্তান এক গভীর রাত্রিতে কাটিহার ত্যাগ করে সোজা কোয়ালপাড়ার পথে যাত্রা করেন।

দূর-প্রবাসী সন্তানকে পুনরায় কাছে পেয়ে, মায়ের প্রাণ শীতল হল। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত তার চেহারা মাকে চিন্তামুক্ত ও প্রফুল্ল করেছিল। এদিকে কথাটা যখন ব্যক্ত হয়ে পড়ে যে, মাতৃসকাশে প্রত্যাগত জ্ঞান তখনও অবধি পুলিশের নজরবন্দী—এবং সেই ডাক্তারবাবু বেশ মোটা অঙ্কের টাকার জামিনে দায়বদ্ধ রয়েছেন। কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত সকলেই জ্ঞানানন্দকে অবিলম্বেই কাটিহারে চলে যেতে বলেন এবং মায়ের কাছে এক দণ্ডও থাকতে নিষেধ করেন। মায়ের বাড়ির উপর এমনিতেই পুলিশের কড়া নজর,—পুলিশের খাতায় 'মাতাজীর আশ্রম' এক গুরুতর সংশয়-কেন্দ্র! নানা ধরনের অশান্তির আশঙ্কায় তখন সকলেই বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন।

জ্ঞানানন্দ যুক্তি বুঝলেন। তিনিও তো আন্তরিক চান না যে, তাঁকে নিয়ে অবশেষে মায়ের এখানে কোনরকম পুলিশী হাঙ্গামা শুরু হয়। তাই তিনি স্থির করলেন, অচিরেই কাটিহারে ফেরত চলে যাবেন। সমুপস্থিত সকলে এবং সমস্ত জ্ঞানানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের সমীপে যেয়ে সব ব্যাপারটি খুলে প্রকাশ করেন,—জ্ঞানানন্দের ফিরে যাবার সিদ্ধান্তটিও মাকে নিবেদন করেন। কাটিহারে ফিরে যাবার কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্রই, মা অতীব বেদনাহত হন—অশ্রুভরা চোখে তৎক্ষণাৎ তাঁর তীব্র আপত্তিকে ব্যক্ত করেন: "যা হবার হবে ঠাকুরের ইচ্ছায়, ছেলে এখানে আমার কাছেই থাকবে।"

ছেলে জ্ঞানানন্দেরও কি প্রাণ চাচ্ছিল মাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে! মহা-বিপত্তির উদ্ভব হল। অথচ অন্তরঙ্গদের যুক্তিও ছিল অনুপেক্ষণীয়—অবশেষে এই

জ্ঞানানন্দকে উপলক্ষ করে পুলিশের হানা শুরু হয়ে যাবে মায়ের বাড়িতে—তাতে উপদ্রব আরও বৃদ্ধি পাবে, অনেক অশান্তির সৃষ্টি হবে। তা'ছাড়া কাটিহারের সেই নিরপরাধ ডাক্তারবাবুর সমূহ বিপদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে, তাঁর ব্যক্তিগত মান-সম্মানের হানি হবে,—সমগ্র পরিবারই নানাবিধ দুঃখকর পরিস্থিতিতে জড়িয়ে যাবে। অবুঝ মায়ের প্রাণ! বাহ্যিক কোনপ্রকার যুক্তি সেখানে অচল। সে-রাজ্যে সমাজ-সংসারের রীতি-নীতির প্রয়োগ অসম্ভব! মাতা-পুত্র অশ্রুপ্লাবনে একাকার। যা'হোক, সকলে মিলে ছেলেকে আলাদা ডেকে বুঝানোতে—ফল হয়েছিল। জ্ঞানানন্দ কাটিহারে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এই শেষই কিছু সর্বশেষ নয়,—শেষেরও পরে আরও শেষ আছে। আমরা সেই পরিপূর্ণ শেষের দৃশ্যটির জন্য প্রতীক্ষায় থাকছি।

পূজনীয় সারদানন্দ মহারাজও সেই সময়ে জয়রামবাটী উপস্থিত ছিলেন,—সঙ্গে যোগীন-মা প্রমুখ আরও অনেকে। কেননা মা তখন অসুস্থ ছিলেন। সারদানন্দজীও জ্ঞানের কাটিহারে ফিরে যাওয়াকেই সমর্থন করেছিলেন। সকলের সম্মিলিত সম্মতিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে, জ্ঞানানন্দ তখন নিজেই গিয়ে মায়ের চরণপ্রান্তে উপবেশন করেন এবং ধীরে ধীরে মাকে সব কথা,—অবধারিত বিপদের বিশদ চিত্র নিবেদন করে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করেন। মা যখন বিশেষভাবে জানলেন যে, শরৎ মহারাজেরও ইচ্ছা যে জ্ঞানানন্দ অবিলম্বে কাটিহারে চলে যাক,—তখন তিনি চোখের জলের সঙ্গে সন্তানের যাবার অনুমতি প্রদান করেন। মাতা-পুত্র উভয়েরই সেই অশ্রুকরুণ বিদায়কালীন দৃশ্যটি ছিল বড়ই মর্মন্তুদ। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত মায়ের নয়নজলের বিরাম ঘটেনি।

না,—এখানেও শেষ হয়নি কাহিনী। কিছুদিন বাদেই স্বামী জ্ঞানানন্দের অনুসন্ধানে পুলিশের শিকারদৃষ্টি জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ির প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। জানা গেল, শিরোমণিপুরের পুলিশ ফাঁড়ির দারোগা আসছেন জয়রামবাটীতে—পুলিশের উপরওয়ালাদের আদেশে জ্ঞানানন্দ সম্পর্কে তদন্তের জন্য। খবরটি বেশ উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল মায়ের বাড়ির সবারই মনে। নানা রকম অশুভ উৎপাতের আশঙ্কায় সকলেই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার লক্ষ্য করা গেল,—মায়ের অন্তরে বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তার কোনও কারণ ঘটেনি। এমন সময়ে আরামবাগের প্রসিদ্ধ আইনজীবী মায়েরই আশ্রিত সন্তান মণীন্দ্রবাবু সহসা মায়ের বাড়িতে আগমন করায়,—সকলেই একটু স্বস্তি বোধ করেছিলেন, যদি কোনও ঝামেলা দেখা দেয় পুলিশী তদন্তের কালে, তা'হলে তা' সামলাতে পারা যাবে

মণীন্দ্রবাবুর সহায়তায়। মণীন্দ্রবাবুও জয়রামবাটীতে থেকে যান, দারোগা সাহেবের আগমন অপেক্ষায়।

শিরোমণিপুর থেকে পুলিশ পার্শ্বচর সহ দারোগা সাহেব সত্যিই এসে এক অপরাহ্নে মায়ের বাড়িতে হাজির হলেন। মণীন্দ্রবাবুই তাঁদের অভ্যর্থনা সহকারে বসিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন,—পুলিশ-কর্মচারীরাও তাঁদের যা জানার সবই ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছিলেন। দারোগা সাহেব তাঁর আগমনোদ্দেশ্যকে খুব খোলাখুলিভাবে প্রকাশ না করেও, জ্ঞানানন্দ সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধেয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলিকে অবহিত হয়ে যাচ্ছিলেন ঐ-সব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে। শ্রীশ্রীমা সত্যিই এক ভিন্নমূর্তিতে প্রকট ছিলেন সেদিন। পুলিশ-দারোগার জন্য স্বয়ং জলখাবার তৈরী করতে ব্যস্ত তিনি,—পরে খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে মায়ের আহ্বানে দারোগাবাবুকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলে, সে-এক আশ্চর্য হৃদয়-মথিতকারী দৃশ্য! দর্শনমাত্রেই দারোগাবাবু ভূমিষ্ঠ হয়ে ভক্তিভরে শ্রীশ্রীমায়ের পদতলে লুণ্ঠিত হলেন,—প্রণত সন্তানকে মাও অতি স্নেহে আশীর্বাদ করলেন। মা যেন কতোদিন পরে তাঁর আদরের ছেলেটিকে কাছে পেয়েছেন, স্নেহকাতর ছেলেও পরম শান্তিতে উপবিষ্ট হয়েছেন তাঁর আপন জননীর চরণ সকাশে। মা-ছেলেতে কতো কথা!! ছেলেকে মা নিজ তত্ত্বাবধানে জলখাবার খাওয়াচ্ছেন—এটা খাও, সেটা নাও বলছেন!! সন্তানটিও মায়ের স্নেহের নির্দেশ সব মেনে নিচ্ছেন,—তৃপ্তির সঙ্গে মাতৃদত্ত আহার্য গ্রহণ করে তাঁর দেহ-মনকে নিরাময় করে নিলেন যেন। মায়ের মুখের দু'চারটি মিষ্টি কথার মধ্যেই দারোগা সাহেব জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পর্কে যা' কিছু অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য, তা' সবই পেয়ে গিয়েছিলেন,—তাঁর তদন্তকর্মও সমাপ্ত করতে পেরে অতিশয় স্বস্তিবোধ করছিলেন। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদেশানন্দজীর ভাষাই উদ্ধৃত করব অতঃপর:

"দারোগা খাইতে খাইতে মায়ের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতেই মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানকার্য সুসম্পন্ন করিয়া লইলেন। পান মুখে দিয়া মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় মাগিলেন। অতি সরল ও প্রসন্ন চিত্তে মা-ও শুভকামনা করিয়া সন্তান-বাৎসল্যেই তাঁহাকে বিদায় দিলেন। এই ভাবেই বিষম ভাবনার বিষয়—পুলিশ-তদন্ত, সহজ সরলভাবে সম্পন্ন হইয়া গেলে উপস্থিত সকলের মনও খুব প্রসন্ন হইল। কিন্তু একটা কথা উপস্থিত কাহারও কাহারও হৃদয় স্পর্শ করিল। দারোগা মহাশয় যখন উপস্থিত হন, তখন তাঁহার বদনমণ্ডল ভাবাচ্ছন্ন গম্ভীর অপ্রসন্ন ও চিন্তান্বিত দেখা গিয়াছিল। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গে কথাবার্তাও খুব

খোলা মনে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এমনকি বাড়ির ভিতরে যাইবার সময়ও তাঁহাকে নতমস্তকে চিন্তিতভাবে ধীর পদক্ষেপ করিতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়ার পরই, বিশেষভাবে যখন মা পাশে বসিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার চোখের ভাব বদলাইয়া অতি সরল প্রসন্ন হইয়া উঠিল; মনে হইল তিনি যেন নিজের জননী অথবা দুহিতার নিকট বসিয়া খাইতেছেন, সরস গল্প করিয়া করিয়া। বিদায়ের সময় সকলেরই সঙ্গে বিশেষ প্রসন্নচিত্তে প্রাণ খুলিয়া সহর্ষে কথা বলিয়া নমস্কারাদি করিয়া প্রিয়জনের মতোই প্রত্যাবর্তন করিলেন।

"মা. তোমার বাক্যে, ব্যবহারে—বিশেষতঃ সন্তানদিগকে কিছু খাওয়ানোর ব্যাপারে কি মাধুর্যময় জাদু ছিল, তুমিই জান!"

(—'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা', পৃষ্ঠা ১৭২-১৭৩)

* * *

মা জাদুকরীই বটে! তাঁর বাক্যে জাদু, ব্যবহারে জাদু,—স্বহস্তে সন্তান-আপ্যায়নেও ততোধিক জাদু,—মাধুর্যময় জাদু ছিল। স্বামী সারদেশানন্দের স্মৃতিপটে বিধৃত আরও একটি এরূপ জাদু-চিত্র আমাদের চিত্তকে বিস্ময়াবিষ্ট করে। মাতৃত্বের জাদু যাঁকেই স্পর্শ করেছে, তিনিই রূপান্তরিত হয়েছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিতে,—জাদু-প্রভাবে পরিবেশ ও পরিস্থিতিও অন্য আকারে প্রতীত হয়েছে।

সম্ভবতঃ ১৩২৫ বাংলা সনের কথা। জগদ্ধাত্রী পূজার দুই চারদিন পরে, বাঁকুড়া জিলার পুলিশ প্রশাসনের এক বড় কর্তা—ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, স্বয়ং পালকি চেপে পাইক পেয়াদা সহ জয়রামবাটীর 'মাতাজীর আশ্রম' পরিদর্শনে এসেছিলেন। বাঙালী অফিসার—দোর্দণ্ড প্রতাপের জন্য সুবিদিত ছিলেন। মায়ের বাড়িতে তখন শ্রীযুক্ত বিভূতিবাবু সহ আরও কয়েকজন সন্তান উপস্থিত থাকাতে ভালই হয়েছিল। বিভূতিবাবু আগেই পরিচিত ছিলেন ঐ ডি. এস্. পি. সাহেবের সঙ্গে,—তিনিই তাঁকে অভ্যর্থনা করে পালকি থেকে নামিয়ে এনে বহির্বাটিতে বসান এবং উপস্থিত সবার সঙ্গে পরিচয়াদি করিয়ে দেন। ডি. এস্. পি. মায়ের বাড়ি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে, নানা ধরণের কথাবার্তার মাধ্যমে অনেক রকম খোঁজ খবর করতে থাকেন। এবার বিভূতিবাবু তাঁকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে

যান—সেখানে ঘরের বারান্দায় তাঁর জলখাবারের জন্ম আসন ইত্যাদি পাতা হয়েছিল,—শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেখানকার ব্যাপারটি ছিল সকলের অগোচর,—সেখানে জাদুকরী মা এবং আগন্তুক পুলিশ-কর্তা ছাড়া কেউই উপস্থিত ছিলেন না। সারদেশানন্দজীর নিজের কথায়ঃ "সেখানে মাকে দর্শন, জলখাবার খাওয়া এবং মায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা—এসব আমাদের দেখিবার শুনিবার সুযোগ হয় নাই।"

সকলেই বাইরে প্রতীক্ষারত। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ বাইরে নেমে এসে ভিতর-বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়েছেন,—শ্রীশ্রীমা-ও সেখানে এসে একেবারে সম্মুখেই দণ্ডায়মান হলেন। পুলিশকর্তার চোখ-মুখের স্বাভাবিক কাঠিন্যভাব কোথায় মুছে গিয়েছে তখন! যেন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সন্তান বিদেশে যাত্রারত,—ঠিক তেমনই কোমল ভক্তিস্নিগ্ধ মুখশ্রী ফুটে উঠেছিল তাঁর নয়নে ও আননে। অথবা, যেন এক স্নেহময় পিতা তাঁর আদরের কন্যাকে দেখে ফিরে যাচ্ছেন স্বগৃহে বা আপন কর্মস্থলে,—কন্যার প্রতি পিতার যে সুমধুর বাৎসল্যদৃষ্টি তাই-ই তখন পুলিশ কর্তার নয়নপাতে ব্যক্ত হয়ে পড়ছিল।

বিদায়কালীন সেই জাদু-সিক্ত কথোপকথনের দুই-একটি যা' শোনা গিয়েছিল, তা' ছিল এইঃ

"এ-সবে ভয় করে নাকি তোমার ?"

"হ্যাঁ বাবা! আমার ভয় করে।"

ভীতি-সংবিগ্না কন্যার এই মৃদুস্বর শুনে, পিতৃকণ্ঠে আশ্বাস-বাক্য উচ্চারিত হল তৎক্ষণাৎ,—

"কোন ভয় নেই মা। আমি সব ঠিক করে দিয়ে যাব।"

অতঃপর শ্রীশ্রীমায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি অপলকে আরও একটিবার কি যেন দেখে নিলেন। পরে পুলিশ-কর্তা পালকিতে গিয়ে উঠে বসলেন। মা-ও পালকির যাত্রাপথে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন,—যেন পুত্রকে বিদায় দিয়েছিলেন অন্তর উজাড় করে আশিস্ বর্ষণসহকারে, অথবা স্নেহের দুলালী যেন তাঁর পিতার গমনপথের পানে পুনরাগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষায় থাকছিলেন। অবশ্য স্বামী সারদেশানন্দ তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন—

"জানি না পুলিশ-কর্তার অন্তরের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া মায়ের সুমধুর বাণী ও সকরুণ দৃষ্টি সেখানে কোন স্থায়ী রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি-না,

কিন্তু সেই সময়ে এই অলৌকিক 'কন্যা'-র স্নেহ প্রীতি তাঁহার হৃদয় স্নিগ্ধ ও সুশীতল করিয়াছিল নিশ্চয়।"

ঘটনার চিত্রাঙ্কন করেছেন সারদেশানন্দজী তাঁর স্বকীয় অনুভূতির তুলিতে। পরে তিনি আপন ভাবকে ব্যক্ত করেছেন অনবদ্য কথায়ঃ

"...মা বলিয়া না আসিয়া অন্য কারণেও যাহারা তাঁহার (শ্রীশ্রীমায়ের) দৃষ্টির সম্মুখে আসিবার সুযোগ সৌভাগ্য পাইয়াছিল, তাহারাও তাঁহার অহেতুক করুণা ও অপার মাতৃস্নেহ আস্বাদন করিয়া হৃদয় সুশীতল করিয়াছে। আর এই জীবনে বরাবর সেই স্মৃতি চিত্তপটে উজ্জ্বল না থাকিলেও বিলুপ্ত হইবার নহে; ত্রিতাপ যখন অসহনীয় জ্বালায় দগ্ধ করিবে, তখনই সেই লুক্কায়িত উৎস হইতে শান্তিবারি উৎসারিত হইয়া হৃদয় শীতল করিবে। ভাগ্যবান যাঁহারা, তাঁহাদের পরলোকেরও সঙ্গী হইবে সেই মুখচ্ছবি। পুলিশবেশধারী এই সকল ভাগ্যবানের জন্মজন্মান্তরে বহু সুকৃতি ছিল, সন্দেহ নাই!"

(—'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা,' পৃষ্ঠা ১৭৬)

আমরা জানতাম, যে-কেউ মা বলে মায়ের কাছে এসেছে, সে-ই ত'র হৃদয়পাত্র ভরে নিয়েছে মায়ের অবারিত স্নেহধারায়, কৃপা-বারিতে। এখন জানলাম, মা বলে না এসেও—নিতান্তই অন্য কারণে নিছক একজন আগন্তুকও মায়ের স্নেহ-কৃপায় সমানই অধিকারী হয়ে ফিরেছে। অবশেষে সে-ও নিজের মা বলে চিনতে পেরে, মাকে মা-রূপেই পেয়ে ধন্য হয়েছে। "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—সা দেবী সারদা। সেই তাঁকেই পুনঃ পুনঃ নমস্কার জানাই। "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ"॥ "নিখিল মাতৃহৃদয়-সাগর-মন্থন-সুধা মুরতি"॥

মাতৃভাবই বর্তমান বিশ্বে এক বিশিষ্ট আদর্শ—এ যুগের অবতীর্ণ ভগবানও যা স্বয়ং সেধেছেন এবং দেখিয়ে গেছেন। সর্বার্থসাধিকা এই মাতৃভাবই হচ্ছে, সর্বসমন্বয়কারিণী সেই জাদুশক্তি, যার বলে সর্বভেদ-বৈষম্য, বিবাদ-দ্বন্দ্ব, ত্রাস-আশঙ্কা, ভয়-ভাবনা নিরসন হয়ে যায় নিঃশব্দে শান্তিতে। শ্রীশ্রীমা সারদা এই জাদু সহায়েই—সকল বিভেদ ভঞ্জন করেছেন, সমকালীন সমুপস্থিত সকলের। তৎকালীন সমাজ-আলোড়নকারী সমস্ত ব্যাপারের সহজ সমাধান করে দিয়েছেন মা একমাত্র এই জাদু দিয়েই। তখনকার আশ্রমাদির প্রতি পুলিশের রোষদৃষ্টি তথা রাজনৈতিক অশান্তিও যে প্রশমিত হয়েছিল, শ্রীশ্রীমায়েরই অমন মাধুর্যময়ী জাদুপ্রভাবে,—সে-কথা আর ভাষা দিয়ে প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না।

* * *

"বাবা জান তো, ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখতেন; সেই মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।"

শ্রীশ্রীমায়ের এমন উক্তি বহুশ্রুত, বহুবিদিত। যুগের ঈশ্বর এবারে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে যেন এই সর্বব্যাপী মাতৃভাবকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন—তাঁর লীলায় ও শিক্ষায়, সাধনায় ও দেশনায়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছেন মা-ময় বিশ্ব—জগৎ-জোড়া মা। জগৎকারণকে তিনি ডেকেছেন 'মা' নামে,—তিনি অপরোক্ষ করেছেন 'মা'-ই সব হয়েছেন। তিনি আরও এক মহতী কার্য সাধন করেছেন, অখিল মানবসন্তানের জন্য এমনই এক মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন, যাঁকে আপামর সকল জীবই অসঙ্কোচে অনায়াসে 'মা' নামে সম্বোধন করতে পারবে,—যাঁর অভয় স্নেহাঙ্কে আশ্রয় পেয়ে সংসারের ত্রিতাপদহন-জ্বালাকে চিরতরে জুড়াতে পারবে তারা।

নরলীলা নরবৎ। অবতারলীলার মাধুর্যরস এখানেই। সন্তান ছাড়া মা হবেন কেমন করে?—তিনি তো আর সাজানো কি পাতানো মা নন্। তিনি যে সবার মা,—সত্য সত্যই মা। তাই তো দেখি, স্বয়ং মুখফুটে একদা মা সন্তান-প্রার্থনা করে বসলেন তাঁর পতিদেবের কাছে। জগৎপিতার হৃদয়মথিত হয়েছিল নিশ্চয়ই সে-প্রার্থনাতে—তাই তো সেই আকুতিকে মঞ্জুরও করেছিলেন অনতি-বিলম্বেই। মা উত্তর পেয়েছিলেন: "তোমার এত ছেলে হবে যে, তুমি 'মা'-বোলে তিষ্ঠাতে পারবে নি।" শ্রীশ্রীমা স্বমুখেই এই কথা ব্যক্ত করেছেন বহু জনের কাছে—সঙ্গে আরও কথা যুক্ত করেছেন "তাই আজ দেখছি বাবা, কত দেশ-দেশান্তর থেকে কত ছেলেই যে আমার আসছে!"

যিনি অদৃষ্ট-অশ্রুতপূর্ব মাতৃ-মহিমায় ভাবী বিশ্বমানবের প্রতিটি হৃদয়াসনে সুপ্রতিষ্ঠিতা হবেন, যৌবনে তাঁর মধ্যে ভবিষ্য মাতৃভাবের উন্মেষ-লক্ষণ অতিশয় নৈসর্গিক কারণেই যে ফুটে উঠেছিল, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ব্রহ্মাণ্ডের জনক যাঁর পতি—তাঁর কাছে জননীর সন্তান-কামনা তো খুবই স্বাভাবিক। এখানে এই কামনার মধ্যে আদৌ কোনও দেহসুখ-বাসনার ছলমাত্রও ছিল না,—সাময়িক কোনও ভাবে কারও দ্বারা প্ররোচিত হয়েও নয়। সাধারণের চক্ষে ঘটনাটিকে যে-ভাবে দেখা হয়ে থাকে, সেটা নিতান্তই এক বিসদৃশ অর্বাচীন দৃষ্টি বলেই আমাদের মনে হয়। তার প্রথম প্রমাণ: দেশদেশান্তরের অজস্র সন্তানের

গরবিনী জননীর ঐ গরিমাদীপ্ত স্বীকারোক্তি। দ্বিতীয় প্রমিতিঃ তাঁর উত্তরকালীন সর্বাত্মিকা অ-মায়িক মাতৃত্বের সুষমায় প্রোজ্জ্বল জীবনবৃত্ত,—দেশ-জাতি-কুল-শীল-নির্বিশেষে অযুত অজস্র পুত্র-কন্যা যার উৎসারিত স্নেহধারায় তৃপ্ত, ধন্য, নিবৃত্তশোক ও শান্ত হয়েছে, এখনও হয়ে চলেছে এবং অনাগত কালেও হতেই থাকবে।

দেখা-অদেখা, চেনা-অচেনা, জানা-অজানা সারা পৃথিবী জুড়েই মায়ের সন্তান,—অহর্নিশ তাদের জন্য কল্যাণ-ভাবনা; কতোই-না উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা,—কতো উন্নিদ্র নিশিযাপন, কতো জপ-তপ-প্রার্থনা! সকলেরই আবদার, আর্তি,—সবার বিচিত্র বিনতি, বহুবিধ বায়নাক্কা, মা সমস্তই পূরণ করছেন। এমনকি সন্তানের অবিবেচনা-প্রসূত অদ্ভুত সব উপরোধ আকুতিকেও মা ঠেলে ফেলতে পারতেন না—অলক্ষিতে তাদের দোষ ত্রুটি পাপ-তাপকে নিজ দেহে আকর্ষণ করে নিয়ে নিদারুণ রোগযাতনাও ভোগ করেছেন! দিনের পর দিন, সময়ে অসময়ে দূরদূরান্তরাগত ছেলে মেয়েদের জন্য আহার-বিশ্রামাদির ব্যবস্থা করেছেন মা নিজ হাতেই,—আপন শরীরের রক্ষার্থ অপরিহার্য বিশ্রামটুকুও প্রসন্নমনে পরিহার করেছেন। এইভাবেই তিনি স্বকীয় জীবনালোকে—ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার আদর্শে সমীপাগত সন্তানদের জীবনকে অনুপ্রাণিত করে তুলতেন। তিতিক্ষা, ক্ষমা ও ভালবাসার ডোর দিয়ে সবাইকে এক আশ্চর্য বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বেঁধেছিলেন মা। না,—কেবলমাত্র ঐহিক স্তরেই নয়, শরণপ্রাপ্ত সন্তানরা যাতে অনন্তকালের জন্য ত্রিতাপ-দুঃখের মূল কারণ যে অবিদ্যা, তা থেকে এবং তজ্জনিত এই বারে বারে জন্ম মরণের তরঙ্গাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া থেকে নিষ্কৃতিলাভ করতে পারে, নিশিদিন সে-প্রয়াসেরও বিরাম ছিল না তাঁতে। একাধারে তিনি মা হয়েও মূর্তিমতী গুরুশক্তিরূপে প্রপন্ন সন্তানদের আশ্রয়দাত্রী হয়েছেন। দেবী সারদার মাতৃভাবের বিকাশ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে এই ভাবেই।

"...মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।"—মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই আত্মস্বরূপ-স্বীকৃতি আমাদের স্বতঃই অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে তাঁর মা-রূপটিকে অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণের। শ্রীরামকৃষ্ণ-নিয়োজিত এই দেবী সারদার মাতৃভাব সংস্থাপনা ও সংপ্রসারণার পবিত্র দায়কে যদি আমরা কথঞ্চিতও ধারণায় আনতে সক্ষম হই, তাহলেই বুঝতে পারা যাবে,—কেন মাতৃহারা অনেকেই তাঁকে পেয়ে বা দেখে—অথবা তাঁর চিত্রপটমাত্র অবলোকন করেই নিজের নিজের পার্থিব গর্ভধারিণীর অভাবকে ভুলে গিয়েছিল এবং সকল জননীর সমষ্টি-

স্বরূপিণী জগজ্জননী বোধে তাঁকেই আপন আপন হৃদয়ের ভালবাসা-ভক্তি ঢেলে দিয়েছিল নতুন আনন্দে ও উদ্দীপনায়। বুঝা যাবে, বাড়ির মায়ের মধ্যে জগন্মাতা সারদারই প্রকাশকে উপলব্ধি করে কেনই-বা অনেকে নিজের গর্ভধারিণী মায়ের সেবাতে তৎপর হয়েছিল। অনুভব করা যাবে, সকল দেশ-জাতি ও মানুষের একই জনয়িত্রী বোধে—বহু আদর্শবাদী সেবক ও সাধক কেন শ্রীসারদা দেবীকেই পূজা করেছিলেন,—সমষ্টি-মাতৃশক্তিরূপে তাঁরই সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

জগতের ইতিহাসে এক অপ্রতিম মাতৃপ্রতিমা এই শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা দেবী সারদা। পাপ-মলিন সংসারে তাপিত মনুষ্য-সন্তানদের জন্য এক অনবদ্য অভয় আশ্রয়স্থল স্থাপনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রীশ্রীমা তাঁরই ধ্যান-গঠিতা মাতৃ প্রতিমা। অপূর্ব এই মায়ের প্রতিমা—বিচিত্র বিস্ময়মণ্ডিত এই মায়ের ভাব।

সংসারের জ্বালা অন্তহীন। সে জ্বালায় জ্বলে পুড়ে কেউ যদি তা' থেকে পরিত্রাণের পথ পাবার আশায় কখনও জয়রামবাটীতে বা কলকাতার বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে ছুটে যেত – সে গিয়ে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে পেত, স্নেহ-প্রেম আর করুণা দিয়ে গড়া এক অপূর্ব মাতৃমূর্তিকে, যেন তারই প্রতীক্ষায় পথের পানে তাকিয়ে বসে আছেন—কিংবা ঘর-বার করছেন ব্যাকুল চিত্তে। হয়তো-বা তখন গ্রীষ্মকাল,—ঘর্মাক্ত দেহে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে মায়েব দ্বারে পৌঁছানোমাত্রই কোনও সন্তান ঠিক দেখতে পেত, মা পাখা এনে স্বহস্তে বীজন করে পথের কষ্ট জুড়িয়ে দিচ্ছেন। শ্রান্তিহরা শীতল জল আপন হাতে তুলে দিচ্ছেন ছেলের শুষ্ক মুখে। মিষ্টি কথা বলে সন্তানের পথশ্রমকে ঘুচিয়ে দিচ্ছেন। তারপর তাদের ক্ষুধার নিরসন করছেন, নিজ হাতেই জলখাবার দিয়ে কিংবা রন্ধনের আয়োজন করছেন নিজেই,—আসন পেতে, কাছে বসিয়ে কোলের ছেলেটিকে সাদরে খাওয়াচ্ছেন,—বলছেন এটা খাও, সেটা খাও—পেটভরে খাও। ওসবের মধ্যেই দূরাগত সন্তানের মনোকষ্টের কারণটিকেও জেনে নিচ্ছেন,—যথোপযুক্ত উপদেশও প্রদান করে চলেছেন। তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনও মিটিয়ে দিচ্ছেন—অধিকার অনুসারে তাকে মন্ত্র-দীক্ষাও প্রদান করছেন। সমীপাগত সন্তানটি হতবাক হয়ে যেত—মুগ্ধ-বিস্ময়ে লক্ষ করত এবং যোগ্যতানুযায়ী নিশ্চয়ই মর্মে মর্মে অনুভবও করতে পারত—ইনি কেবল শ্রেয়োপথের নির্দেশদাত্রী, মুক্তি-বিধায়িনী গুরু নন্, ভগবদ্ভক্তি-প্রদাত্রী, চৈতন্যদায়িনী ইষ্টদেবীই নন্—অপিচ তিনি অসীম সন্তান-প্রেমব্যাকুলা, অনন্ত স্নেহময়ী মা। তিনি মা, আবার তিনিই গুরু। যিনি

জননী, তিনিই মোক্ষদাত্রী। তাঁর গুরুমূর্তি যেমন স্ব-মহিমায় অনন্যা, তেমনই তাঁর মাতৃত্বও সর্বপ্রকার মোহবন্ধনমুক্ত—অথচ সর্ব-সমাকর্ষী।

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাবকে তাঁর গুরুভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রদৃষ্টিতে দেখা অসম্ভব আমাদের পক্ষে। একটি সত্তারই দু'টি দ্যোতনা। মাতৃভাবেরই জমাট ঘনীভূত ভাবব্যক্তির নাম গুরু। আর গুরুভাবের দ্রবীভূত বিগলিত রূপই হচ্ছেন মা। করুণার পরম পরাকাষ্ঠা গুরুভাবে,—স্নেহের চরম উৎকর্ষ মাতৃভাবে। যখন তিনি সান্দ্র হিমানী,—তখন করুণাঘন গুরু। আবার তরলীকৃত হিমশৈল যেমন প্রবহমান জাহ্নবীধারা হয়ে জীবকুলের সন্তাপহারিণী প্রাণসঞ্চারিণী,—করুণাঘন গুরুও তেমনই মা হয়ে আপামরে স্নেহসুধাদায়িনীরূপে সমুদ্ভাবিতা হন। শ্রীশ্রীসারদা দেবীর এই উভয় ভাবই তাই অভিন্ন ও অস্বতন্ত্র—তিনি একই তনুতে গুরু এবং মা অবিশ্লিষ্টরূপেই।

ভক্তভৈরব গিরিশ একবার অতি বড় দুঃসাহসিক প্রশ্ন করে বসেছিলেন মায়ের কাছে: "তুমি কি রকম মা?" সপ্রতিভ উত্তর দিয়েছিলেন মা: "আমি সত্যি মা। গুরুপত্নী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়—সত্যি জননী।" শ্রীশ্রীমা যে 'সত্যি মা' এ-সত্যটি গিরিশচন্দ্র হৃদয় দিয়েই অনুভব করতেন—তথাপি তাঁর উদ্ধতমনের শান্তির জন্যই মায়ের নিজের মুখ থেকে ঐ সত্যের স্বীকৃতিকে শুনতে চেয়েছিলেন। জয়রামবাটীতে থাকাকালে, গিরিশবাবুর ব্যবহৃত শয্যার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি কে নিয়মিত সাবানে কেচে ধপ্‌ধপে করে রাখতেন,—কে অদৃশ্য থেকে এমনভাবে সেবা করে যেতেন সন্তানের, তা গিরিশবাবুর অজানা ছিল না। শৈশবে মাতৃহারা এইরূপ উষ্ণ মাতৃত্বের স্পর্শলাভে ধন্য হয়েছেন,—প্রাণে কষ্টবোধ হলেও মায়ের অপার স্নেহের কথা ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেতেন।

আবার অনুরূপ আর একটি ঘটনাতে, মায়ের উক্তি কিছু ভিন্ন সুরের, শুনেছি আমরা। সুর ভিন্ন হলেও, বাণী ছিল একই। সেখানে মা সন্তানকে শান্ত করেছিলেন এই বলে যে, তিনি শুধু গুরুই নন্, তিনি মা-ও বটে।

কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে মায়ের জনৈক সন্তান সারাদিনের কাজকর্ম সেরে, উপরে তাঁর ঘরে যেতেন সেই সন্ধ্যার শেষে। তিনি ঘরে ঢুকেই লক্ষ করতেন, তাঁর শয্যাটি বেশ পরিপাটি করে প্রস্তুত রাখা থাকে, যেন শ্রান্ত দেহের বিশ্রাম গ্রহণে বেশি দেরি না হয়। কঠোর পরিশ্রমের পরে দিনান্তে ঐ বিশ্রামটুকু সন্তানের এতোই অপরিহার্য বোধ হত যে, সামান্য আয়াসকেও তখন বিরাট বোঝা

ঠেকত। সন্তানদুঃখকাতরা মা সেটি বুঝেই, সবার অজ্ঞাতসারে ঐ ঘরে প্রবেশ করে, কর্মক্লান্ত ছেলের বিশ্রামের আয়োজনকে স্বহস্তেই সমাধা করে রাখছিলেন। যা' হোক, ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ায়, কর্মী সন্তানটি লজ্জায় ও মনস্তাপে একেবারে মাটিতে মিশে গিয়েছিলেন। অবসর বুঝে একসময়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে তাঁর চরণযুগল জড়িয়ে ধরে সাশ্রু নেত্রে বার বার মার্জনা ভিক্ষা করেন,—কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন—"মাগো, আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়াবেন না। আমার বিছানা আমি নিজেই পেতে নেব। দোহাই আপনার, আমার বিছানা আপনি স্পর্শ করবেন না মা। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

প্রণত সন্তানের কাতরোক্তি শুনে স্নেহময়ী মা অমনি উত্তর দিয়েছিলেন: "তাতে দোষ কি বাবা? আমি কি শুধুই গুরু? আমি যে তোমাদের মা-ও হই।"

গুরুর অধিষ্ঠান মাথায় সহস্রদল সহস্রার পদ্মে। তিনি যখন গুরু তখন আমার দেহমধ্যস্থ সর্বোচ্চ আসনে তাঁকে বসিয়ে ধ্যান করতে পারি। ইষ্টরূপে তাঁকে অনুভব করতে চেষ্টা করি, আমার বুকের মধ্যে অনাহত হৃৎ-পদ্মাসনে জ্যোতির্ঘন-রূপে। আর যখন তাঁকে পাই আমার মা-রূপে, তখন যে তিনি আমার দেহের সর্বাঙ্গজুড়ে,—আমার প্রতি নাড়ীচক্রেই মায়ের অধিষ্ঠাপন তখন। মা আমার শুধু জ্যোতির্ময়ীই নন, তিনি যে তমোময়ীও বটে,—তাই তো মায়ের পূজা করি পূর্ণিমাতেও যেমন, অমানিশাতেও ঠিক তেমনই। আমার জীবনের জ্যোৎস্নালোকিত দিনগুলিতেও মায়ের স্নেহস্পর্শ যেমনটি অনুভূতিতে পেয়ে থাকি,—জীবনের ঘোর তমোময়ী অবস্থাতেও আমার মাতৃকৃপা ঠিক তেমনটিই বোধ করি আমি। মা সর্বংসহ —সর্বানুভূঃ। আমার সকল সুখে, সকল দুঃখে মা,—মা আমার সর্বকালে সর্বাবস্থায়। শ্রীশ্রীমা—একাধারে গুরু-ইষ্ট-মা। এ-মাতৃমূর্তি বিশ্ব-ইতিহাসে নিরুপমা।

একজন দীক্ষিত সন্তান জয়রামবাটীতে গিয়ে মাতৃ-সান্নিধ্যে বাস করছেন কয়েকদিন। সখেদে একদিন তিনি মাকে বলছিলেন, "মা, তুমি যে আমাদের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার কর, এটা আমাদের ভাল লাগে না।" মা-ও ততোধিক অনুযোগের সুরে জানিয়ে দিলেন: "বাবা, তোমরা যে আমার ছেলে। মা ছেলে-মেয়ের কত গু-মুত পরিষ্কার করে, তোমরা তো সব বড় হয়ে আমার কাছে এসেছ। আমি কি দোষ করেছি যে, তোমাদের এই সামান্য যত্নটুকুও করতে পারব না?"

নিরুপমা জননীর বেনজির যুক্তিই বটে! মাতৃভাবের ইতিহাসেও এক অতুলিত অলোকসামান্য উক্তি।

সেবাপরায়ণা গুরু,—সন্তানদুঃখবিধুরা মা। অথবা গুরু যখন সেবা-মূর্তিতে তখনই তিনি মা। মা যখন সন্তান-ক্লেশাসহিষ্ণু দুঃখত্রাণরতা তখন তাঁকেই পাই গুরুরূপে। গরমের দুপুরে ঘর্মাক্ত শরীরে এক আশ্রিত সন্তান গিয়ে উপস্থিত উদ্বোধনের বাড়িতে—মায়ের চরণসমীপে। গুরুদর্শনে গিয়েছিলেন ভক্তটি। শ্রীশ্রীমা তাড়াতাড়ি একখানা পাখা হাতে নিয়ে আপন সন্তানকে হাওয়া করতে লাগলেন। সঙ্কুচিত ভক্ত-সন্তানটি বার বার নিষেধজ্ঞাপন করে, মায়ের হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে নিতে চাইলে, মা সস্নেহ আপত্তি জানিয়েছিলেন। বলেছিলেন—"না বাবা, তুমি বোস। আমিই হাওয়া করি।"

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী লিখিত 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে জানা যায়, শশধর মজুমদার দশ বৎসর বয়সে তাঁর গর্ভধারিণীকে হারিয়েছিলেন,—তদবধি তিনি ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপকালে তাঁরই রূপ চিন্তা করতেন। পরে কোনও সময়ে ভাগ্যে যোগাযোগ ঘটলে শশধর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করেন কলকাতায়। প্রথম দর্শনকালেই তাঁর যে অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটাই এখানে উল্লেখ্য প্রসঙ্গ। শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে উঠে দাঁড়াতেই শশধর অনুভব করেছিলেন যে, তাঁর নিজের গর্ভধারিণীই যেন আপন বক্ষে টেনে নিতে চাচ্ছেন সন্তানকে। শশধর স্থান-কাল ভুলে সহসা চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠেন: "মা ওমা, তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে?" শ্রীশ্রীমা মধুর সান্ত্বনার স্বরে অমনি জবাব দেন—"এই তো বাবা, আমি রয়েছি তোমার ভয় কি?"

শ্রীশ্রীমা সকলেরই মা—নিত্যকালের মা—সকল ব্যষ্টি জননীর মধ্যেও সদা বর্তমান মা। শশধর-গয়ানাথ প্রমুখ মা-হারা সকল সন্তানদের জন্যই নিয়ত প্রতীক্ষমানা স্নেহময়ী মা সারদা। কখনও বা গুরুবেশে, কচিৎ প্রয়োজনে ইষ্ট-রূপেও সেই তিনি একই মা।

পরবর্তী কোনও সময়ে শশধর একবার মাকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আচ্ছা মা, লোকে তোমাকে কতোভাবে দেখে, কতোরকম বলে,—তুমি আমাকে সত্যি করে বল তো—তুমি কে? তোমার কোন্‌রূপটি ঠিক?" ছেলের প্রশ্ন শুনে মা হেসে উঠেছিলেন,—বলেছিলেন: "লোকে যাই বলুক আর দেখুক বাবা,—তুমিই বল, তোমার কি মনে হয় আমাকে?" শশধর জবাব দিয়েছিলেন—"আমি তো ওসবের কিছুই বুঝিনা। আমি শুধু জানি—তুমি আমার মা।"—এই কথা শুনেই মা প্রসন্না হয়ে তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন: "বাবা, এই জানাতেই তোমার সব হয়ে যাবে। এই-ই তুমি জেনো, আমি তোমার মা।"

'এই জানাতেই তোমার সব হয়ে যাবে।' শুধু এইটুকু জানা যে, তিনি আমার

মা,—আমি মায়ের সন্তান। কিন্তু আমাদের তেমন বিশ্বাস কোথায়? তাই-ই তো মায়ের সন্তান হয়েও মাতৃহীনের মতো সংসারের ঘাটে ঘাটে ঘুরে মরি। মাতৃতত্ত্ববিদ্ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী স্বামী সারদেশানন্দজীর মুখে এক আশ্চর্য বার্তা শুনে চমকিত হয়েছিলাম একদা। আজ এই জীবন-সায়াহ্নে সেই আপ্তবাক্যকেই পুনঃ পুনঃ মননের চেষ্টা করে চলেছি। গভীর এক আধ্যাত্মিক রহস্য ব্যক্ত হয়েছিল সেই শুভ্রশির সাধুর মুখে। সারদেশানন্দ মহারাজ সেদিন বলেছিলেন: "শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাকটাক্ষই মোক্ষ। যথার্থতত্ত্ববোধ হচ্ছে—'মা-সন্তান' এই প্রত্যয়ের অপরোক্ষ অনুভব। শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জীবনানুচিন্তন-প্রয়াসীর পক্ষে এটি এক অতি নিগূঢ় সংবাদ,—যা অনুচিন্তনের সাধনকে প্রাণময় করে তুলবে নিঃসন্দেহে। 'মা-সন্তান'-প্রত্যয়, বা এরূপ একটি নিশ্চিতি যে সাধক সাধিকার পক্ষে কতোখানি আত্মশক্তির দ্যোতক, তা উপলব্ধি হতে পারে ঐরূপ প্রত্যয়ী কোনও সন্তানকে সাক্ষাৎভাবে দেখলে শুনলে।

একটি নিশ্চায়ক ঘটনা, যা স্বামী সারদেশানন্দর কাছ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে:

জনৈক যুবক মায়ের কথা লোকমুখে শুনে শুনে,—বিশেষ করে তাঁর অনির্বচনীয় স্নেহ-দয়া-করুণার সব নানা কাহিনী শ্রবণ করে, মাকে একবার স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য তীব্র আকুলতা অনুভব করতে থাকেন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। খোঁজখবর নিতে থাকেন যুবক—জয়রামবাটীতে কীভাবে যাওয়া যায়। ট্রেনে বিষ্ণুপুর, পরে সেখান থেকে গোরুর গাড়িতে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় কিছু ছিল না তখন। বহুবিধ চিন্তা মাথায় আনাগোনা করে করে যুবককে ক্রমেই উতলা করে তোলে। একদিন অমন চিন্তাকুল মন নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন,—সহসা স্বপ্নে মায়ের দর্শনলাভ হয়ে যায় ভাগ্যে। দেখেন—জয়রামবাটীতে মা—সন্তানকে পরম আদরে কাছে বসিয়ে নিজের বাটি থেকে তুলে তুলে প্রসাদী দুধ ভাত ছেলের মুখে দিচ্ছেন। এই স্বপ্নদর্শনের ফলে তাঁর মাতৃ-সন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আরও বলবতী হয়। অবশেষে একদিন একাই যাত্রা করেন জয়রামবাটীর উদ্দেশ্যে।

যুবক সন্তানটি সত্য সত্যই মাতৃসকাশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং মা-ও তাঁর ছেলেকে এমন আকস্মিক কাছে পেয়ে পরম আহ্লাদে গ্রহণ করেছিলেন। ভক্ত সন্তানও মাকে দর্শন করে—তাঁর অতুল্য মমতা ও স্নেহ বুকভরে অনুভব করে ভরপুর হয়ে গিয়েছিলেন। যুবক যেন বহুকাল পরে নিজের বাড়িতে, আপন মায়ের কাছেই উপস্থিত। কোনও সঙ্কোচ, দ্বিধা, সমীহ কিছুই নেই,—কোনও

প্রকার আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাও নেই, কোনও কিছু লাভের প্রত্যাশা নেই—দীক্ষাদির ব্যাপারেও আদৌ কোন আগ্রহ বোধ নেই। স্নানাহার সেরে যুবকটি দুপুরের দিকে একটি ঘরে বিশ্রাম করছেন। সহসা মা ভেতর-বাড়িতে ডেকে নিয়ে, সন্তানের হাতে নিজের ভুক্তাবশেষ দুধভাত একটি বাটিতে দিয়ে পরম আদরের সঙ্গে বলেন, —"বাবা খাও।" অভিভূত সন্তান মায়ের প্রসাদামৃত প্রাণের সাধ মিটিয়ে চেটেপুটে খেয়ে, মুখধুয়ে ঘরে চলে যান আবার।

বিকেলে বিশ্রামাদির পরে যুবকটির মনে পড়ে যায়, স্নানের পরে ভিজে কাপড় শুকাবার জন্য মেলে দিয়েছিলেন বাইরে। কিন্তু কাপড় তুলতে গিয়ে দেখেন, কাপড় সেখানে নেই। দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন,—কোথায় গেল কাপড়। পরে দেখলেন, শ্রীশ্রীমা নিজহাতেই সেই কাপড়খানিকে তুলে কুঁচিয়ে পাট করে রেখে দিয়েছেন। মা স্বয়ং কাপড়খানি ছেলের হাতে দিয়ে বলেন—"বাবা, রোদে কাপড় বেশি শুকুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, সুতোর আয়ু কমে যায়। তাই-ই তুলে রেখেছিলাম আমি।" স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক যুবক। এ-মা কে? এই মায়ের অপার্থিব অমেয় স্নেহমমতালাভ তাঁর কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষাদি লাভ অপেক্ষাও বেশি পাওনা! জীবনের পরমার্থ এই মাকে চেনা, মাকে পাওয়া—তাঁর জীবনের চরম সার্থক পরিণতি তিনি সেদিন সেখানেই বোধ করেছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের জন্য পৃথক আকাঙ্ক্ষা তাঁর জাগেনি—পরে কোনও সময়ে জেগেছিল বলে শোনা যায়নি।

আমরা সারদেশানন্দজীর কাছ থেকে জ্ঞাত হয়েছি যে, ঐ যুবক মায়ের সাক্ষাৎ দর্শনই দীক্ষা ও সাধনার ফললাভ—এই ধারণাতেই পরিতৃপ্ত থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা তাঁর অন্তরে ছিল না কোনও কালেই। মা তাঁর যে-সন্তানের যেমন ভাব, তাঁকে সেইভাবেই আকর্ষণ করতেন—কৃপাবর্ষণও তদনুরূপই হত তাঁর প্রতি। তাঁর কৃপাকটাক্ষই মোক্ষ। 'মা-সন্তান'—এই বিনিশ্চিতিকে অপরোক্ষ বোধই পরমার্থ। 'মা আর আমি'—এই প্রত্যয়ার্হ তত্ত্বই আমাদের সাধ্য।

* * *

'মা'! 'মা'!! 'মা'!!!

বিশ্বময় 'মা'—এক অনাহত ধ্বনি নিরন্তর উত্থিত হচ্ছে আকাশে-বাতাসে-আলোকে-ঝরণাতে-নদীতে-সমুদ্রে; প্রান্তরে-পথে-পর্বতে-অরণ্যে-জনপদে। প্রসঙ্গতঃ

মনে পড়ছে, ঋষিসত্তম বিবেকানন্দ এই ধ্বনি শুনতে পেতেন সর্বত্র,—এমনকি পাশ্চাত্যের পরিমণ্ডলেও তিনি অবিরাম মাতৃমহিমাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি তাঁর এই সর্বব্যাপিনী মাকে দেখেছেন বিচিত্র রূপেও,—পাশ্চাত্যে সেই শ্রীশ্রীমাকেই দর্শন করেছেন যীশুজননী মেরীমাতা রূপে। সেখানেও তিনি মাতৃভাবের প্রকাশ অবলোকন করেছেন নানা আকারে ও প্রকারে। তাঁর অনবদ্য লেখনীমুখে সে-কথা ব্যক্ত হয়েছে :

"...সব অন্তর্ধান, জেগে বসেছেন 'মা'। শিশু যীশু-কোলে 'মা'। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে, অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 'মা' 'মা' 'মা'। বাদশা ডাকছে 'মা', জঙ্গ বাহাদুর সেনাপতি ডাকছে 'মা', ধ্বজাহস্তে সৈনিক ডাকছে 'মা', পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে 'মা', জীর্ণবস্ত্র ধীবর ডাকছে 'মা', রাস্তার কোণে ভিখারী ডাকছে 'মা'। 'ধন্য মেরী', 'ধন্য মেরী'—দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে।" (—'স্বামীজীর বাণী ও রচনা', ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০)

সর্বশুভদ সর্বস্পর্শী মাতৃদৃষ্টিকে সাধ্যানুযায়ী অনুসরণের চেষ্টা করলে, উক্ত 'মা-সন্তান'-প্রত্যয়টিকে কথঞ্চিৎ ধারণায় আনা সম্ভব হতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে দু'একটি ছোট উদাহরণকে এখানে উপস্থিত করা যাচ্ছে। বর্ণনায় ছোট হলেও, দ্যোতনায় দূরপ্রসারী ঐ ঘটনাগুলি। যেমন—

অতিশয় দীনহীন বেশ অমার্জিত রুক্ষকেশ, একদল অভব্য গ্রামবাসী কলকাতায় এসেছিল গঙ্গাস্নান, কালীঘাট দর্শন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে। বাগবাজারে মায়ের বাড়ির সম্মুখস্থ খোলা মাঠে তারা সব দল বেঁধে জড়ো হয়ে, কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে—একদৃষ্টে মায়ের বাড়ির দোতালার ঘরের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল। হয়তো বা কারও কাছে শুনে থাকতে পারে ওদের কেউ কেউ যে, ঐ বাড়িতে একজন মা আছেন। ভাগ্যে থাকলে তাঁর দর্শনও মিলে যেতে পারে—তাদের গঙ্গাস্নানের ও কালীদর্শনের পুণ্য বহুগুণিত হবে,—এই আশা নিয়ে তারা অমনভাবে অপলক চোখে, মায়ের ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখে অপেক্ষায় বসেছিল। পাড়াগাঁয়ের মানুষ,—সাহস করে দু'পা এগিয়ে যেয়ে বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা আর করেনি তারা। সহসা শ্রীশ্রীমা কোনও অজ্ঞাত প্রয়োজনে রাস্তার দিকে দ্বিতলের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। চকিতের মধ্যে মায়ের এক ঝলক দর্শন, ঐ বিরাট বাহিনীতে এক দারুণ সরব চঞ্চলতা এনে দিয়েছিল। তারা সকলে চেঁচিয়ে সমস্বরে বলে ওঠে : "আজ্ঞে মা, আমরা বহুদূরদেশ থেকে এসেছি। ওগো মা জগজ্জননী, দয়া করে কি দর্শন দেবেন ?"

মা তক্ষুণি এক সেবককে ডেকে আদেশ করেন—"যাও তো ওদের সবাইকে এখানে নিয়ে এসো। আহা, বাছারা আমার কতদূর থেকে এসে ওখানে ঠায় বসে আছে।"

সেবকটি ঐ বিপুল অসংস্কৃত জনবাহিনী দেখে ভীত হয়ে মাকে নিবেদন করেন—"কিন্তু মা, ওরা যে এক পঙ্গপাল। আর ভারী নোংরা! আপনি কি ওদের এখানেই আনতে বলছেন?"

মায়ের ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর পেল সেবক।

"পৃথিবীর সবাইকে আমি দেখা দিচ্ছি। আর কত কষ্ট করে এরা এসেছে, এদের দেখা দেব না! তুমি নিয়ে এসো ওদের। বাইরে ওদের নোংরা। তাতে কি হবে বাবা? ওদের ভিতরটা বড় পরিষ্কার—পবিত্র।"

সেবক মাতৃ-আজ্ঞা পালন করলেন। বন্যার জলের মতো ঐ অশীল গ্রাম্য লোকগুলি হুড়মুড়িয়ে এসে মায়ের বাড়ির দ্বারে প্রবেশ করে। যেন ওরা আকাশের চাঁদকে হাতে পেয়ে আহ্লাদে মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। সেবক মহারাজ তাদের সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে দণ্ডায়মান মাতৃমূর্তির চরণে একে একে প্রণাম করতে বলায় তাদের উৎসাহ আবেগ যেন বেসামাল হয়ে পড়ছিল। দুর্গাপুরী দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শনের লিপিবদ্ধ স্মৃতি থেকে জানা যায়—

"মায়ের নিকট যাইবার অনুমতি পাইয়া সেই সকল সরল পল্লীবাসীর মনের আনন্দ আর ধরে না; তাহাদের শ্রান্ত ধুলিমলিন মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের কী শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন হৃদয়ের দরজা খুলিয়া উজাড় করিয়া দিল মায়ের চরণে।

"রামকৃষ্ণ বসুর জননী ভোগের জন্য সেই দিবস প্রচুর পানতুয়া ও সিঙ্গাড়া পাঠাইয়াছিলেন। মাতা তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সেই সন্তানদিগের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। মাতার স্নেহকরুণার স্পর্শ পাইয়া তাহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিল যে, ইনি সত্যই দীন-দুঃখীর মা, তাহাদের করুণাময়ী জননী। সার্থক হইল তাহাদের তীর্থযাত্রা।" (—'সারদা-রামকৃষ্ণ', পৃষ্ঠা ৪০২-৪০৩)

'তিনি দীন-দুঃখীর মা, তাদের করুণাময়ী জননী'। শুধু দীন-দুঃখী মনুষ্যেরই নয়—দুর্বল অসহায় প্রাণীমাত্রেরই তিনি করুণাময়ী জননী। স্মরণীয় ও অনুভাবনীয় এক স্মৃতি,—বলেছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার। জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে আসছে। গোশালায় একটি বাছুর বড়ই ডাকছিল—অবিরাম হাম্বা-হাম্বা করেই যাচ্ছিল। হয়তো তাকে তার মায়ের কাছ-ছাড়া করে বেঁধে রাখা

হয়েছিল। জগন্মাতার প্রাণ আনচান করে ওঠে অমন মধুর করুণ হাম্বা ডাকে! ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে সাড়া দেন তিনি ঃ “যাই, মা, যাই, আমি এক্ষুণি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি—এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি।” মাত্র সাড়া দিয়েই শেষ করেননি—ত্রস্তপদে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে গো-বৎস সন্তানের গলার বন্ধন মোচন করে দিয়েছিলেন অচিরেই। সুরেনবাবু বলেছেন—“আমি অবাক হয়ে জগন্মাতার সর্বভূতে করুণাময়ী মূর্তি দেখছিলাম। হায়! এমন করে ডাকতে পারলেই তো মা অমনি এসে বন্ধনমুক্ত করে দেন।” (দ্রষ্টব্য ঃ ‘শ্রীশ্রীমায়ের কথা’ প্রথম ভাগ)

আরও একটি মর্মস্পর্শী অথচ মাতৃস্বরূপ-খ্যাপক স্মৃতিচিত্র এখানে উৎকলনের যোগ্য। মা সর্বভূতের মা,—চেতনের মা, অচেতনেরও মা। যে কিছু জানে না, বুঝে না,—উন্মাদ হয়ে এ-দ্বারে সে-দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, সে-ও মাতৃহীন নয়। সংসারে যার কেউই নেই, তারও আছেন এক মা—শ্রীশ্রীমা সারদা। এক পাগল পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—বিড় বিড় বকে কখনও আপন মনে। মাঝে মাঝে সে বাগবাজারে মায়ের বাড়ির সম্মুখের রাস্তায় এসে বসত বা গতায়াত করত। শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টিপথে সে-ও ছিল,—মা-হারা পাগল ছিল না মোটেই। কী আশ্চর্য কাণ্ড,—মা কেমন করে জানতে পারতেন, কোন্ দিন, কখন ঐ পাগলটি তাঁর দ্বারপ্রান্তে এসে ঠাঁই নেবে। পাগলের আগমন টের পেয়েই, মা ছুটে যেতেন, তার জন্য কিছু আহার্য—কিছু প্রসাদ ইত্যাদি নিয়ে—আদরের সঙ্গে তাকে খাওয়াতেন নিজে কাছে ডেকে। কোনও প্রত্যাশিত দিনে পাগলকে যদি না দেখতে পেতেন, তা'হলে মায়ের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতো। অমনি খোঁজ-খবর লওয়া শুরু হয়ে যেত, কেন সে এল না, কোথায় কী-ভাবে পড়ে আছে, অনাহারে রয়েছে কি না—ইত্যাদি নানা ব্যাপারে। তিনি যে জগতের মা,—সুস্থিরের মা, অস্থিরেরও মা—প্রকৃতিস্থ তাঁর যেমন সন্তান, অপ্রকৃতিস্থও তো তাঁরই নিজ সন্তান। অতএব, মায়ের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।

একদিন মা ঐ পাগলের প্রতীক্ষায় সারা দিন বসেছিলেন। দিন ফুরাল, রাত্রি এল,—মা কেবলই ঘরবার করছেন। কেউ এলেই তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, রাস্তায় কোন পাগলকে সে দেখেছে কি না। কিন্তু সেদিন কেউই পারেনি, পাগলের কোনও হদিস দিতে। রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে আসে। পাগলের দেখা নেই। অগত্যা একটি সেবক-সন্তানকে ডেকে অনুনয়ের সুরে মা বলেন, ঐ দূরে কাশী মিত্তিরের শ্মশান-ঘাটে একটা পাগল পড়ে আছে কি না—তার চেহারাটা এমন, চোখ দু'টি তেমন, মাথার চুলগুলি সে-রকম, পরণের জিনিসগুলো ঐ-রকম ইত্যাদি

হুবহু বর্ণনা সহ— তাকে একটু খুঁজে দেখতে। আর কিছু প্রসাদও দিয়ে দিলেন সেবকের সঙ্গে,—পাগলটিকে দেখতে পেলে, তাকে খাইয়ে আসতে। অমন গভীর রাত্রে সেবকও মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। মা অতন্দ্র অপেক্ষায় থাকলেন, পাগলের সংবাদের জন্য। অবশেষে মধ্য রাত্রিতে মায়ের কানে সুসংবাদটি যখন পৌছাল যে, পাগলকে পাওয়া গেছে এবং মায়ের প্রেরিত প্রসাদ তাকে খাইয়ে আসা হয়েছে, তখন মায়ের দুর্ভাবনার অবসান হল। মায়ের প্রাণ জুড়িয়েছিল, তার পাগল ছেলের ক্ষুধানিবৃত্তির সংবাদে!

* * *

"এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা, তিন গ…।"

"না না। আবার গুণতে হবে। ঠিক করে গোণো।"

"আবার গুণছি ছাখো। এক গণ্ডা, এই হল দুই…।"

শ্রীশ্রীমা দোতালার বারান্দা থেকে দেখছেন -একটি মেয়ে ঘুঁটে বিক্রী করতে এসেছে, আর কে একজন ঘুঁটে কেনার জন্য তাকে দিয়ে গোণাচ্ছে। ঘুঁটেওয়ালী এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা করে ঘুঁটে গুণে গুণে রাখছে—আর যে কিনবে, সে কেবলই খিটিমিটি করছে। বলছে, ঠিক গোণা হল না, ফের গোণো ইত্যাদি। ক্রমে উভয়ের মধ্যে গণনায় অমিল—অবশেষে বচসা—পুনরায় ঐ রাশিকৃত ঘুটে আবার গোণা শুরু হ'ল। "ছাখো এবার—এই চারখানাতে একগণ্ডা, আবার চারখানা দুই গণ্ডা,—এক-দুই-তিন-চার হল এই তিন গণ্ডা ··"—এমনিভাবে ঘুরে ফিরে ঘুঁটে-গণনার পালা চলছে, রাস্তার ধারে। বেচারী গরিব মেয়ে, পেটের দায়ে ঘুঁটে বেচতে রাস্তায় নেমেছে। আর তাকে এমনভাবে অকারণ নাজেহাল করে তুলছে ঐ লোকটি, নিজেরই অন্যমনস্কতার দোষে! করুণাময়ী মা উপর থেকে এই দৃশ্য লক্ষ করে আপন মনে বলতে থাকেন:

"বেচারীরা পথে পথে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়, তারপর অত বড় বোঝাটি মাথায় করে বাড়ি বাড়ি ঘোরে। চারখানি ঘুঁটে হলে তবে এক গণ্ডা—পাঁচ-সাত গণ্ডা হলে, তবেই একটি পয়সা হবে। এই তো ওদের রোজগার—এ দিয়েই চাল-নুন কিনে ঘরে ফিরবে। গরিব মানুষদের সঙ্গে এতো খিচিরমিচির কি কাজ বাপু! হলই বা দু'চারখানা কম!"

বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এসেই সেবিকা একটি কন্যাকে ডেকে অতি সংগোপনে

তার হাতে দু'আনা পয়সা এবং একটি ঠোঙা-ভর্তি প্রসাদ দিয়ে মা বলে দিলেন —তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ঐ ঘুঁটেওয়ালী মেয়েটির আঁচলে এ-গুলি দিয়ে আসতে। কন্যাটিও যথা আদেশ তাই-ই করেন। মা পুনরায় উপর থেকে দেখে, কথঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করেছিলেন মনে হয়েছিল। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী এই তথ্যটির বর্ণনা দিয়ে মন্তব্য লিখেছেন—"তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত শিশিরকণার মত সমুজ্জ্বল।"

ছোট্ট একটি শিশিরকণা,—কিন্তু আলোকোজ্জ্বল অনন্ত আকাশকে সে-ও ধারণ করার গৌরবাধিকার পেয়েছে। অসীম আকাশকে বহন করার সামর্থ্য তার স্বকীয় মহিমাতে নয়,—আকাশেরই করুণায় প্রতিফলন হবার গুণে। আবার এ-কথাও না মেনে উপায় নেই যে, ঐ ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর স্বচ্ছতা-ধর্মই তাকে এতো বড় অধিকার অর্পণ করেছে। ঘুঁটেওয়ালী মেয়েটিতে সীমাহীন অপরিমেয় মাতৃত্বাকাশকে প্রতিবিম্বিত দেখে আমরা বিস্ময়াবিষ্ট,—অনুপম সারদাকাশের অনির্ণেয় গরিমায় ও বিভুত্বে। আবার ঐ মাতৃমহিমাকে অনুবিম্বিত করে ধারণ করার মতো অন্তরের যে স্বচ্ছতা ঐ দীন কষ্টজীবী গোবরকুড়ানির মধ্যে নিদর্শিত, আমাদের পক্ষে তা'ও কম প্রেষণীয় নয়। সেই শ্মশানচারী ছিন্নবাস পাগল,—যে অমেয় মাতৃকরুণা ধারণের আর একটি অচ্ছিদ্র দৃঢ়িষ্ঠ আধার, সে ও এক শ্লাঘনীয় ব্যক্তিত্ব নয় কি? যে ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে, শ্রীশ্রীমায়ের জগন্মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ আমাদের কাছে দৃশ্য হয়েছে, তারও মহিমা সাধারণের কাছে উপেক্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা নয়—তারাও আমাদের নমস্য। এমনকি সেই গো-বৎসরূপী জীবটিই বা কম কিসে? মাতৃমহিমার সে-ও এক বাক্যহীন ঘোষক। তবে ঐ সব কিছুই বাইরের কথা,—প্রাণের কথা হচ্ছে মায়েরই বিজয় সর্বত্র সর্বব্যাপারে —মাতৃভাবেরই জয়।

সূর্যকিরণ অনাহুতভাবেই পৃথিবীর যাবতীয় কিছুকে স্পর্শ করে—সর্বত্রই প্রবেশ করে থাকে। কিরণ তার স্ব-স্বভাব-গুণেই তাপ ও আলোক দিয়ে সকলকে সঞ্জীবনী দান করে—অন্ধকার ঘুচিয়ে প্রকাশ-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে সবাইকে, সর্ববস্তুকে ও স্থানকে। শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃত্ব-কিরণও কোনও প্রকার চাওয়া না-চাওয়ার অপেক্ষা না করেই তার স্বকীয় স্বভাবে অবাধে ও নির্বিচারে সঞ্চরণ করেছে সকল হৃদয়ে। সে কিরণ-পরিমণ্ডলের মধ্যে যারাই এসে পড়েছে, তারাই মাতৃরূপস্পর্শ কোনও-না কোনরূপে পেয়ে গেছে,—এমনকি অজানিতভাবেও। অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে অন্ততঃ একটিও এখানে স্মরণ করতে পারি।

বাগবাজারে মায়ের বাড়ির ত্রিতলের একটি ঘরে একজন বিদ্যার্থীকে পড়াশোনার জন্য থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থাটি ছিল বেলুড় মঠের। ছেলেটি একাই থাকত সেখানে। এক একদিন দুপুরে বিশ্রাম নিতে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ত,—খোলা জানালা দিয়ে প্রখর রোদ এসে তার মুখে-গায়ে লাগত—কিন্তু প্রচণ্ড গ্রীষ্মের গরমেও ছেলেটি অঘোরেই নিদ্রিত থাকত। মা কোনও প্রয়োজনের ছলে ছাদে গিয়ে, অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জানালাটি বন্ধ করে আসতেন, যাতে নিদাচ্ছন্ন সন্তানের গায়ে-মুখে তাপ না লাগে,—তার চোখে রোদের ঝলক লেগে বেচারার বিশ্রামের না ব্যাঘাত ঘটায়। একটি পরিপাট্যহীন সাদামাঠা চিত্র,—যাতে মায়ের স্বভাব-মাতৃত্বটি অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

সর্বসন্তানহিতেরতা মা। সর্বসুখদায়িনী—অখিলক্লেশহারিণী বিশ্বজননী সারদা। মা সারদার সেবাশ্রীতে সন্তানের কঠিন কর্কশ হৃদয় অঙ্গন হয়ে উঠত শ্রীময় সুষমান্বিত। শুধু সূক্ষ্ম হৃদয়-অঙ্গনই নয়, বাইরে তার পায়ে চলার পথ, ঘরের আঙিনাখানিও হত মসৃণ সুচারু শোভাময়।

একদিনের এক অবিস্মরণীয় নয়নানন্দ দৃশ্য। গভীর রাত। জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ি তখন নিথর ঘুমন্ত। জনৈক সেবক উঠে বাইরে গিয়েছিলেন,—দেখেন বাড়ির উঠোনে উজ্জ্বল লণ্ঠনের আলো! কী ব্যাপার? এগিয়ে গিয়ে যা তাঁর দৃষ্টিগোচর হল, তাতে বিস্মিত ও হতবাক তিনি। স্বয়ং মা ঐ লণ্ঠনের আলোতে একাকিনী কর্মরতা,—একখানা খন্তা হাতে নিয়ে, সবার অগোচরে, আপন মনে উঠোনের মাটিতে কিছু কাজ করছেন। স্তম্ভিত সেবক ছুটে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন: "এতো রাতে তুমি জেগে উঠে একা একা কী করছ মা এখানে?" অধরা নীরবচারিণী এবার ধরা পড়ে যাওয়াতে দারুণ লজ্জা পেয়ে চটপট বলে ফেললেন: "আঃ! তুমি আবার এ-সময়ে এখানে কেন বাবা! এ-সব এমন কিছু না। ছেলেমেয়েরা সব খালি পায়ে চলাফেরা করে,—ইটের টুকরো খোলামকুচি কখন কার পায়ে ফুটে যায় কে জানে। তাই এগুলো পরিষ্কার করে রাখছি।" (দ্রষ্টব্যঃ 'শতরূপে সারদা', পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৬০)

মাতৃত্বের ব্যঞ্জনায় ভরা একখানি অপরূপ আলেখ্য শ্রীশ্রীমায়ের। 'মা'-শব্দ শ্রবণমাত্রই আমাদের সবারই সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায় আমাদের পার্থিব মায়ের কথা,—নিজ নিজ গর্ভধারিণীর চরিতাচরণ। কিন্তু সেখানেও সন্তানের পায়ে লাগবে বলে, তার চলার পথকে বা আঙিনাকে সম্মার্জনের উদ্যোগ,—সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে গভীর নিশাকালে নিঃশব্দে একাকী ঘরের বাইরে এসে সন্তানসেবায়

আত্মনিয়োগের কোনও নজির আমাদের জানা নেই। এখানে শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান সেবার সমতুল্যতা বিশ্বভুবনে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

* * *

"অসৎ বলে কি বিমুখ করব ?...মাতৃকৃপা না পেলে ও আরও উচ্ছন্নে যাবে।"

জয়রামবাটীতে একদিনের ঘটনা। জনৈকের দুষ্কৃতিময় বারমাস্যা শোনার পরে, সমীপাগত সকলে মিলে শ্রীশ্রীমাকে সমবেত মিনতি জ্ঞাপন করেছিলেন : "মা, এ-লোকটাকে আপনি কিছুতে আশ্রয় দেবেন না। ওর পাপ নিয়ে আপনার দেহ আরও খারাপ হয়ে পড়বে।"

মায়ের দুই নয়নে ছিল তখন করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ,—ওষ্ঠাধরে ব্যক্ত হচ্ছিল সঙ্কল্পের সুস্পষ্ট দার্ঢ্য,—স্মিত আননে ফুটে উঠেছিল অমোঘ মাতৃত্বের দ্রঢ়িমা। তাই সকলের সম্মিলিত আবেদনকেও তিনি এক বাক্যে না-মঞ্জুর করে দিয়ে বলেছিলেন : "সে যে আমার শরণ নিয়েছে। অসৎ বলে কি আমি বিমুখ করব তাকে? ওর ভাল হবার একটা সময় এসেছে,—ও যে আমারই কাছে এসে গেছে! মাতৃকৃপা না পেলে ও তো আরও উচ্ছন্নে যাবে।"

সেদিনের স্মৃতি-বর্ণনা পাওয়া যায় 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থে দুর্গাপুরী দেবীর লেখা থেকে (পৃষ্ঠা ৪১২-৪১৩)।

সেনাবিভাগের এক পদস্থ ব্যক্তি বিগত মহাযুদ্ধে তাঁর অসামান্য বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ইংরেজ সরকারের বহু পুরস্কার—পদক, তরবারি প্রভৃতি লাভ করেছিলেন। চুক্তির মেয়াদ সম্পূর্ণ হলে তিনি স্বদেশে ফিরে এসেই, জয়রামবাটীতে চলে গিয়েছিলেন সর্বাগ্রে। লোকপরম্পরায় তাঁর শোনা ছিল—শ্রীশ্রীমায়ের কথা। কিন্তু চাক্ষুষ দর্শন হয়নি তখনও পর্যন্ত। সৈনিকের বেশে সটান গিয়ে মাতৃচরণে লুণ্ঠিত হয়ে পড়েন ঐ ব্যক্তি। তাঁর কণ্ঠে ছিল পদকের মালা, কটিদেশে বিলম্বিত ছিল তরবারি। প্রণত সন্তানের দিকে মা স্নেহ-কটাক্ষপাত করেন—তাঁর স্বাভাবিক শান্ত প্রসন্ন ভাব সহ। প্রণামান্তে উঠে দাঁড়িয়েই সেই বীর যোদ্ধা তাঁর মাথার উষ্ণীষ, বীরত্বের যাবতীয় নিদর্শনগুলি এবং কোষমুক্ত তরবারিখানিকে একে একে মায়ের চরণতলে সাজিয়ে রেখে, নতজানু হয়ে করজোড়ে মাকে নিবেদন করে বলেন,—"মা, এ-সব পুরস্কার ইংরেজ সরকার আমায় দিয়েছেন,—আমি সব তোমারই পায়ে সঁপে দিলাম আজ।"

সৈনিক-ছেলের এই ভাব-বিকারে মা শুধুই একটু মিষ্টি হাসেন। মায়ের সহাস্য প্রশ্রয় জওয়ান পুত্রকে আরও উদ্দীপিত করে তোলে। বলেন—"তুমি কি আমায় ছেলে বলে গ্রহণ করবে না ?"

মায়ের মুখের প্রসন্ন জবাব : "পৃথিবীসুদ্ধ সবাই তো আমার ছেলে। তুমিও আমার ছেলে।"

শানিত তরবারির মতো শরণার্থী ছেলের মুখ ঝলসে উঠে প্রত্যুত্তর প্রদান করেছিল—"আমি কিন্তু সবার মতন নই, আমি তোমার উঁছা ছেলে। সংসারে কোন্ দুষ্কর্ম যে আমি করিনি, নিজেই তা জানিনা।"—এর পরেই সকলের সম্মুখে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অকপটে তিনি বিবৃতি দিয়ে চলেন, তাঁর অফুরন্ত অসৎ কর্মের। স্বীয় দুষ্কৃতির কাহিনীকে সবার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীমাতৃপদে উদ্গিরণ করে দিয়ে, আবদারের সুরে মাকে পুনঃ পুনঃ মিনতি জানাতে থাকে ঐ আর্ত সন্তান : "—এখন বলো তুমি, ধুলো ঝেড়ে কি আমায় তোমার ছেলে করে নেবে ?"

মধুর অথচ কঠোর কণ্ঠে শ্রীশ্রীমা জানালেন : "নেবো, তোমাকে নেবো আমি। কিন্তু আমার দু'টি সর্ত থাকবে পারবে কি তুমি তা পালন করতে ?"

"—কি তোমার এমন সর্ত, যা' আমি মানতে পারব না ?"

"বেশ, এখন ভিতরে গিয়ে তুমি একটু খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর। সর্তের কথা পরে হবে।"

সেখানে উপস্থিত সকলেই নির্বাক বিমূঢ় দৃষ্টিতে মা এবং তাঁর এক উদ্দণ্ড সন্তানের এই লীলানাট্য দেখছিলেন। মাকে পরে তাঁরা একাকী পেয়ে অনুনয় করেছিলেন, যাতে তিনি কোনও মতেই ঐ স্খলিত-চরিত্র দুর্ধর্ষ ব্যক্তিকে চরণে ঠাঁই না দেন—আশ্রয়প্রদান না করেন।

কিন্তু তিনি কি কেবল সতেরই মা! তিনি তো অসতেরও জননী! পতিতোদ্ধারিণী মা ঐ সম্মিলিত আপত্তিতে অবিচল থেকে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছিলেন—"না। সে যে আমার শরণ নিয়েছে। অসৎ বলে কি আমি বিমুখ করব তাকে ?" ভাগ্যবিধাত্রী সারদা তাঁর ত্রিকালদর্শিনী নয়নপাতে স্পষ্টই দেখেছিলেন যে, যে-হেতু ঐ ব্যক্তি অবশেষে এসে মাতৃপদে শরণার্থী হয়েছে—তখন তার জীবনে সু-সময় সমাগত। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে আরও গোচর হয়েছিল যে, ঠিক সেই মুহূর্তেই যদি তিনি তাকে হাত বাড়িয়ে না ধরেন, তা'হলে তার জীবনের অধোগতি হবে দুর্নিবার। বলেছিলেন : "মাতৃকৃপা না পেলে ও যে আরও উচ্ছন্নে যাবে।"

অদমনীয় চরিত্র ঐ জওয়ান সন্তান ততক্ষণে মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে আহার-বিশ্রামাদি সমাপন করে নিয়েছেন। সময়ান্তরে মায়ের চরণে পুনরায় ভূমিষ্ঠ হয়ে জানতে চান—"মা, কি তোমার সর্ত,—এবার কিন্তু বলতে হবে।"

শ্রীশ্রীমা গম্ভীর। উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ, তুমি এখানকারই। তুমি আশ্রয় পাবে,—কিন্তু দু'টি সর্ত তোমাকে মেনে নিতে হবে। প্রথম—তুমি আজীবন অবিবাহিত থাকবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে,—তোমাকে শপথ করতে হবে,—কোনও মাতৃচরিত্রকে অবমাননা করতে পারবে না, সতীর সম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না কদাপি তোমার দ্বারা।"

দুর্মদ জওয়ান সন্তানটি জীবনে কখনও ধারণাই করতে পারেন নি যে, এমন কঠোর সর্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। কতো বড় বড় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন—বীরের প্রাপ্য পুরস্কারও অর্জন করেছেন। কিন্তু আজ? মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত সর্ত তো সর্তই মাত্র নয়,—এ যে জীবনের মহত্তম যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার জন্য মহাশক্তিময়ীর আশীর্বাদ ও আদেশ! সত্যের খাতিরে, মনের সবগুলি দ্বারকে আজ মাতৃসকাশে উন্মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই তো এসেছেন তিনি এখানে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে তাই সরল ভাষায় ব্যক্ত করলেন,—

"সত্যি কথা নিবেদন করছি মা। বিয়ে করার প্রবল সাধ আমার। বিয়েই যদি না করব—সংসারের সুখ যদি একটু উপভোগই না-হবে, তবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও এতো টাকাপয়সা কিসের জন্য জমালাম! তুমি একটু সদয় হয়ে বিবেচনা কর,—এই অধম সন্তানের মনের খেদকে মিটিয়ে দাও।"

কঠোরতর আদেশ এবার: "সে হবে না বাবা,—আমার সর্ত এই-ই। তুমি খাও দাও বেড়াও, যেমন খুশি চল,—আমার কিছুতেই আপত্তি নেই,—কিন্তু ঐ দুটি চলবে না।"

অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে সন্তান মায়ের চরণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—তিনি সর্ত পালন করবেন আমৃত্যু। শ্রীশ্রীমা-ও পরম আদরে আপন অঙ্কে গ্রহণ করলেন তাঁর অনভিভবনীয়-স্বভাব পুত্রটিকে। ধন্য সেই বীর সন্তানটিকে মা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করেছিলেন। মাতৃকৃপায় সেই জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত ছিলেন তিনি জীবনের উত্তর পর্বে।

* * *

"আমি ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায় ?"

সত্যাধিক সত্য। মা যদি সন্তানকে ছেড়ে দেন তা'হলে ত্রিভুবনে আর ঠাঁই কোথায় তার ? তাই আমরা দেখি, শ্রীশ্রীমায়ের অভিধানে 'প্রত্যাখ্যান' শব্দটি অনুপস্থিত। মা কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেন নি,—শুধু আশ্রিত সন্তানকে নয়, অতি সাধারণ অনুল্লেখ্য কোনও মানুষকেও মা ত্যাগ করেন নি,—মুখ ঘুরিয়ে নেননি সমীপাগত কারও কাছ থেকেই।

কোয়ালপাড়া আশ্রমে মায়ের জন্য রন্ধনাদির কাজে নিযুক্ত লোকটির স্বভাব ভাল ছিল না,—অথচ সে-কথা মায়ের অজানাও ছিল না। কেশবানন্দ স্বামী একদিন ঐ লোকের বদলে অন্য একজনের উপরে রন্ধনের দায়িত্ব ন্যস্ত করার প্রস্তাব নিয়ে মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। যুক্তকরে মাকে বলেন—"মা আপনার শরীর অসুস্থ। যে আপনাকে রান্না করে দিচ্ছে, তার সম্বন্ধে আপনি তো সবই জানেন। আপনি যদি আজ্ঞা দেন, তবে ঐ লোকের বদলে অন্য একজনকে দেখি।"—শুনেই মা ভীষণ গম্ভীর হয়ে যান। পরে বলেন: "তোমরা ছাড়লে ছাড়তে পার,—কিন্তু আমি ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায় ?"

কেশবানন্দ মায়ের উক্তিতে ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তৎক্ষণাৎ মায়ের চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, অমন এক নিষ্ঠুর প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য। কম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকেন—"মা আমার অপরাধ হয়েছে। আপনি কৃপা করে আমাকে ক্ষমা করুন। ক্ষমা করুন মা।"

'উদ্বোধন', ৬২ বর্ষ, একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, স্বামী কেশবানন্দ নিজমুখে এই মা'তৃপ্রসঙ্গটি অমূল্য-বাবুদের কাছে বর্ণনা করেই মন্তব্য করেছিলেন: "এবার বোঝ শ্রীশ্রীমা কে ? কে এই অভয়বাণী দিতে পারে—'আমি ছাড়লে ও দাঁড়াবে কোথায় ?' আমরা যেমনই হইনা কেন, মায়ের নিকট আমরা সকলেই তাঁর ছেলে—ছেলে ভিন্ন কিছুই কেউ নই। তিনি নিজেই বলেছেন,—'আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তাদের ধুয়ে মুছে কোলে নিতে হবে। আমি যে তাদের সত্যিকারের মা, পাতানো মা নয়'।"

হ্যাঁ, 'সত্যিকারের মা'। "সত্যস্য সত্যম্"—শুত্রশির ঋষির ভাষার সাকার বিগ্রহ। এ-সত্যকে কেবল অনুভব করা চলে, মুখে বুঝানো চলে না। অমূল্যবন্ধু

বাবু তাঁর স্মৃতি-নিবন্ধের উপসংহারে যা বলেছেন, আমরাও তার অতিরিক্ত কোনও কথা বলতে অক্ষম এখানে। তিনি লিখেছেন:

"ধন্য মা, ধন্য মা, ধন্য তোমার অহেতুকী কৃপা! কলিকালে তোমার মতো মা-ই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সাধে কি পূজনীয় নাগ মহাশয় বলতেন, 'বাবার চেয়ে মা দয়াল'।"

* * *

গুরু এবং মা একই অঙ্গে যুগল-রূপের অপূর্ব একখানি মূর্তি—শ্রীসারদা। বস্তুতঃ গুরু এবং মা অভিন্না,—অথবা বলা চলে মা-সারদারই একরূপ গুরু। কিংবা মোক্ষদা গুরুরূপিণী সারদাই সাধারণ্যে জগতের মারূপে বিরাজিতা। গুরু বা মা কোনওটিই শ্রীসারদায় আরোপিত একটি গৌরব-আখ্যা বা সম্মান-বিশেষণ নয়। তেজ ও প্রভা যেমন বিচ্ছুরিত দুই দ্যোতনা একই প্রদীপের, যেন অনেকটা ঐ রকমই একই সারদা সত্তার দুই বিভাবন—গুরু ও মা।

আচার্য এবং মাতা—একই দেহে প্রকট, জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে নজির-বিহীন। শ্রীশ্রীমা মানবেতিহাসে তাই একক বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এক আবির্ভাব। গুরু বা আচার্যের এমন বিশ্বপ্লাবী মাতৃমূর্তি পৃথিবী ইতঃপূর্বে কখনও দেখেনি। আবার স্নেহময়ী মায়ের এরূপ বিদ্যারূপিণী জ্ঞানদা আচার্য বা গুরুমূর্তিতে প্রকাশও বিশ্বে এক অনন্যপূর্ব ঘটনা। অভিনব গুরু,—ততোধিক অভিনব অবিকল্প এই মা —শ্রীশ্রীমা সারদা। শিষ্যসাধক এখানে সন্তান,—গুরু হয়েছেন স্বয়ং মা। গুরু গ্রহণ করেছেন শিষ্যসেবার দায়,—আর শিষ্যও অকুণ্ঠচিত্তে, অসঙ্কোচে, পরমতৃপ্তিতে সেই গুরুদত্ত সেবাকে স্বীকার করছেন! জ্ঞান এখানে বিতরিত মাতৃস্নেহের সুমিষ্ট প্রচ্ছাদনে,—তাই কখনও তা শুষ্ক বা অনুপাদেয় নয়। সাধন-তপস্যা সংযম-কৃচ্ছ্রতাও তাই বড় মধুর এখানে। সৃষ্টির অধ্যাত্মইতিবৃত্তে মোক্ষদা জ্ঞানদা শ্রীশ্রীমা সারদা সত্য সত্যই এক বরিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। তাঁর সহজসরল মাতৃভাবের সঙ্গে গরিমান্বিত গুরুভাবটিও কেমন সাবলীল ছন্দে ব্যঞ্জনাময় ছিল,—তারই কয়েকটি উদাহরণকে আমরা স্মরণ করব এখানে।

সর্বপ্রথমে উপস্থাপন করছি একটি গ্রাম্য বালকের স্মৃতি,—মা যেমন সহজ, মায়ের 'গণেশ', এই বালকের আঁকা স্মৃতিচিত্রখানিও তদনুরূপ অতি সরল রেখাঙ্কন যেন! আমরা তদানীন্তনের সেই বালকটির—মায়ের গণেশের নিজের মুখের ভাষাকেই হুবহু উদ্ধৃত করব এখানে:

"শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি যখন আমি স্কুলে আট ক্লাসে পড়ি। সেটা ইংরেজী ১৯১৫ সাল। সত্যি কথা বলতে কি একটু হতাশই হয়েছিলাম। আমার কল্পনায় মা বিরাজ করছিলেন এইভাবে—তিনি বসে আছেন একটি সুন্দর সাজানো সিংহাসনে, দুপাশে সেবিকারা চামর দোলাচ্ছে। কিন্তু দেখলাম, তিনি থাকেন ছোট মাটির দেওয়াল দেওয়া খড়ের চালওয়ালা ঘরে। আরও দেখলাম, তিনি নিজে হাতে ঝাঁটা নিয়ে উঠান পরিষ্কার করছেন। তখন খুবই ক্ষুব্ধচিত্তে যাঁদের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম সেই পূজনীয় জ্ঞানদা (স্বামী জ্ঞানানন্দ) ও পূজনীয় গোপেশদাকে (স্বামী সারদেশানন্দ-কে) গিয়ে বললাম: 'এই সামান্য কাজটুকু করে মাকে সাহায্য করবার কি কেউ নেই?' তাঁরা উত্তর দিলেন: 'যাতায়াত করতে থাক্,—সবই জানতে পারবি।' আমাদের দেখে মা বললেন: 'বাবা, একটু দাঁড়াও। আমি এই কাজটুকু সেরে নিয়ে হাত ধুয়ে বসি, তখন আমাকে প্রণাম করবে।' আমরা অপেক্ষা করলাম। মা ঝাঁটা রেখে হাত ধুয়ে বিছানায় বসলেন। আমরা একে একে প্রণাম করলাম। প্রণাম করার সময় লক্ষ করলাম, একটি মেয়ে মায়ের বিছানায় শুয়ে আছে। আমার ভাল লাগল না। সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলাম: 'এই মেয়েটা কে? মায়ের বিছানায় শুয়েছে কেন? নীচে বিছানা পেতে শুতে পারে না?' পূজনীয় জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন: 'চুপ কর্, পরে বুঝবি সব।' ঐ মেয়েটি মায়ের আদরের রাধু।

"ওঁরা দুজন প্রণাম করার পর আমি প্রণাম করতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন: 'এই ছেলেটি কে?' তাঁরা উত্তর দিলেন: 'ছেলেটি বদনগঞ্জ স্কুলে পড়ে।' মা শুনে বললেন: 'প্রবোধের ছাত্র?' আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নাম শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।…

"মাকে দর্শন করার পর যখন বাড়ি ফিরব, তখন সস্নেহে বললেন: 'বাবা, আবার এসো।" সেইদিন থেকে প্রতি শনিবার জয়রামবাটী আসবার জন্য এবং মাকে দর্শন করবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠত। প্রতি শনিবার স্কুলে যাবার সময় একখানা কাপড়, গামছা আর সোমবারের পড়ার বই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম এবং ছুটি হয়ে গেলেই চলে যেতাম জয়রামবাটী। কয়েকবার যেতেই আমি মায়ের খুব পরিচিত হয়ে গেলাম।

"বয়সের তুলনায় বেঁটে ছিলাম বলে আমাকে আরও ছোট মনে হত। এই কারণে মা আমার সামনে আর ঘোমটা দিতেন না। এই জন্যই মাকে ভাল করে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ-ছাড়া মায়ের পায়ে বাত ছিল; এবং

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মায়ের পায়ে বাতের তেল মালিশ করে দেবার। এই মালিশ করবার সময় দেখেছি মায়ের পায়ের তলা অদ্ভুতরকম কোমল এবং হালকা গোলাপী রঙের...। একদিন তেল মালিশ করার সময় আমার মনে হল, মায়ের পায়ের বাত যদি আমার পায়ে আসে তো মা ভাল থাকেন, তবে খুব আনন্দ হবে। এই ভেবে মায়ের পায়ে হাত রেখে আমার ঐ হাতের কনুইটি আমার পায়ের হাঁটুতে ঠেকাতেই মা আমার চিবুকে চুমো খেয়ে বললেন: 'ছিঃ, ছিঃ, এ-সব কি ভাবছ? তোমরা বেঁচে থাক। ঠাকুরের কত কাজ করবে। আমি বুড়ো হয়েছি, আর কতকাল বাঁচব!'

"আমি মায়ের সঙ্গে বসে তরকারি কাটতাম। তাঁর উনানে আগুন ধরিয়ে দিতাম। আটা, ময়দা ঠেসে রুটি, লুচি বেলে দিতাম। মায়ের সঙ্গে বসে পান সাজতাম। ফুল, তুলসী, বেলপাতা, দূর্বা তুলে এনে, চন্দন পিষে তাঁর পুষ্পপাত্র সাজিয়ে দিতাম। ফল থাকলে কেটে দিতাম।

"বহু লোক মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে যান আর আমি দেখি। কিছুদিন পরে আমি ভাবলাম আমিও মায়ের কাছে দীক্ষা নেব। কিন্তু মনে সংশয়, কি জানি, আমি তো বেঁটে, নয়-দশ বছর বয়স, মা দীক্ষা দিতে রাজী হবেন কি না! মায়েরই এক বৃদ্ধা শিষ্যা,—মায়ের সেবার জন্য জয়রামবাটীতে থাকতেন, তাঁর ছেলে তখন উকিল, তাঁর সাথে পরামর্শ করলাম। তাঁকে বললাম: 'আমার তো দীক্ষা নেবার ইচ্ছা। আপনি তো এখানে সর্বদা মায়ের কাছে আছেন, আপনার কি মনে হয় মা দীক্ষা দেবেন?' তিনি বললেন: 'ভাই, তোমাকে দীক্ষা দেবেন বলেই তো মনে হয়। কারণ তুমি যদি একটা শনিবার বিকালে না আস তো মা বিশবার তোমার কথা বলেন। বলেন,—"রামময় কেন এল না; তবে কি ছেলের জ্বর হল?" আবার কিছুক্ষণ বাদে বলছেন, "বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলে, হয়তো পড়াশোনায় বেশি মন দিয়েছে, বোধ হয় সামনে পরীক্ষা আছে, তাই মাকে ভুলে আছে"—ইত্যাদি। এরকম বারে বারে তোমার কথা চিন্তা করেন। তোমাকে যখন এতো ভালবাসেন, তখন তোমাকে দীক্ষা দেবেন। তবে যদি বলেন, "আর একটু বড় হয়ে নেবে," সেকথা আলাদা।' আমি তো বড় হয়েছিলাম। বেঁটে বলে আমাকে ছোট দেখাত। যাই হোক, মাকে বলতেই তিনি খুব খুশি। বললেন: 'আচ্ছা তুমি দীক্ষা নেবে তো আসনটা পেতে নিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে বোসো।'...একখানি আসন মায়ের সামনে পেতে ঠাকুরকে ও মাকে প্রণাম করে বসলাম। মা কোশা থেকে কুশিতে করে জল নিয়ে

আমার গায়ে ছিটাতে ছিটাতে বললেন: 'পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাক। ইহজন্মের জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত সব পাপ নষ্ট হয়ে যাক।' এই বলে মা আমার দেহ শুদ্ধ করে নিলেন। পরে একটি দেবতার নাম উচ্চারণ করে বললেন: 'ইনিই তো তোমার ইষ্ট'। আবার মানে বুঝতে যদি না পারি তাই বললেন: 'এঁকেই তো তুমি সবচেয়ে বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা কর, ভালবাস? এঁর মন্ত্রই তো তোমাকে দেব।' তখন আমি বললাম: 'মা, আপনি ঠিকই ধরেছেন যে আমি ওঁকেই সবচেয়ে বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু এখন ঠাকুরের বই পড়ে সব দেবদেবী এক মনে হয়। আচ্ছা, আমি যদি কোন মন্ত্র চাই, তা আমাকে দেবেন?' মা বললেন: 'বল।' আমি তখন বললাম! মা বললেন: 'এই মন্ত্র পেলে তুমি খুশি হবে?' আমি বললাম: 'হ্যাঁ' তখন তিনি সেই বীজমন্ত্রটি শুনিয়ে দিলেন এবং কি-করে ১০৮ বার জপ করতে হয় দেখিয়ে দিলেন। দু'চারটি কথা ও উপদেশ দিয়ে বললেন: 'বাবা, গুরু আর ইষ্টকে এক জানবে, কোন ভেদ ভাবনা করবে না।'

"আমি তখন জানতাম না যে দীক্ষান্তে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। তা' ছাড়া আমার পকেটে সেদিন একটি পয়সাও ছিল না। বাড়ি থেকে খেয়ে ইস্কুলে যাই, ইস্কুল থেকে জয়রামবাটী—সবই হেঁটে, সুতরাং পয়সার দরকার হয় না। মা কিন্তু দক্ষিণা সম্বন্ধে কিছুই বললেন না। দীক্ষার পর আমি যখন মাকে দু'পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছি (কারণ মা আমাকে পূর্বে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে গেলে বলেছিলেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেই হবে) তখন মা বললেন: 'আজকে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে হয়।' কারণ এতদিন 'মা' ছিলেন, আজ 'গুরু' হলেন। তিনি নিজেই শিখিয়ে দিলেন, আর আমিও তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলাম। মা দুই হাত আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ও বললেন: 'চল বাবা চল, দু'টি খাবে চল। বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েছে।'

"আমি যেই বাইরে বেরিয়েছি, অমনি জ্ঞানদা (স্বামী জ্ঞানানন্দ) আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কিছু দক্ষিণা দিলি?' আমি বললাম: 'না, কি করে দেব? আমার পকেটে একটি পয়সাও নেই।' জ্ঞানদা তখন পকেট থেকে রুমাল বের করে টাকা, আধুলি, সিকি, দু'আনি ইত্যাদি যা' ছিল, সব আমার হাতে দিলেন। সব নিয়ে হয়তো আড়াই টাকা তিন টাকা হবে। সেই নিয়ে দরজার কাছে এসেছি, অমনি মা বললেন: 'কি বাবা?' আমি তখন সেই টাকাপয়সা মাকে দেখালাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: 'কোথায় পেলে?' আমি বললাম:

'জ্ঞানদা দিলেন।' তখন তিনি বললেন: 'আচ্ছা, দাও।'—বলে সেগুলি নিলেন। আমি আবার তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন: 'চল, এখন মুড়ি খাবে চল।' এই বলে একটা ছোট থালায় করে মা মুড়ি নিলেন এবং আমাকেও দিলেন। মা ও আমি পাশাপাশি বসে খাচ্ছি। মা মাঝে ওঁর থালা থেকে মুড়ি তুলে আমার থালায় দিয়ে বললেন: 'খাও বাবা খাও, বুড়ো হয়েছি, দাঁত নড়ছে, চিবুতে পারছি না।' অর্থাৎ আমি না চাইতে মা আমাকে প্রসাদ দিচ্ছেন।...আমি না বললেও করুণাময়ী মা নিজেই আমায় প্রসাদ দিয়েছেন।"

(—দ্রষ্টব্য: 'শতরূপে সারদা', পৃষ্ঠা ২৫১-২৬০)

মায়ের আদরের 'গণেশ'[১] সেদিনের সেই বালকটি আর কেউই নন,—উত্তরকালে আমাদের ভক্তিভাজন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ—রামময় মহারাজ। গুরু ও মাতা—এই যুগ্ম ভাবটিকে এমন আশ্চর্য সহজ-সুন্দর তুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উল্লিখিত স্মৃতিচিত্রখানিতে,—যা' সত্যই অনবদ্য। মা যেমন স্বভাব-সরল ও স্বচ্ছন্দ, মায়ের গুরুভাবটিও তেমনই অবলীলাকৃত ও অত্যন্ত অনায়াসসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমা সারদার মাতৃভাবটি যেমন অতি সহজসাধিত, সুগম ও লীলায়িত আমাদের কাছে,—তাঁর জ্ঞানদায়িনী গুরুমূর্তিখানিও ঠিক তেমনই সর্বতঃ গুরুভারশূন্য, সুবহ ও সহজ-উপলব্ধব্য। আরও এক কথা,—মাতৃভাব যেন তাঁর সব ভাবকে ছাপিয়ে দেদীপ্যমান, —মা-ই গুরুরূপিণী হয়েছেন ক্ষেত্রবিশেষে। আমরা পূজনীয় রামময় মহারাজকে তাঁর প্রায় নবতিপর বর্ষ পর্যন্ত দেখেছি—কিন্তু তিনি সেই মায়ের 'গণেশ'টিই ছিলেন মায়ের কোলে চিরবিশ্রামের দিনটি অবধি। শ্রীশ্রীমা তাঁর গুরু ছিলেন,—নিজের মা-ও ছিলেন। মনে হত তাঁর কাছে মা-ই ছিলেন সব,—গুরু, ইষ্ট, জননী। আমরা তাঁকেও তাই মায়ের পরমাদরের বালক-সন্তান গণেশরূপেই পেয়েছিলাম চিরকাল সর্বব্যাপারে।

সমরূপী আরও একখানি স্মৃতিচিত্র এখানে তুলে ধরতে ইচ্ছা করি—যাতে মাকে দেখব সহজ মাতৃ-প্রকৃতিতে, যুগপৎ মায়ের গুরুমূর্তিও পাব এক অনিন্দ্য সরল ভাব-রূপে। এখানেও আমরা জনৈক তরুণ সন্তানের স্মৃতিচারণাকে অনুসরণ করব। তিনি 'উদ্বোধন' ৫৫ বর্ষ, ১০ সংখ্যায় লিখেছিলেন:

---

১ পূজনীয় গৌরীশ্বরানন্দ মহারাজের পূর্বাশ্রমের নাম রামময়। বালক রামময় শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ নেওটা ছিলেন,—মা আদর করে বলতেন 'আমার গণেশ'।

"১৩১৫ সনের কথা।...হেমন্তের এক কুহেলীময় প্রভাতে গোমো-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে তিনটি বন্ধুসহ রওনা হয়েছিলাম বর্তমান জগতের পুণ্য তীর্থদ্বয়— কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে।...

"...কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া পরদিন অপরাহ্নে হাঁটিয়া আমরা জয়রামবাটী রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীমা তখন তাঁহার ভাইয়ের বাড়িতেই থাকিতেন। হাতমুখ ধুইবার পর আমি দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম বলিয়া বিনা দ্বিধায় বিনা সঙ্কোচে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। বন্ধুরা তখন বহির্বাটিতে বসিয়া মামাদের এবং পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে-ছিলেন।...ভিতরে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন বারান্দায় বসিয়া-ছিলেন। আমাকে বসিতে বলিয়া মা কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবা তোমার বে হয়েছে?' আমি বলিলাম—'না'।

"মা তখন বলিলেন,—'বাবা, মহীন্দর বই পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি একটু পড়ে শোনাও তো।' এই বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ, একখানি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। এই বই এখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রদ্ধাস্পদ মাস্টার মহাশয় (শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—শ্রীম) সর্বাগ্রে একখানি শ্রীশ্রীমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম 'প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের বাটী'...। যেখানে আছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)' সেখানে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাবা, মণি কে জান?' আমি উত্তর করিলাম,—'না মা, জানি না তো'। মা হাসিয়া বলিলেন—'মণি, উটি হচ্ছে মাস্টার নিজে'। সন্ধ্যা হইয়া গেল। পাঠ বন্ধ হইল। ইতিপূর্বে বন্ধুরাও আমি বাড়ির ভিতর গিয়াছি জানিতে পারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

"সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর, মা তাঁহার ঘরের ভিতর তক্তাপোশে উপবিষ্টা আছেন, মাটিতে কয়েকটি গ্রাম্য বালক ও বালিকা বসিয়া। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কোথায় বসিব ইতস্তত: করিতেছি। কারণ শহরে শিক্ষার প্রভাবে একদম মাটিতে বসিতে দ্বিধা বোধ হইতেছিল, অথচ ঘরে মাটির মেজেতে কোন রকম আসনও তখন ছিল না। শেষে অনেকটা হতভম্ব হইয়া মাকে বলিলাম,—'মা, আমি আপনার কাছে বসতে পারি এখানে?' মা বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যাঁ, বাবা, বোস, বোস।' আমি তক্তাপোশের উপর মায়ের নিকটে বসিলাম। এ কাণ্ডজ্ঞান তখনও

হয় নাই যে, মায়ের সহিত এক আসনে বসিতে নাই। মা ঐসব গ্রাম্য বালক-বালিকাদিগকে তাহাদের আত্মীয়স্বজন কে কেমন আছে, ক্ষেতে কি পরিমাণ ধান জন্মিয়াছে—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘মা, এরা সব কে ?’ উত্তর দিলেন,—‘এই সব আশেপাশের গ্রামের।’ দেখিলাম ঐ সকল বালক বালিকা প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু প্রসাদ লইয়া যাইতেছে।

“রাত্রির আহারের পর তখনই আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম, কারণ সকলেরই শরীর খুব ক্লান্ত ছিল। ভোরে উঠিয়া বাড়ির ভিতরে গেলাম। মাকে তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্ববর্তী অন্য একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরের ভিতর পাইলাম। তিনি তখন দাঁড়াইয়া, আমিও তদ্রূপ। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—‘বাবা, তোমাকে এই নাম দিলাম।’ ব্যাপারটি যেন এক মুহূর্তে ঘটিয়া গেল। কি যে হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এতই বোকা ছিলাম যে, আমি কিছুক্ষণ পরেই বাহিরের ঘরে আসিয়া, বন্ধুত্রয়ের একজনকে বলিতে উদ্যত হইলাম,—‘ছাখ্, আজ ভোরে মা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন, ‘ছাখো বাবা, তোমাকে এই নাম—।’ এই কথাটি এই পর্যন্ত বলা হইলেই বন্ধুবর আসল ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—‘ওরে চুপ্, চুপ্, ও-কথা কাউকেই বলতে নেই, বলতে নেই।’ আমি তো আরও হতভম্ব হইয়া গেলাম। জীবনের এই শ্রেষ্ঠতম দিনে, অতি প্রত্যূষ হইতেই আমার একের পর এক কারণে হতভম্ব হইবার পালা চলিতেছিল। পরবর্তী কালে পুস্তকে পড়িয়াছি, মা একবার বিষ্ণুপুর রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফরমে একটি হিন্দুস্থানী নারীকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্রদান করিয়াছিলেন।

“দ্বিপ্রহরে আমরা আহার করিতে বসিলাম। সেই দিনই বিকাল বেলা আমাদের কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। মা স্বহস্তে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন।...করুণাময়ী ..একটি বাটির ভিতর ভাত, ডাল, তরকারি সব একত্রিত করিয়া উহাকে ভক্তের জন্য প্রসাদে পরিণত করিয়া, আমরা যেখানে খাইতেছিলাম, নিজেই সেখানে লইয়া আসিলেন এবং বাটিটি হইতে সেই প্রসাদ কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের প্রত্যেকের পাতে পরিবেশন করিলেন।...

“শ্রীশ্রীমায়ের যে মূর্তি আমি দেখিয়াছি, তাহা স্মরণপথে উদিত হইলেই স্বতঃই মনে আসে আচার্য স্বামী প্রেমানন্দের কথা—‘রাজরাজেশ্বরী ঘর নিকুচ্ছেন,

ছেলেদের এঁটো পাড়ছেন।' আমার দেখা মা হইতেছেন মা-ই, সন্তানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামনায় ব্যাপৃতা। তাঁহার ঐশী ভাবের প্রকাশ দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই।...

"বিকাল বেলা আমরা যখন কলিকাতা আসিবার জন্য রওনা হইলাম, তখন মা বাড়ির বাহিরে একটুখানি দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া আমি পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও দাঁড়াইয়া আছেন আমাদের দিকে চাহিয়া। করুণাময়ী, অপার তোমার করুণা—যে যত অযোগ্য, যে যত অধম, তাহারই প্রতি তোমার তত অধিক করুণা!"

শ্রীশ্রীমায়ের ঐ 'অযোগ্য' 'অধম' তরুণ সন্তানটির নাম শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সান্যাল—যিনি উত্তরজীবনে ডিষ্ট্রিক্ট জজ রূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধুগণের মধ্যে স্মরণীয়—স্বামী মাধবানন্দজী ও স্বামী রাঘবানন্দজী যথাক্রমে নির্মল মহারাজ ও সীতাপতি মহারাজ। পূজ্যপাদ মাধবানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠাধীশরূপে বহুমানিত ব্যক্তিত্ব এবং পূজনীয় সীতাপতি মহারাজও শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে একজন বিদ্বান ও বিদগ্ধ সন্ন্যাসিরূপে সুখ্যাত। অনুকূল সান্যাল মশায়ও শ্রীশ্রীমায়ের একজন বিশিষ্ট সন্তান,—যাঁর জীবন ছিল সর্বতোভাবে মা-ময়। সান্যাল মশায়ের উল্লিখিত স্মরণালেখ্যখানিতেও আমরা বিমুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করছি যে, সেখানে মোক্ষদায়িনী গুরুরূপকে অতিক্রম করে 'মা হইতেছেন মা-ই'—এই সর্বাতিক্রান্ত মাতৃভাবই ভাস্বর হয়ে ফুটে উঠছে। অথচ মায়ের গুরুভাবটিও কত স্নিগ্ধ ও অনাড়ম্বর সুষমাময়ী হয়ে উঠেছে উক্ত স্মৃতিচিত্রে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর দীক্ষার দিনের এক বিশেষ স্বানুভূতির কথা প্রকাশ করেছিলেন। 'উদ্বোধন' ৫৬ বর্ষের ১২ সংখ্যায়—সেখানেও স্পষ্টতঃই ব্যক্ত হয়েছে মায়ের গুরুরূপকে ছাপিয়ে তাঁর মহিমামণ্ডিত সন্তানবৎসল মাতৃভাব। নরেশবাবুর অনুভূতিময় ভাষা:

"...পতিতপাবনী শ্রীশ্রীমা এই দীন সন্তানকে মহামন্ত্র দান করিলেন।...এতক্ষণে সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হৃদয়ে অনুভূত হয়ে গেছে। আমি যে আদ্যাশক্তি জগন্মাতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, অথবা জ্ঞান ভক্তি এবং মোক্ষদায়িনী শ্রীগুরুর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, সে-সব ভুলে গেছি। সামনে মা, শুধুই মা—তবে সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন সেই মা।"

গুরু ও ইষ্ট যেন প্রবহমান জীবনস্রোতের দুই কূল—উভয় কূলকে প্লাবিত ক'রে

নিরন্তর ধাবমান শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মাতৃভাব। মা মা মা,—সর্বাতিবর্তিনী মা ঃ 'সামনে মা, শুধুই মা,—সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন সেই মা।'

* * *

গুরু ও মা—অবতীর্ণা ভগবতীর দুই রূপ। মহাশক্তি শ্রীবিদ্যারই একটি জ্ঞানদা ভাব,—তখন তিনি গুরু। আবার যখন সেই তিনিই মহদ্ভয়নিবারিণী সন্তানপালিনী রূপ পরিগ্রহ করেন,—তখন তাঁকে ডাকি 'মা' বলে। বর্তমান গ্রন্থে এই গূঢ় তত্ত্বটিকে প্রকাশের চেষ্টা আগেও হয়েছে,—এখানেও মাতৃভাবের আলোচনাকালে সেই পুরাতন চেষ্টারই পুনরুল্লেখমাত্র করা হল। মাতৃতত্ত্বদর্শী আচার্য স্বামী সারদানন্দ তাঁর দৃপ্ত লেখনীমুখে 'ভারতে শক্তিপূজা' পুস্তকে জগন্মাতার উদ্দেশে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১৯-২০) ঃ

"গুরু মনুষ্য নহেন ; মনুষ্যমূর্তিতে বিদ্যারূপিণী তুমি। মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া আকার ও মূর্তিবিশেষ আশ্রয় করিয়া মানবের শিক্ষার্থে, হিতার্থে, মহত্ত্বয় বিনাশার্থে করুণায় প্রকাশিতা। আর মানুষী মূর্তিতে তোমার ঐরূপে কেন্দ্রীভূত হওয়া ? উহাও তোমার নানা লীলাবিলাসের মধ্যগত এক অপূর্ব লীলা-ভঙ্গ।"

মনে হয়, স্বামী সারদানন্দজী যখন 'ভারতে শক্তিপূজা' রচনায় ব্রতী হন, তখন তাঁর মানসপটে ভাস্বর ছিল শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীরই প্রতিমাখানি। দেবী সারদার প্রোজ্জ্বল গুরু ও মাতৃরূপ যুগপৎ ভেসে ওঠে, যখনই ঐ অনবদ্য শক্তিপূজাতত্ত্ব পঠিত হয় পুস্তকের কোনও অধ্যায় থেকে।

সুখ-দুঃখময় এ-সংসার আদ্যাশক্তি মহামায়ারই রচনা। দ্বিভুজা শক্তিমূর্তি মা-সারদাকে উদ্দিষ্ট 'অম্বা-স্তোত্রম্'-এ তাই কি মহর্ষিপাদ বিবেকানন্দ গেয়েছেন ঃ কে তুমি মা ? বিধ্বস্ত শান্তিকে সংসারে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতেই কি মা তুমি সদা তৎপরা ?

"কা ত্বং শুভে শিবকরে সুখদুঃখহস্তে
আঘূর্ণিতং ভবজলং প্রবলোর্মিভঙ্গৈঃ।
শান্তিং বিধাতুমিহ কিং বহুধা বিভগ্নাং
মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে॥"

ওগো কল্যাণময়ী মা, সুখ ও দুঃখ তোমার দুই হাতে। বল তুমি কে?

সংসার-বারিধির জল প্রবল তরঙ্গভঙ্গে নিয়ত ঘূর্ণায়মান। তুমি কি মা, বহুধা-বিভগ্ন শান্তিকে জগতে পুনঃস্থাপনার জন্যই নিরন্তর প্রযত্ন করে চলেছ?

মা, তোমার মাতৃভাব জগৎকে শেখানো,—জগতে স্থাপনার মূলে এই-ই বুঝি উদ্দেশ্য। সে-রহস্যই তবে ব্যক্ত হয়েছে স্বামিজী-কৃত উক্ত স্তবে। কখনও স্নেহময়ী মা হয়ে, কখনও বা গুরুরূপে, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ-আরব্ধ সেই মাতৃভাব-প্রতিষ্ঠাকার্যই সাধিত করে চলেছ। বিপর্যস্ত বিখণ্ডিত শান্তিকে জগতে পুনঃ সংস্থাপনাই তোমার আবির্ভাব-প্রয়োজন,—মাতৃভাব-সম্প্রচারণা ও সংপ্রতিষ্ঠার তাৎপর্য।[১]

"তুলি ঘোর ঊর্মিভঙ্গে মহাবর্ত তার সঙ্গে,
এ ভবসাগরে কে মা, খেলিতেছ বল না?
শিবময়ী মূর্তি তোর শুভঙ্করি, এ কি ঘোর,
সুখ দুঃখ ধরি করে কর সব ছলনা।
এতই কি তোর কাজ সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ,
অশান্ত ধরায় কি গো, শান্তিদান বাসনা?"

(—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-কৃত উক্ত স্তবাংশের পদ্যানুবাদ)

শুভঙ্করী মা যেমন সুখদা সারদা,—তেমনই দুঃখহারিণী জননী। শোক-তাপময় এই সংসার-সাগরে তিনি কেমন নিপুণ হস্তে শান্তি বিধান করেন, তার অজস্র দৃষ্টান্ত আজ সকলেরই পরিজ্ঞাত। অতি ক্ষুদ্র একটি অল্প-জ্ঞাত ঘটনার উল্লেখ এখানে না করে পারা যায় না। ছোট এক কণা কুয়াশা—কিন্তু তাতেও তো বিধৃত থাকে অন্তহীন আকাশভরা আলো। শৈশবে পিতৃহারা, বিধবা মায়ের নয়নমণি এক বালকের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে স্মরণ করছি,—যা থেকে আমাদের উল্লিখিত 'শুভা' 'শিবকরা' শ্রীশ্রীমায়ের শান্তি-বিধাত্রী 'প্রযত্নপরমা' রূপের আভাস কথঞ্চিৎ মিলবে।

শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান, বাঁকুড়ার বিভূতিবাবু একদিন তাঁর এক বালক ছাত্র শ্রীমান পঞ্চানন ঘোষকে জয়রামবাটীতে মাতৃপদপ্রান্তে নিয়ে যান। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বিভূতিবাবু পঞ্চাননকে নিজের ছাত্র বলে পরিচয় করিয়ে দেন। বালক পঞ্চানন তার মাস্টার মহাশয়ের উপদেশমতো শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম নিবেদনের

১ 'প্রকৃতিং পরমাং' প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮ দ্রষ্টব্য। সেখানে আলোচিত হয়েছে, জগদম্বা সারদা এই সৃষ্টির ভগ্ন শান্তিকে কী আশ্চর্য কুশলতায় নিজেই জুড়েছেন,—এ-জন্য কতোই না আত্মনিবিষ্টতা তাঁর!

উপক্রম করছে,—এমন অবস্থায় মায়ের পায়ের ও হাতের দিকে দৃষ্টি পড়ায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে, চমকে ওঠে। অস্ফুটে বলে ফেলে : "একি !" বালক লক্ষ্য করেছিল, শ্রীশ্রীমায়ের পা-দুখানি অবিকল তার গর্ভধারিণী মায়েরই পা ! আর মায়ের কোলের উপর রাখা পাকদেওয়া বালা-পরা হাত দু'খানিও যেন ঠিক তার গর্ভধারিণীরই। এবার পঞ্চাননের পরিণত বয়সে স্ব-লিখিত স্মৃতিচারণ :

"আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্রীশ্রীমায়ের হাতের দিকে চাহিয়াছিলাম। এখন আমার পূর্বের মত বিহ্বল অবস্থা। এক-পা এক-পা করিয়া কখন ঘরের ভিতর গিয়াছি, জানি না। পায়ের আঙ্গুল ও হাতের আঙ্গুল, হাতের চেটোর দাগ, সেই বালা—এক কথায় বুক হইতে পা পর্যন্ত প্রত্যেক খুঁটিনাটি সব সেই। কোথাও একটুও তফাৎ নাই। আমি সব ভুলিয়া আমার অতীতের সদ্যোবিধবা মাকে দেখিতেছিলাম। পা হইতে ক্রমশঃ যখন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, সম্মুখস্থা মা করুণস্বরে বলিলেন; 'বাবা, অমন করছ কেন বাবা ? কি হয়েছে বাবা ? এস বাবা, এস। আমি তাঁহার কোলের কাছে গিয়াছি, আর অমনি সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কি এক অপার আনন্দে আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল আমি আমার গর্ভধারিণী মার কাছে আছি, আর আমার মা আমার পিঠে হাত বুলাইতেছেন। উপরে দৃষ্টি পড়িবামাত্র আমার লজ্জা হইতে লাগিল, মুখ হইতে দৃষ্টি পায়ের দিকে নামাইলাম। পায়ের নিকট অপর পাত্রে ফুল রক্ষিত ছিল ; তাহা চরণে দিয়া প্রণাম করিবার জন্য অবনত হইবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া বলিলেন, 'না বাবা, তোমাকে প্রণাম করতে হবে না বাবা, খুব হয়েছে বাবা থাক, বাবা,—থাক,।' আমি তাঁহার কথা না শুনিয়া চরণ দুইটিতে ফুল দিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া আমার চিবুক ধরিয়া একটি চুমা খাইলেন। ওঃ! তখন আমার কি লজ্জা হইল, ছুটিয়া পলাইয়া আসিলাম।"

(—অক্ষয়চৈতন্যকৃত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী', পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২)

পঞ্চানন অনেকক্ষণ ধরে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে করতে তার সেই 'পূর্বের মত বিহ্বল অবস্থা' হয়েছিল, উদ্ধৃত বিবৃতি থেকে এই-টুকু জানা গেল। কিন্তু এখনও জানা হয়নি, তার 'পূর্বের অবস্থা'-টি বলতে কোন্ অবস্থা ! সে-অবস্থাটির চিত্র এইরূপ :

পঞ্চানন তখন অতি শিশু—জ্ঞান হয়নি কিছুমাত্র। কলকাতায় বাবার মৃত্যু

হয়েছে। পঞ্চানন বড় হয়ে নিজেই লিখেছেন: "বাবা কি জিনিস, আমি তখন বুঝিতাম না; আর মার ক্রন্দনের কারণও বুঝিতে পারি নাই। আমি এক দৃষ্টে ক্রন্দনরতা মার মুখের দিকে চাহিয়া বিহ্বল হইয়াছিলাম।"

পঞ্চাননের মা পতিহারা হয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। বৈধব্যাবস্থায় তাঁকে সাদা থানধুতি পরতে দেখে, গ্রামের প্রবীণারা, পাছে কোলের ছেলেটির অকল্যাণ হয়, তাই তাঁকে সাদা থান ছাড়িয়ে নরুণপেড়ে কাপড় ও দুই হাতে দুই গাছি পাকদেওয়া বালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। পঞ্চাননের সেই স্মৃতি মনে গভীর-ভাবে ছাপ ফেলেছিল,—পরিণত বয়সেও মাতৃভক্ত সন্তান, মায়ের সেই বৈধব্যবেশ এবং অবিরাম ক্রন্দনকে ভুলতে পারেনি। পূর্বের বিহ্বলতা তার সেই বাল্যের অশ্রুসিক্ত গর্ভধারিণীর মূর্তি স্মরণেই।

পূজনীয় অরূপানন্দজী—রাসবিহারী মহারাজ অতি শৈশবেই তাঁর গর্ভধারিণী জননীকে হারান। বুকের মধ্যে একটা নিরন্তর শূন্যতাবোধ তাঁকে বেদনার্ত করে রাখত,—মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত রাসবিহারী যখন খেলাধূলা সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন তখনই যেন একটা অপূরণীয় অভাব তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরত। কানে আসত, পল্লীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে তৃষিত সুমিষ্ট 'মা' 'মা' ডাক,—আর তখনই তাঁর প্রাণটা হাহাকারে ভরে উঠত। একটু বয়স হলে, যখন জয়রামবাটীর ঠিকানা জ্ঞাত হলেন—তখন যেদিন সেখানে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের চরণসমীপে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই দিনই তাঁর অন্তরের সব শূন্যতা এককালেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—তিনি অনুভব করেছিলেন তাঁর রিক্ত হৃদয়পাত্রটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ। শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেন তিনি জয়রামবাটীতে ১ ফেব্রুআরি, ১৯০৭। তাঁর সেই অমর স্মৃতি-নিবন্ধ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত,—যা কেবলমাত্র জনৈক সন্তানের ব্যক্তিগত স্মৃতিই নয়, বস্তুতঃ ঐ সন্দর্ভটি একটি সুচিত্রিত মাতৃ-স্বরূপালেখ্য। সেখানে দেখি,—প্রথম সাক্ষাতেই বাহ্যতঃ অপরিচিত এক কিশোরকে মা বলছেন:

"এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ। হয়তো জগন্মাতা ভেবে এসেছ।"

মাতৃদর্শন-বিমুগ্ধ রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলেন: "তুমি কি সকলেরই মা?"

মা—"হাঁ"।

রাসবিহারী—"এই সব ইতর জীবজন্তুরও ?"

মা—"হাঁ, ওদেরও।"

কিছুক্ষণ বাদে মাতৃস্নেহ-স্নাত রাসবিহারী আবার জানতে চান: "আমি কি তোমার আপনার ?"

তৎক্ষণাৎ মা উত্তরে বলেন: "হাঁ আপনার বই কি! 'যে যার সে তার যুগে যুগে অবতার'।"

একবার কলকাতায় বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে, সন্ধ্যার পর ডাক্তার কাঞ্জিলাল, সিন্ধুনাথ পাণ্ডা প্রভৃতি মায়ের সন্তানগণ মায়ের চরণসকাশে উপস্থিত,—সেখানে ড. হ্বালক ও কুমারী গ্রে—দু'জন পাশ্চাত্য ভক্তও ছিলেন, মহাকবি গিরিশচন্দ্রও দরজার চৌকাঠে বসেছিলেন। পাশ্চাত্য ভক্ত দুটি ইংরেজীতে কথা বলছিলেন মায়ের সঙ্গে,—গিরিশবাবু দোভাষীর কাজ করছিলেন। কুমারী গ্রে অতি বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন মাকে—"মা, আমি কি আপনার মেয়ে ?" মা মিষ্টি হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—"হ্যাঁ, তুমি আমার মেয়ে।" ড. হ্বালক তখন বলেন—"আপনি যে জগন্মাতা, আমাদের সকলেরই মা, তা কেমন করে বুঝব ?" শ্রীশ্রীমা তৎক্ষণাৎ জবাব দেন: "এখানে যখন এসে পড়েছ, তখন ঠিকই বুঝতে পারবে।"

শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপগত এই মাতৃভাব—জগন্মাতৃত্ব ছিল যেন তাঁর অঙ্গের বিভা। বিচ্ছুরিত যার জ্যোতিঃ সমীপবর্তী সকলকেই স্পর্শ করত। পৃথিবীর যে কেউ প্রথম দর্শনেই স্ব স্ব হৃদয় দিয়ে মাকে মা বলেই উপলব্ধি করে ফিরতেন,—যেন নিজের বাড়ির মা। সকল ব্যষ্টির সম্মিলিত আকারের নাম সমষ্টি। সকল মায়েরই একীভূত রূপ বিশ্বমাতা শ্রীসারদা—জগজ্জনের বুকভরা ডাক নাম শ্রীশ্রীমা।

শ্রীনীলকান্ত চক্রবর্তী মায়ের বিশিষ্ট এক স্নেহের সন্তান। তিনি 'উদ্বোধন' ১৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যায় লিখেছিলেন:

"শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে যে-ই গিয়াছে, সে-ই অনুভব করিয়াছে সে জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস পাইয়াছে—অফুরন্ত রত্নভাণ্ডার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। স্বতঃই মনে হয় অনন্তশক্তিময়ী মা যে করুণামূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে চিন্তা করিবার, ভালবাসিবার ও পূজা, প্রণাম করিবার সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে একমাত্র আশ্রয় এবং অভয়।

শ্রীশ্রীমায়ের অতুলনীয় মহিমা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। যিনিই তাঁহার সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন অনাবিল শান্তি, অফুরন্ত ভালবাসা, অসীম স্নেহ এবং সর্বোপরি বিশ্বমাতৃত্বের আভাস।"

নীলকান্তবাবুর আবেগযুক্ত এই মন্তব্য শ্রীশ্রীমাকে—তাঁর অনবদ্য মাতৃস্বরূপকে আমাদের বোধের পটে প্রতিফলিত করতে অনেকটা সাহায্য করবে,—এ-কথা বলাই বাহুল্য। মাতৃ-সন্নিধিতে উপনীত ব্যক্তিমাত্রই একটা পরমপ্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছেন,—করেছেন কেন, করেই থাকেন, এ-কথা ধ্রুব সত্য—বহুধা প্রমাণীকৃত তথ্য।

একবার নীলকান্তবাবু সংসার-জীবনে কেমন একপ্রকার হতাশায় জর্জর হয়ে অবশেষে উদ্বোধনের বাড়িতে গিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পদতলে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ, নয়ন ছিল অশ্রুসিক্ত। প্রিয় সন্তানকে অমন অবস্থায় দেখে, মা বিশেষ বিচলিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, তার ওরূপ হতাশার কি কারণ: "কি হয়েছে বাবা, আমাকে সব কথা খুলে বল।" নীলকান্ত মাতৃচরণে মনোব্যথা—প্রাণের কথায় সবই নিবেদন করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা অভয় প্রদান সহ সে-সবের উত্তরে বলেছিলেন: "ভয় কি বাবা, তোমরা এত ভাবনা-চিন্তা কর কেন? ভয়ের কি আছে? তোমরা সাধন-ভজন আর কি করবে? আমিই তো তোমাদের জন্য করছি। তোমরা যে যা খুশি কর না কেন, শেষকালে ঠাকুরকে আসতেই হবে তোমাদের নিতে। দেখ একটা কথা বলি—স্মরণ-মনন রাখলেই হবে। সর্বদা মনে রাখবে, তোমাদের পেছনে একজন আছেন, তিনিই সর্বদা রক্ষা করবেন।"

নীলকান্তবাবু ঐদিনের কথা স্মরণ করে উত্তরকালে লিখেছেন: "মায়ের এই অভয়বাণীই আমাদের সম্বল—শান্তি আর সান্ত্বনা। আমি ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। আমার সমস্ত দুঃখের অবসান হইল, আনন্দে মন-প্রাণ ভরিয়া গেল।"

সন্তান-সন্তাপহারিণী মা এমনই ভাবে জীবের সর্ব অভাবকে দূর করে দিয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করেন,—অতীতেই শুধু নয়, তিনকালেই তাঁর একই-স্বভাবরীতি। তিনি মাতা—অহর্নিশ সন্তানের দুঃখদুর্দশা অভাবের পরিমাপ করে চলেছেন, যাকে যেমন, তাকে তেমনই দিয়ে থাকেন। জগতের মাতা সারদা,—সকলের সকল অভাবের ও প্রয়োজনের প্রমাতা।

* * *

দুঃখ-হতাশার মূলে থাকে অভাব। অভাব কি এক রকম? অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, শিক্ষার অভাব, দীক্ষার অভাব প্রভৃতি অসংখ্য অভাব প্রতিনিয়তই ক্লেশ দিচ্ছে আমাদের। যদিও অজস্র অভাব প্রতিনিয়তই মানুষকে পীড়ন করছে, —তথাপি দেখা যায়, মূলতঃ অন্ন-বস্ত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষার অভাবই প্রধান পীড়ক দেহধারীর পক্ষে। স্থূল শরীরের দুঃখ মেটে, মোটামুটিভাবে অন্ন বস্ত্রের অভাব পূরণে। আর সূক্ষ্ম শরীর—মন-বুদ্ধির ক্লেশ নিবারিত হতে পারে শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা। কিন্তু হায়, এতো যে অভাব সততই উৎপীড়িত করছে মানুষকে,—মানুষ কিন্তু সে-সম্পর্কে অচেতনই থেকে যায় সারা জীবনব্যাপী। মায়া হচ্ছে এখানেই। অভাব আছে, কিন্তু অভাবের বোধ নেই। সকলেই ভাবে বেশ আছি। অভাবকে না জানার একটা আরাম আছে,—একটা অনার্জব বিশ্বাসের নেশায় বলি, ভগবানের অনুগৃহীত আমরা।

পূর্ণের সান্নিধ্যে কখনও যদি গিয়ে পড়ি, তখনই পূর্ণতার আলোকে আমাদের জমাট অভাবের চেহারাটা ধরা পড়ে যায় চোখে। অভাব বোধ জাগে সেই ক্ষণেই—প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ঐ অভাব কেমন করে ঘুচবে—কে ঘোচাবে এই দুর্বহ দুঃখ। বাড়িতে আছি—চলি, ফিরি, খেলি, বেড়াই,—কাজকর্মে মেতে থাকি,—ক্ষুধায় খাই, তৃষ্ণায় পান করি, শ্রান্তিতে ঘুমাই—সবই ঠিকমতো চলে আমার দৃষ্টিতে। আবার কখনও কখনও অভাবের তাড়নায় হতাশ হয়ে পড়ি—যা চাই তা পাই না। কিন্তু তা'ও তো সাময়িক। সে-অভাবও মিটে যায় কোনও বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্যে। আবার সব ঠিক চলে—যেমন চলছিল তেমনই। জীবন তো আমাদের এই-ই।

বাড়িতে মা আছেন একলাটি তাঁর ঘরে। কদাপি একটিবার তাঁর কাছে যাই না,—যাবার তাগিদও বোধ হয়নি অন্তরে। মা আছেন,—থাকুন। আমি চলি আমার ভাবে। কতোবার মায়ের ঘরের দ্বারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি,—তবুও প্রবেশ করিনি ভিতরে। কতোবার মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেছি, চোখ ফিরিয়ে দেখিনি মায়ের দিকে। দৈবাৎ বুকের মধ্যে কার একটা স্বর শুনে চমকে উঠি: 'মা আছেন'। তখনই ছুটে যাই মার খোঁজে। মায়ের ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে কাছে বসি। মা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন: "কেমন আছ বাবা?" মায়ের দৃষ্টি, স্পর্শ, কণ্ঠস্বর—আমাকে যেন চেতনা এনে দেয়। সংসারের উপকরণভরা বাড়ির মধ্যে চলেছি ফিরেছি,—কিন্তু এখনই উপলব্ধি করতে সক্ষম হই যে, ঐ সব উপকরণের সত্তার শুধুই অভাবময়। পরিপূর্ণাকে সম্মুখে পেয়ে,



ভারত মাতা

শিল্পী : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীরঘুনাথ গোস্বামীর সৌজন্যে।

তাঁর করুণা দৃষ্টিপাতে সম্বিদ ফিরে পেয়ে নতুন করে মাকে জানাই আমার সমস্ত অভাবের কথা, হতাশার কাহিনী।

মাকে নয়নভরে দেখলাম—আমার জন্য সবই তিনি সঞ্চয় রেখেছেন: অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, দীক্ষা। জীবনের যাবৎ অভাবের মোচনকারিণী মা,—যেন তাঁর ভাণ্ডারকে ভরে রেখেছেন আমাদের সকল অপূর্ণতাকে মেটাবার জন্য। "খালি পেটে ধর্ম হয় না"। আবার ধর্ম না হলে শান্তি হয় না। ধর্মের উৎকর্ষ শিক্ষায়। শিক্ষার পরাকাষ্ঠা জ্ঞানলাভে। জ্ঞানের পরিপূর্তি পরমার্থ-তত্ত্ববোধে।

দানপ্রিয়া মা যেন চতুর্ভুজা হয়েছেন,—সন্তান-পালনের ও সৃষ্টি-সংরক্ষণের জন্যই। তিনি দুই হাতে অন্ন ও বস্ত্র,—অপর দুই হাতে শিক্ষা ও দীক্ষা বিতরণপরা। অন্ন-বস্ত্রের অভাবপূরণ করে, মা ধর্মচর্চার যোগ্যতা বিধান করেন। ক্রমে প্রকৃত শিক্ষাদান করে, সন্তানকে জ্ঞানের অধিকারী করে দেন। অতঃপর দীক্ষাপ্রদানের দ্বারা তাকে পারমার্থিক সত্যের আলোক দ্বারে উপনীত করান।

মনে পড়ে, বিগত শ্রীশ্রীমা-আবির্ভাব শতবার্ষিকীর প্রচার-পত্রে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের বিখ্যাত শিল্পকৃতি চতুর্ভুজা মাতৃমূর্তির চিত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল,—যা' বর্ষব্যাপী সকল অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপিকা হিসাবে সারা ভারতের জন-নেত্রে সমুদ্ভাসিত ছিল। উক্ত চিত্রে মায়ের দানরতা চতুর্ভুজ বিশেষ তাৎপর্যবহ,—এক হাতে ধান্যশীষ, আর এক হাতে সূত্রগুচ্ছ, অপর হাতে বেদ অন্য হাতে অক্ষমালা। ধান্যশীষ নিঃসন্দেহে অন্ন-প্রতীক, সূত্রগুচ্ছ বস্ত্রের। বেদ শিক্ষার দ্যোতক এবং অক্ষমালা দীক্ষার স্মারক। মাতৃমূর্তির যে-ডৌল শিল্পগুরুর ধ্যানে প্রকাশিত—সেখানেও লক্ষণীয় হচ্ছে যে, আমাদের অতিপরিচিত সেই জয়রামবাটীর পল্লীকুটিরবাসিনী মায়েরই মুখচ্ছবিখানি যেন চিত্রপটের অন্তরালে প্রতিফলিত। শিল্পগুরুর ধ্যানমানসে এই মাতৃমূর্তির আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর তাৎপর্যমণ্ডিত সংঘটনা।

শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দী জয়ন্তীতে ঐ বিশেষ চিত্রখানিকেই বিজ্ঞাপিকা রূপে নির্বাচনও বেশ রহস্য-দ্যোতক। শ্রীশ্রীমা সারদাই ভারতমাতার সজীব প্রতিমারূপে জনচিত্তে পূজিতা,—স্বাভাবিক যুক্তিতে এই সত্যটিই কি প্রতিপাদিত হচ্ছে না? অবনীন্দ্রনাথ কি সত্যই তাঁর কল্প-লোকে শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন?

কবি 'বনফুল' এই মায়েরই উদ্দেশে এক অপূর্ব ধ্যানমালা গেঁথে নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রীপদে:

"আমার কল্প-লোকে কিন্তু পেয়েছি।
দেখেছি তোমার ছবি,
অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত।
ইতিহাসের পাতায় হয়তো আঁকা নেই সে ছবি
কিন্তু আমি দেখেছি।
দেখেছি আকাশরূপিণী শক্তিকে,
লক্ষ-কোটি-সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র-ধাত্রীকে,
মহাশূন্যাকে,
মহাপূর্ণাকে,
ভূমারূপিণী ভূয়িষ্ঠাকে
বাঙ্ময়ীকে, অবাঙ্ময়ীকে,
প্রকাশ-ঐশ্বর্যরূপিণী বাণী-কমলাকে
সন্ন্যাসিনী শঙ্করীকে।

"দেখেছি
আকাশচুম্বী পর্বতের শিখরে শিখরে
অন্তহীন সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গেই নয় শুধু,
নেমে এসেছ তুমি
ধরণীর ধূলিধুসরিত উষর প্রাঙ্গণে
শ্যাম সম্পদে ঘুচিয়েছ তার দৈন্য।

"অয়ি, শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী,
দেখেছি,
তুমি শুধু আকাশ নও,
তুমি ধরিত্রীও।"

(—'উদ্বোধন' শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা)

* * *

'স্বাগতম্ জননী!'

বেলুড় মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসবের সমারোহ। মঠের প্রবেশ-দ্বারের দুই প্রান্তে মঙ্গলঘট স্থাপিত,—পত্র-পুষ্পাদিতে

সুসজ্জিত নবনির্মিত তোরণের উপরে, লাল শালুতে তুলা দিয়ে লেখা 'স্বাগতম্ জননী'! বাসন্তী গাঁদাফুলের মালায় সুশোভিত মাতৃ-আবাহন-অঙ্কিত সেই তোরণ যেন মায়ের আপামর সন্তানকে আকর্ষণ করছিল মায়ের চরণপ্রান্তে উপনীত হতে। আনন্দময়ীর শুভাগমনে সেদিন সমগ্র মঠভূমি আনন্দ-বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। উপস্থিত সন্তানগণ ঐ-কালের আনন্দ-স্নানে কী-পরিমাণ অভিভূত ছিলেন, তার একখানি স্মৃতি-আলেখ্য এখানে উপস্থাপনার ইচ্ছাকে সংবৃত রাখা যাচ্ছে না। ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমে একদিন সেই দিব্য-আনন্দ-চিত্রখানিকে খুলে ধরেছিলেন স্বামী কমলেশ্বরানন্দ—পূর্বাশ্রমে যাঁর নাম ছিল ললিতমোহন বসু। সাল-তারিখ মনে ছিল না তাঁর,—শুধু স্মরণে রেখেছিলেন, সেই অদৃষ্টপূর্ব আনন্দ-দৃশ্যখানি, যা' শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ আবির্ভাবে বেলুড় মঠে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কমলেশ্বরানন্দ তখন যুবক ললিত,— শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে। উত্তরকালে ব্যক্ত সেদিনের সেই উদ্দীপনা-দৃপ্ত স্মৃতি তাঁর ভাষায় :

" 'স্বাগতম্ জননী!'···তোরণের মস্তকে গাঁদাফুলের মালা তোরণখানিকে যেন আলো করে রেখেছে। মা-জননী সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসছেন, তাঁকে সাদরে আহ্বান করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন সব মহারাজরা। সেদিনের ঘটনা মনে পড়ছে, তোরণের দ্বার অতিক্রম করে মা-জননীর গাড়ি যেমন মঠের মধ্যে প্রবেশ করল, অমনি যোগীন-ঠাকুরের ছেলেরা শঙ্খধ্বনি করতে করতে মাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে এল। এদিকে কীর্তনের দলও মৃদঙ্গধ্বনি করে অতি মধুরভাবে 'আমরা মা পেয়েছি, মা পেয়েছি, মা পেয়েছি রে' বলে দিগন্তব্যাপী রবে মঠকে কম্পিত করে তুলল। পূজনীয় শরৎ মহারাজ গাড়ি থেকে নামলেন। ধীরে ধীরে গোলাপ-মা এবং যোগীন-মাও শ্রীশ্রীমার গাড়ি থেকে নামলেন। অশোকতলার কাছে গাড়ি দু'খানি রাখা হল। যেখানে মঠের পুষ্করিণী সেখানে গোয়ালঘরের পাশে মা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নামলেন। ঠিক তারই কিছু পূর্বদিকে এখন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির।···যতদূর স্মরণ আছে, পূজনীয় হরি মহারাজ, পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ, পূজনীয় শুকুল মহারাজ, পূজনীয় অমূল্য মহারাজ, পূজনীয় নীরদ মহারাজ প্রভৃতি অগ্রবর্তী হয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মঠের আঙিনায় এসে উপস্থিত হলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ির কাছে এসে, মা পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়ালেন, আর মায়ের আরতির জন্য পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি জ্বালা হ'ল। মাকে আরতি করা হবে। পূজনীয় শুকুল মহারাজ

সেদিনের পূজায় পূজারী। তিনি ধীরে ধীরে আরতি করতে লাগলেন—শেষে মাকে চামর ব্যজন করা হল। এতো জনসমাগম হয়েছিল যে. আমরা অনেক পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম। বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে মায়ের এই অপূর্ব পূজা হচ্ছে দেখছি। দূরে থাকলে কি হয়! আনন্দের আর সীমা নেই, চারদিকেই আনন্দ, আনন্দময়ীর আগমনে থৈ থৈ করছে আনন্দ। আনন্দ আর ধরে না। এত আনন্দ যে মুখে বলে বুঝানো যায় না। কীর্তন হচ্ছে 'জয় মা' 'জয় মা' রবে, উদ্দাম নৃত্য হচ্ছে 'জয় মা' 'জয় মা' রবে। সে-মধুর দৃশ্য স্বপ্নের মতো আমার হৃদয়ে ধীরে ধীরে জাগছে। যেন সব আনন্দের দেশের লোক এক জায়গায় এসে আনন্দ করছেন। সেই আনন্দের স্রোতে, সেই আনন্দের মন্দাকিনীধারায় সকলেই সুস্নাত। পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজ সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের আগমনে কি যে আনন্দে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন. তা পূজনীয় শ্রীশ্রীমহারাজের পরমপারিষদ ভক্তগণ অবগত আছেন।...

" · সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের আরতি শেষ হয়ে গেলে মঠে একটি আনন্দের হাট বসে গিয়েছিল। মঠের প্রাঙ্গনে যে ভীম গর্জনে 'জয় মা' 'জয় মা' রবে আশুতোষ ভট্টাচার্য নামক জনৈক ভক্ত উদ্দাম নৃত্য করেছিলেন তা আমি যেন এখনও প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। তিনিই সেদিন কীর্তনে অগ্রণী ছিলেন, এতো মেতে গিয়েছিলেন যে একটু অস্বাভাবিক রকম বোধ হয়েছিল। ওদিকে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে আর এক অপূর্ব ব্যাপার—শ্রীশ্রীমহারাজ এমন একটা গভীর ভাবে মগ্ন হয়েছিলেন যে তাঁর সেবকরা রীতিমতো ভয় পেয়েছিলেন। শেষে শ্রীশ্রীমাকে ঐ ব্যাপারে সংবাদ দিতে হয়েছিল এবং মা স্বয়ং এসে সেদিন তাঁর মনকে উচ্চ ভাবভূমি থেকে ব্যবহারিক ভূমিতে নামিয়ে এনেছিলেন।..."

একটি সহজ সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-নিস্যন্দী ঘটনা-চিত্র। বেলুড় মঠে মায়ের মাত্র উপস্থিতিতেই এক অবাধ অনিরুদ্ধ উদ্দাম আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল,—যার প্রভাবও ছিল অপ্রতিহত ও চিরস্থায়ী। শুধু একটিই অভিব্যক্তির অনুরণন: 'মা পেয়েছি, মা পেয়েছি, মা পেয়েছি রে!' বিচার-বিতর্ক সব স্তব্ধ ছিল, সকল জিজ্ঞাসার লয়,—কেবলমাত্র পাওয়ার আনন্দেই মেতে উঠেছিলেন সবাই। সন্তানের পক্ষে এর চেয়েও অধিকতর সংপ্রাপ্তি আর কি হতে পারে? তাই মা পাওয়ার আনন্দও তাদের কাছে ছিল অমন উচ্ছল অনন্তরায় অনবরোধ ও মুক্ত। দিনটি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসবের,—নরবেশে ঈশ্বরের ধরাধামে অবতীর্ণ হবার তাৎপর্য স্মরণের। তাই এমনিতেই সবার চিত্ত সেদিন পুণ্য আনন্দস্মৃতিতে ভরপুর ছিল,—কিন্তু সে-স্মৃতি ছিল গম্ভীর ও শান্ত-সংবৃত।

কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তা' রূপ নিয়েছিল এক সর্বপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল আনন্দের পূর্ণ জোয়ারে। এই-ই হচ্ছে স্বাভাবিক মাতৃভাবের স্বতঃপ্রকাশ। শ্রীশ্রীমা সেই স্বতঃউৎসারিত মাতৃত্বেরই সাকার বিগ্রহ,—যাঁকে প্রতিষ্ঠাপনা করেছেন জীবদুঃখাসহিষ্ণু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা এই মায়ের লীলাকর্মের রহস্য ও মহিমা সহ তাঁর দিব্যস্বরূপের উপলব্ধি করতে তাঁরই করুণার অপেক্ষা রয়েছে। 'বিবৃণুতে তনুং স্বাম্'—মা তাঁর আপনার স্বরূপ আপনিই প্রকাশ করেন শরণপ্রাপ্ত সন্তানের কাছে। যাঁরা শ্রীশ্রীমার স্বরূপরহস্যের আভাস কথঞ্চিৎও জীবনে লাভ করেছেন, তাঁরা আত্মহারা হয়েছিলেন সকলেই.—বলতে পারেননি কিছুই তাঁরা, শুধু 'মা পেয়েছি, মা পেয়েছি, মা পেয়েছি রে'—এই মাত্র ধ্বনি ছাড়া। পুরাণে আছে, স্বয়ং দেবাদিদেব শিব জগদম্বা মহাকালীর স্বরূপ সাক্ষাৎকার করে পাগল হয়েছিলেন। অন্য পরে কা কথা! সাক্ষাৎ শিবাবতার স্বামী বিবেকানন্দও সর্বসমক্ষে মাতৃস্তুতি করেছিলেন :

"মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও জানি, তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, দ্বিতীয় নাই।"

'শ্রীশ্রীসারদা দেবী'—গ্রন্থে প্রকাশিত প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অমৃতানন্দ প্রদত্ত বিবরণী থেকে জানা যায়, শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কীরূপ ভাবান্তর হ'ত, তার একখানি হৃদয়ানন্দী চিত্র। সে-চিত্রখানিও বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত। ভাব বর্ণাঢ্য সে-ছবি এই :

"একবৎসর ঠাকুরের সাধারণ উৎসবের দিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা স্ত্রী-ভক্তদের লইয়া মঠে আসিয়াছেন। মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) গেটে দাঁড়াইয়া 'মহামায়ী কি জয়' রবে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন।...মা উপরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং নামিয়া আসিয়া, মহারাজের প্রার্থনায় ঠাকুর ঘরের সিঁড়ির প্রায় আট হাত দক্ষিণে আসনের উপর দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া কম্পিত হস্তে রোমাঞ্চিত কলেবরে ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করিলেন। মহারাজের আদেশে সাধু-ভক্তগণ দুই সারি হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন। এবং করজোড়ে 'সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে' ইত্যাদি স্তব পাঠ করিয়া মার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন। মা তখন চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া—মুখের ঘোমটা খানিকটা উপরে উঠিয়াছে,—মহারাজ তাঁহার

সম্মুখে করজোড়ে পূর্বাস্য হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—চক্ষে ধারা সেই দিন মহারাজ বালকের মত হইয়া গিয়াছিলেন।...”

“তোমার মতো মা জগতে ঐ একটিই, দ্বিতীয় নাই।” স্বামিজীর এই হৃদয়ানুভূতিই শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে এতাবৎ জ্ঞাত সকল প্রশস্তির মধ্যে চমৎকারিত্বে অনবদ্য। একমেব অদ্বিতীয়া মা। স্বামিজীর এই অনন্য মাতৃদৃষ্টি যেমন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তেমনই অবক্র ঋজু। দ্ব্যর্থহীন আর্জব এমন অভিব্যক্তি বিবেকানন্দের বাণীতে প্রায়শই ফুটে উঠতো। শ্রীশ্রীমা তখন ঘুষুড়ির এক ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করছেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে উত্তরাখণ্ডে প্রব্রজ্যায় যাত্রার প্রাক্‌কালে, স্বামিজী মাকে প্রণাম করে, তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন: “মা, যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি; তবেই আবার আসব, নতুবা এই-ই।” মায়ের আশিস্ শিরে ধারণ করে যখন মঠে ফিরে আসছিলেন, মা তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি তাঁর গর্ভধারিণীকে দেখে যাবেন কিনা। “বাবা, তোমার মাকে দেখে যাবে না?” স্বামিজীর মুখে তৎক্ষণাৎ উত্তর শুনেছিলেন মা: “মা! আপনিই আমার একমাত্র মা।”

‘একমাত্র মা’!—অতিশয় তাৎপর্যদ্যোতক উক্তি।

‘মা জগতে ঐ একটিই, দ্বিতীয় নাই।’

‘একমাত্র মা।’

‘একা তুমি অদ্বিতীয়া আপন মায়ায়।’—পুঁথিকার মহাকবি অক্ষয় সেনও মাতৃবন্দনায়, বলেছেন এ-কথা।

আচার্যসত্তম বিবেকানন্দ জেনেছিলেন মাকে—শ্রীশ্রীসারদা দেবীকে—এক দ্বিতীয়বিহীন মাকে—একমাত্র মাকে। যে-মা পার্থিব মাকেও ছাপিয়ে বিরাজিতা ছিলেন তাঁর হৃদয়মন্দিরে। আমরা সাধারণভাবে গর্ভধারিণী জননীকেই জেনে থাকি আপন মা বলে,—শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যেও তাই এমন ‘আপন-মা’-কে দেখতে পেয়েই তাঁর প্রতি ভক্তিতে আবিষ্ট হই। কিন্তু স্বামিজীর দৃষ্টিতে প্রকট ছিলেন তিনি স্বস্বরূপে,—শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে তিনি বিশ্বমাতৃত্বকেই অপরোক্ষ করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, তাঁর গর্ভধারিণী আপন মা-ও ঐ সমষ্টিমাতৃত্বেরই অংশস্বরূপা,—তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন শ্রীশ্রীমা-ই জগতে একমাত্র মা—যার দ্বিতীয় নাই।৮ সমুদ্রেরই তরঙ্গ, সমুদ্র কিছু তরঙ্গের নয়। সমুদ্র কদাপি তরঙ্গ নয়, পরন্তু তরঙ্গই সমুদ্র। সমুদ্র এক,—তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন বহু।

মঠে শ্রীশ্রীমায়ের প্রকাশ—যুগপৎ জগন্মাতারূপে, দেবীভাবে এবং এক অদ্বিতীয়া সবার মা রূপে। 'স্বাগতম্ জননী!'—এই আবাহন-আরাব তাই জগজ্জননীকে এবং আমাদের সকলেরই স্ব-স্ব-মাতৃপ্রতিমাকে উদ্দেশ করেই নিনাদিত সেখানে। পূজা-আরাত্রিক-পুষ্পাঞ্জলিও সেই জগদম্বারই আরাধনা-কল্পে,—আবার 'জয় মা' 'জয় মা' হুঙ্কারসহ উদ্দাম নৃত্যও পরম স্নেহময়ী মায়ের সাযুজ্য প্রাপ্তিতে—সমষ্টিহৃদয়ের তড়িৎশক্তিসম হর্ষবোধে। বেলুড় মঠের চালচিত্র সমন্বিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিমাখানি এই কারণেই আমাদের পক্ষে সমধিক চেতনাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক।

মায়ের এই সর্বাত্মিকা সর্বাবগাহিনী মাধুর্যময়ী অদ্বিতীয়া মূর্তিকে ঋষি-যতি-তাপসরাই মাত্র উপলব্ধিতে দর্শন করতে পারেন। আমরা পারি মাত্র তাঁরই অনুকম্পায়, তাঁকে আমাদের নিজের নিজের মা বলেই ভাবতে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' মহাগ্রন্থের পাঠক-পাঠিকারা অবগত আছেন, শ্রীমৎ তোতাপুরী স্বামিপাদ অসুস্থ দেহের পীড়নকে সহ্য করতে না পেরে, যখন এক গভীর নিশিথে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করতে গিয়েছিলেন, তাঁর তখনকার অপরোক্ষানুভবের কথা। তোতাপুরীজি তনুত্যাগ মানসে গঙ্গায় অবতরণ করেও, ডুবজলটুকুও পেয়েছিলেন না,—অথচ গঙ্গার প্রায় পরপার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন যেন কোন্ অদৃশ্য যন্ত্রচালিতের মতো। পূজ্যপাদ লীলাভাষ্যকার সারদানন্দজীর ভাষায়:

'ক্রমে যখন রাত্রির ঘনান্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মতো নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক্ হইয়া ভাবিলেন 'একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! এ কি অপূর্ব লীলা!' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা, শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতোক্ষণ, ততোক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা!" (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বার্ধ, পৃষ্ঠা ২৮৯)

তোতাপুরী যে চরাচরব্যাপিনী অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মায়ের অপরোক্ষানুভূতিতে বিভোর হয়েছিলেন,—সেই মা হচ্ছেন অক্রিয়, নিস্পন্দ ব্রহ্মেরই ক্রিয়ামূর্তি—

বিশ্বপালয়িত্রী মহাশক্তি। সেই তিনিই দাক্ষিণ্যভরে মানুষের অতি নিকটে উত্তরোত্তর সহজতর সরলতর হয়ে এসেছেন—অবশেষে একেবারে আমাদের দুই চক্ষের সম্মুখে, রক্ত-মাংসের অবয়ব নিয়ে মর্ত্যাবতারে শ্রীসারদারূপিণী হয়ে প্রকট। স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এই প্রকট মানবী দেহধারিণীকেই এক অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী রূপেই চাক্ষুষ করতেন নিরন্তর। "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—অর্থাৎ মা-ই সর্বভূতের আত্মা। সর্বভূতাত্মা এই মা—শ্রীশ্রীসারদাবিগ্রহবতী মা—আমাদের এই ধরাতলের মা—আপনার মা। তাঁকে আমরা এই চর্মচক্ষেই দেখতে পারি, যাঁর কাছে নিঃসঙ্কোচে যেতে পারি, বসতে পারি, প্রাণের কথা বলে জুড়াতে পারি। মা আমাদের আকাশচারিণী মাত্র নন্—তিনি ধরিত্রীবাসিনী মাটির মা-ও বটে।

* * *

যে-অনুভূতি তোতাপুরী স্বামী কিংবা বিবেকানন্দ স্বামী প্রমুখরা লাভ করেছিলেন,—সেই সর্বময়ী মাতৃভাবের অতি সামান্য এক বিন্দুও যদি মাদৃশ ব্যক্তির জীবনে এক নিমেষের জন্যও ফুটে ওঠে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায়, তা'হলেই মনুষ্যজন্ম ধন্য হয়ে যাবে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই অহেতুক কৃপাবারিকে ধারণের উপযুক্ত পাত্রতা কি জীবনে অর্জিত হয়েছে আদৌ? সংসার-হাটে বহুবিচিত্র কোলাহল আর বিতণ্ডা নিয়েই দিন কাটিয়ে দিলাম.—এখন এ-হাটের কেনা-বেচাও ফুরিয়ে আসছে, অশান্ত ক্ষুভিত শ্রান্ত দেহ-মন ঘরের দিকেই চলতে চাচ্ছে,—যে-ঘরে আমার জন্য উন্নিদ্র প্রতীক্ষায় রয়েছেন মা। কিন্তু বাতাসে ভাসমান একটি শুষ্ক পত্রের মতো মদীয় অশান্ত সত্তাটি কি শ্রীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলিত হতে পারবে? জগদম্বার দীপ্তকীর্তি সন্তান, দীন-শরণ, পরম দয়াল, নর-ইন্দ্র বিবেকানন্দের উপদেশ বুকের মধ্যে আলোড়ন জাগায়.—শুনতে পাই তাঁর অভয় কণ্ঠস্বর:

"মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমাদের শান্তি দিতে পারে। তাঁহার জন্যই তাঁহাকে ভালবাসো—ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার আশায় নয়। তাঁহাকে ভালবাসো, কারণ তুমি সন্তান। ভালোয় মন্দে সর্বত্র তাঁহাকে সমভাবে দেখ। যখন আমরা তাঁহাকে এইরূপ অনুভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে সমত্ব ও চিরশান্তি—ইহাই মায়ের স্বরূপ। যতোদিন এই অনুভূতি না হয়, ততোদিন দুঃখ আমাদের অনুসরণ করিবে। মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমরা নিরাপদে থাকি।" (—'স্বামিজীর বাণী ও রচনা', চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৫)

'শরণাগতি' ও 'ভালবাসা'—এই দুই সাধন-বীজ দিয়েছেন জগৎগুরু আচার্য বিবেকানন্দ। যে-বীজদ্বয় নিয়মিত সাধনক্রমে অঙ্কুরিত, পল্লবিত, শাখায়িত হতে হতে পরিণামে আমাদের মাতৃ-ক্রোড়ের বিশ্রাম সুখ প্রদান করবে সুনিশ্চিত, —আমাদের সংসার-জীবনকে করে তুলবে সর্বআপন্মুক্ত একটি পূজারতি। মায়ের মন্দিরে প্রবেশের দ্বারকে অর্গলমুক্ত ও অপাবৃত করার জন্য এই মাত্র দুই চাবিকে ব্যবহার করতে হবে। 'অর্গলাস্তব' সদৃশ স্বামিজীর এই বাণী তাই আমাদের নিত্য অনুশীলনীয়। মাতৃমন্দির-দ্বারকে অর্গলমুক্তই করবে না শুধু এই বাণী-মন্ত্র—চিত্তবিক্ষেপকর বহির্বিষয়রাশি আমাদের অন্তরের সাধনকুটিরে যাতে যথেচ্ছ প্রবেশ করতে না পারে, সে-জন্য কুটির-দুয়ারকে অর্গলাবদ্ধ করে রাখতেও সুনিশ্চিত সহায়তা করবে। 'অকুণ্ঠ শরণাগতি' এবং 'ভালবাসা' এই দুইটি চাবি যুগপৎ অর্গল-নিমীলিকা এবং অর্গল-নিরোধিকা একনিষ্ঠ মাতৃচিন্তকের পক্ষে। উদ্দেশ্য মায়ের কোলে বিশ্রাম—সমত্ব ও চিরশান্তিলাভ।

মাতৃ-স্বরূপ অলোকসাধারণ ও অতিমর্ত্য—তাঁর চরিতানুধ্যান-প্রয়াসও তাই আমাদের পক্ষে এক অসম্ভাবনীয় সাধন। অচিন্তনীয়াকেও এই চিন্তার উদ্যোগ কেবলমাত্র এইটুকু ধারণায় আনার জন্যই যে, মাকে কোনও কালেই আমাদের চিত্তের বিষয় করা চলে না। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তহীন চরিতবৃত্তকে আমাদের আলোচনার সুবিধার্থ, খণ্ড খণ্ড বা বিভক্ত আকারে পর্যালোচনা করতে বাধ্য হই আমরা। কিন্তু এই সত্যকে ভুললে চলবে না যে, আমরা তাঁকে বিভিন্ন বা বিবিধভাবে দেখার চেষ্টা করলেও, তাঁর ভাবপরিচায়ক নানা দিকগুলি হচ্ছে তাঁর নাম-রূপ বা শরীর-সত্তাকে অবলম্বনে প্রকাশিত অবিভাজ্য অপরিচ্ছিন্ন একই অখণ্ড মহাশক্তির বিচিত্র দ্যোতনা। সেই মহাশক্তি কোনও মতেই বিশ্লেষ্য নয়, কারণ আমাদের খণ্ড দৃষ্টি ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধি কদাপি অসীমকে ধরতে সক্ষম হতে পারে না। আমাদের বোধের এই অক্ষমতা বা ধারণাশক্তির অনুপযোগিতার জন্যই অনন্তরূপা শ্রীশ্রীসারদাকে আমরা দেবী—পরমা প্রকৃতি, শান্তিস্বরূপিণী—পরমার্তিহন্ত্রী, মোক্ষদাত্রী গুরু এবং অখিলের জননী—সবার মা ইত্যাদি চতুর্ধা মূর্তিতে অনুধ্যানের চেষ্টা করেছি মাত্র। কিন্তু একটু অচঞ্চল মনে যদি ভেবে দেখি, তাহলে বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, এই দেবী-মানবীর অতিলৌকিক জীবনে দেবী, কল্যাণী, গুরু ও মাতা এই চতুর্বিধ রূপই অঙ্গাঙ্গিভাবে অন্বিত—আদ্যন্ত সংলিপ্ত। তাঁকে যখনই আমরা মা-রূপে দেখেছি, তখনই আমাদের নয়নপথে তাঁর অনুপম জ্ঞানদা গুরুমূর্তিখানিও সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

আবার তাঁর শান্তিদায়িনী কল্যাণীরূপও সতত অনুভবগম্যা হয়েছে আমাদের হৃদয়ে। মোক্ষবিধাত্রী গুরু হয়ে যখন তিনি সমাসীনা হয়েছেন আমাদের শিরসি সহস্রারে,—তখনই মায়ের উষ্ণ স্নেহ-বক্ষও আমাদের শরীর-মনকে সাধনায় অনুপ্রাণনা সঞ্চার করেছে। আবার যখনই তাঁকে শান্তিদায়িনী স্নেহবিধুরা মা কিংবা গুরু বলে খুব কাছে—একেবারে হৃদয়ের মাঝে, উপলব্ধি করে, নিবিড় করে পেতে গিয়েছি,—তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়েছি এই দেখে যে, তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচরা, 'স্বে মহিম্নি'—দেবী মহাশক্তি মহামায়া। বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা ৪-৫) এ কথা একবার বলা হয়েছে, অন্যত্র অন্য প্রসঙ্গেও উল্লেখ করা হয়েছে, তথাপি পুনরুক্তি না করে পারা গেল না আমাদের এই মনন-পূজার উপসংহৃতির কালে। অবধারণার জন্য সত্যের আবৃত্তি 'অসকৃৎ' বা বার-বার ভূয়োভূয়ঃ করতেই ঋষিগণের নির্দেশ।

বাস্তবিকপক্ষে দিশাহারা আমরা। শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপচিত্র অকথনীয় অলেখনীয়, অবর্ণনীয় ও অভাষ্য। মাতৃস্বরূপের পরস্পর-অপেক্ষ যে চারটি দিক আপাততঃ দুই ভাগে সমাপ্ত বর্তমান গ্রন্থে অনুচিন্তিত হল, তাদের কোন্‌টির কোথায় সূচনা, কোথায় বা ইতি, তা' নির্ণয় করা অসাধ্য আমাদের পক্ষে। আসলে আমাদের এই অনুধ্যান-প্রয়াস একটি সুগভীর যোগাভ্যাসের অঙ্গ,—অধ্যাত্মসাধনার একটি ক্রম মাত্র। জানি না এর সঠিক মর্মরহস্য,—শুধুই জানি অন্তহীন সাধনরাজ্যে এ-ও একভাবে মাকেই ডাকা—তা' অস্ফুটেই হোক, বা অনুচ্চারেই হোক। মায়ের স্নেহঘন সত্তা সন্তানের কাছে অনির্বচনীয় একটি বোধমাত্র। কোনও ভাবে তা' রসনায় উচ্চার্য নয়। শ্রীশ্রীমায়ের এই চরিতচর্চা—তাঁর স্বরূপের অনুধ্যান-প্রয়াস যতো দুরূহ সাধনই হোক না কেন—আমাদের কাছে ভরসা ও সহায়ও হচ্ছেন স্বয়ং মা-ই—অদোষদর্শিনী, সর্বকল্যাণ-বিধায়িনী ক্ষমারূপা জননী শ্রীশ্রীসারদা।

* * *

শ্রীশ্রীমা নরদেহ ছেড়ে জ্যোতির্ময় নিত্যতনু পরিগ্রহ করেন, ২১ জুলাই, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে, রাত্রি দেড়টায়। মা এখন নিত্যলীলাময়ী,—স্বস্বরূপে বিলীনা। মাত্র দিন কয়েক বাদেই পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ—মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক পুণ্যকৃৎ ভক্তকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রখানিকে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

এই পত্র-প্রসূনই আমাদের বর্তমান অম্বুধ্যান-ডালিতে সাজানো এখনকার মতো শেষ পূজার্ঘ, যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শ্রীপদে নিবেদিত হবে। মহাপুরুষজীর রচিত সেই অর্ঘটি এই :

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড়, হাওড়া
৫।৮।২০

শ্রীমান—,

·· যে পত্র লিখিয়াছ, তাহা শুনিলাম। অবশ্য শ্রীশ্রীমার স্থূলদেহ আমাদের চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে বটে সত্য এবং তজ্জন্য ভক্তদের দুঃখ হইয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু ভক্তদের ইহা পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক যে, তিনি সাধারণ মানবী নন বা সাধিকা নন বা সিদ্ধা নন। তিনি নিত্যসিদ্ধা—জগজ্জননীর এক বিশেষ রূপ, যেমন দশমহাবিদ্যা। তিনিই এবার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সহায়িকা শ্রীমতী সারদামণি দেবী হইয়া জীব উদ্ধারের জন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। যে ভক্তরা তাঁর কৃপা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মানবজন্ম সার্থক হইয়াছে। তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন। তাঁহারা যখনই মা বলিয়া তাঁহাকে কাতরে দেখিতে চাহিবেন, তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন নিশ্চয়ই। তুমি কখনও হতাশ হইও না। গর্ভধারিণী মা দেহত্যাগ করিলে সন্তানেরা আর দেখিতে পান না সত্য, সহস্র ক্রন্দন করিলেও দেখিতে পান না। কিন্তু এ মা জগজ্জননী, জীবের ত্রাণের জন্য অবতীর্ণা হইয়াছেন। ভক্তেরা কাতরে ক্রন্দন করিলেই তিনি দেখা দিবেন। তোমরা যে মহাভাগ্যবান। সাক্ষাৎ তাঁহার কৃপা পাইয়াছ। তুমি যখনই তাঁহার বিচ্ছেদে কাঁদিবে, তখনই তিনি তোমাকে সান্ত্বনা করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিও। তুমি পত্রে যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ, সেইরূপ দুঃখ যখনই তাঁহার কাছে জানাইবে, তখনই তিনি তোমাকে শান্তি দিবেন। ইহা মানবীয় ব্যাপার নহে। ইহা দৈবী, ঐশ্বরিক ব্যাপার। সুতরাং তুমি কখনও হতাশ হইবে না, দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। গলা কাটিয়া ফেলিলেও, জগৎ ধ্বংস হইয়া গেলেও তোমার এ-বিশ্বাস অচল রাখিতে হইবে—আমি জগজ্জননীর ছেলে, তিনি আমাকে দয়া করিয়াছেন, আর আমার কিসের ভয়—কিসের ভাবনা? আমি মুক্ত হইয়া গিয়াছি,—এই বিশ্বাস তোমার মনে সদা সর্বদা জাগিবে। এ সকল

কথা তোমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিতেছি না। এ-সকল প্রকৃত সত্য কথা— আমাদের প্রাণের কথা।

অধিক আর কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। মা তোমাকে শান্তিতে রাখুন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

এষঃ অভিধ্যান-পুষ্পাঞ্জলিঃ
শ্রীশ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি॥

'প্রকৃতিং পরমাং' গ্রন্থের
চতুর্থ খণ্ড
'মাতঃ প্রযত্নপরমাসি সদৈব বিশ্বে'
সম্পূর্ণ॥

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীসারদা-স্তোত্রম্

সারদাং সস্মিতাং শান্তাং শুভ্রবস্ত্রাবগুণ্ঠিতাম্ ।
স্বনাথ-বামপার্শ্বস্থাং সদয়াং জগদ্বন্দিতাম্ ॥ ১

রামকৃষ্ণপ্রিয়াং দেবীং রামকৃষ্ণেন পূজিতাম্ ।
রামরামাং রমাং বাধাং যাচে ত্রাণং ভবার্ণবাৎ ॥ ২

বীর নরেন্দ্র-হর্ষদাং শ্যামাং সর্বদুষ্টভয়ঙ্করীং ।
কামাক্ষীং ত্রিপুরাসুন্দরীং শ্রীবিদ্যাং ওঙ্কারবীজাক্ষরীং ॥ ৩

দানপ্রিয়াং রতাং দানে অজ্ঞানজাড্যহারিণীম্ ।
বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরীং উমাং দাক্ষায়ণীং নমাম্যহম্ ॥ ৪

শ্রীশ্রীমায়ের আশিস্-পত্র

॥ এক ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিকার ভক্ত-কবি অক্ষয় কুমার সেনকে লিখিত এই পত্রে পুঁথির রচনা ও প্রকাশে শ্রীশ্রীমা তাঁকে আশীর্বাদ ও অনুমতি প্রদান করেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই কৃপালিপি কবির প্রাণে উক্ত মহাকাব্যের গ্রন্থনায় ও মুদ্রণে প্রেরণার উৎসস্বরূপ ছিল। পুঁথির উপসংহারে কবি নিজেই উক্তি করেছেন:

"লীলা-গীতি বিরচনে যে শকতি ছাপা।
সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর কৃপা॥"

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' রচনায় অক্ষয় কুমারের প্রধান উৎসাহদাতা স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে মাতৃচরণে উপনীত করিয়ে পুঁথির কিছু অংশ শ্রীশ্রীমাকে শোনাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। স্বামিজীর করুণাতেই পুঁথিকে সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রচনায় এবং শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ লাভে সক্ষম করেছিল অক্ষয় কুমারকে—স্বামিজীর আদরের 'শাঁকচুন্নী'-কে, এ-কথাও পুঁথি পাঠে জানা যায়। —গ্রন্থকার

ওঁ শ্রীশ্রীভগবান

সন ১৩০২।১৩ই ফাল্গুন

পরম শুভাশীর্ব্বাদ বিশেষ—

পরে বাবাজীবন [,। তোমার পত্র পাইলাম ও সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম [।] শ্রীশ্রী৺ভগবানদেবের[১] উৎসবে পরম আহ্লাদিত হইলাম, এখানে শ্রীশ্রীকামার পুষ্করিণীতে[২] শ্রীশ্রীভগবানদেবের উৎসব সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে [।] পুস্তক[৩] ছাপাইবার কথা লিখিয়াছ, বাবা তোমাকে ভগবান যেমন মতি দিবেন তাহাই করিবে। আমারও আজ্ঞা তুমি ছাপাইবে [।] তাহার[৪] প্রতি তোমার যেমন ভক্তি [,] তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইবেক। আমি ভাল আছি [।] তোমার কুশল দানে সুখী করিবে।

জয়রামবাটী

তোমার মাতা

---

১ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের
২ কামারপুকুরে
৩ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি।
৪ তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের)

॥ দুই ॥

পত্রের প্রাপক শ্রীশ্রীমায়ের অতি আদরের 'বাউল ছেলে' ইন্দ্রদয়াল (শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য)—উত্তরজীবনে বহুমানিত স্বামী প্রেমেশানন্দ—যিনি অগণিত জনের অধ্যাত্ম পথের পরম সুহৃদ ও দিশারীরূপে চিরস্মরণীয় হয়েছেন।—গ্রন্থকার

জয় মা

জয়রামবাটী
১৭।৮।১৭

কল্যাণবরেষু [,]

বাবাজীবন [,] তোমার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিবেন [।] আমি আশীর্ব্বাদ করি তাঁহায় অটল ভক্তি হউক [।] আর যাহারা তোমার কাছে যাচ্ছে তাহারা অবশ্যই ঠাকুরের কৃপা পাবে। তিনি শ্রীমুখে বলেছেন যে আন্তরীকভাবে[১] একদিন তাঁহাকে ডাকৃবে তিনি তাহাকে কৃপা করিবেন। যাহারা ভাল না হবে [,] তাহারা তোমার কাছে থাকতে পারবে না [।] তোমার সকল কথা জ্ঞানের কাছে শুনিয়াছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও।

তোমার মাতা

---

১ আন্তরিকভাবে

॥ তিন ॥

১১ই শ্রাবণ
১নং মুখার্জ্জী লেন
বাগবাজার

কল্যাণীয়াষু[1] [,]

মা তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। পথ হারাবে কেন? পথ পাবার জন্যেই ত এখানে আসা। যখন মনে অশান্তি আসে ৺ঠাকুরকে খুব ডাকিবে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

॥ চার ॥

জয়রামবাটী
২৩শে চৈত্র

কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবন [,] তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সংসারে থাকিতে গেলে মধ্যে মধ্যে মনে অশান্তি আসে বটে। তা তোমাদের ভয় কি? তোমরা তাঁর শরণাগত। ৺ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন এই আশীর্ব্বাদ করি। অত্রস্থ কুশল। আমি ভাল আছি।

ইতি আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মাতাঠাকুরানী

॥ পাঁচ ॥

৯ই চৈত্র ১৩২৩

কল্যাণবরেষু [,]

তোমার পত্রখানা পাইয়া সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমার পত্রের দ্বারা আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া আমি বড়ই ভাবিত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে দুর্গাপ্রসাদ সেনের নিকট হইতে ঐ রোগের জন্ত ঔষধ নিয়া খাইতে পার কারণ তাহার ঔষধের দ্বারা শ্রীমতী রাধু ভাল হইয়াছে। সদা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। কিছুদিন ধ্যান ধারণা একটু

১ কল্যাণীয়াসু,

কম করিবে। তবে যপ[১] সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা শুধু কমের পক্ষে ১০৮ বার [,] আর অতিরিক্ত যত করিতে পার ততই ভাল। যদি আমার ধ্যান করিতে তোমার বেশী ইচ্ছা হয় [,] তবে তাহাই করিবে কারণ আমি ও ঠাকুরে কোন পার্থক্য নাই [,] শুধু রূপের পার্থক্য। যিনি ঠাকুর তিনিই এই দেহে আছেন। ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছ। তুমি ত ব্রহ্মচারী হইয়াই আছ—তোমার আবার চিন্তা কি? আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি অটল ব্রহ্মচারী হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অটল ভক্তি বিশ্বাস লাভ কর।

ইতি আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা

পুনশ্চ ঃ—

ছেলেরা সকলে ঠাকুরের মঠ করিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম তাহাদিগকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবে ও তোমরা সকলে লক্ষ্য রাখিবে, তাঁহার অকলঙ্ক নামে কোন দুষ্ট লোক ঢুকিয়া কলঙ্ক না রটায়। ইতি—

॥ ছয় ॥

জয় মা

জয়রামবাটী
৩০শে চৈত্র

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রখানা পাইলাম [।] তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে [।] আর সীতানাথ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছ তাহা শুনিলাম। সীতানাথকে আমার আশীর্ব্বাদ দিবায়,[২] আর বলিবা তাহাকে আমি যাহা দিয়াছি তাহা জপ,[৩] করিলেই সমস্ত হইবে [,] তাহাকে আর কিছুই করিতে হবে না [,] কারণ যেই ৺ঠাকুর সেই আমি। আর রাখাল নামক ছেলেটী আমাকে যাহা লেখিয়াছে তাহাও শুনিলাম [।] তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিয়[৪] এবং তাহাকে বলিবে ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম ভগবানে[র] প্রতি কত ব্যাকুলতা আছে সেইটী দেখিতে হবে [।] সে যদি নিজে মনে করে যে তার মন ভগবান ব্যতিত[৫] আর কিছু চায় না, তবে ত্যাগ করা উচিত [,] নতুবা পরে এ-বৈরাগ্য থাকে না। বিঃ কিঃ আমি ও রাধু ভাল আছি [।] তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

তোমাদের
মা

১ জপ ২ দিবে ৩ জপ ৪ দিও ৫ ব্যতীত

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত-কথা

'কথামৃতং তপ্তজীবনম্'।

সংসারতাপে তপ্ত জনের জীবনপ্রদ কথা তোমার। তোমার কথায় অনির্বচনীয় মাধুরী। 'মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া'। তাঁর কথা মধুর, তাঁর বাক্য চির আকর্ষণীয়। 'বল্গু'-শব্দের অর্থ সুন্দর, মাধুর্যমণ্ডিত, সুশোভন। আবার আর এক অর্থ—চিত্তাকর্ষী (attractive)। এমন মধুর ও আকর্ষী যে-কথা, তা তো অবশ্যই কবিতা,—বাক্যও নিঃসন্দেহে গীত অথবা কাব্য। আমরা প্রথম শুনেছি এই উক্তি শ্রীমদ্‌ভাগবতের গোপীগীতাতে,—যেখানে বিরহ-সন্তাপতাপিত দর্শন-ব্যাকুলা গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে শ্রান্ত হয়ে, অবশেষে অশ্রু-আকুল কণ্ঠে শ্রীভগবানের দর্শন প্রার্থনা করে গাইছিলেন: "তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্ ·" ইত্যাদি। তোমার কথারূপ অমৃত —'কথারূপমমৃতং,' যা সিঞ্চন মাত্রেই জীবনের যন্ত্রণা আরাম হয়, জ্বালা জুড়ায়। তোমার বাক্য জ্ঞানিগণের হৃদয়হরণকারী চিত্তাকর্ষী। তোমার কথার পদবিন্যাস বড়ই মধুময় অমৃতবর্ষী। "মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া···" ইত্যাদি। বিরহ-দহনে মৃতপ্রায় জীবনগুলিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল—তাঁরা নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, যখন তাঁদের কণ্ঠের স্তুতিতে শ্রীভগবান কৃষ্ণ পরিতুষ্ট হয়ে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন রাসমণ্ডলে। ভগবান গোপিনীদের দেহে জীবন-স্রোত এনে দিয়েছিলেন তাঁর মুখের অনুপম কাব্যময় চিত্তহারিণী কথামৃত বর্ষণের দ্বারা। গোপিনীদের শোক-তাপ-জ্বালা নিবারিত হয়েছিল সেই সেই 'মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া'। তাঁর কথা হচ্ছে কবির ভাষা—কবিরাই তা উপলব্ধি করে বিহ্বল হয়ে যান। রসবেত্তা কবিগণের দ্বারা চিরকীর্তিত এই কথামৃত—'কবিভিরীড়িতম্'।

কবি কে? যিনি ক্রান্তদর্শী। কবি হচ্ছেন সর্বদৃক্। আচার্য শঙ্কর 'কবি' পদের অর্থ তাই লিখেছেন—"কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্বদৃক্"। কবি পদটি বাস্তবিকই দ্যোতনাময়। ঈশ শ্রুতি বলেছেন—স্বয়ং পরমেশ্বরই হচ্ছেন কবিসত্তম—বরিষ্ঠ কবি। "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ"। কবি, যিনি সব দেখেন, জানেন ও প্রকাশ করেন। শ্রীভগবানই সর্বদ্রষ্টা, সর্ববিদ্‌, সর্বপ্রকাশক। তিনিই সবার উপরে— 'পরিভূঃ'। জানেন সব—তাই মনীষী। স্বয়ংপ্রকাশ বলেই তিনি 'স্বয়ম্ভূঃ'।

শ্রীভগবানের প্রতিটি কথাই অমৃত—প্রত্যেকটি বাক্যই কবিতা। আর এই কবিতামৃত যাঁরা পান করে বিভোর—তাঁরাও নিঃসন্দেহে কবি—ঋষি—দ্রষ্টা।

ভগবান স্বয়ং আদি কবি—সর্বদর্শী, সর্বানন্দী, সর্বানুভূ। কথামৃত তাই অমর কবি-কথা,—জীবনদায়ী অমৃতধারা।

অভিজাতকুলোদ্ভব উচ্চশিক্ষা-গরিমান্বিত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন সংসারজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছেন—যে-দহন তাঁকে অবধারিত মরণের দিকেই ঠেলে দিচ্ছিল—জীবন যখন তাঁর মৃত্যু-সাগরের প্রতিই ধাবমান,—ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে তাঁরও কানে পশেছিল 'কথারূপমমৃতং'। 'শ্রবণমঙ্গলং' সেই অমৃত কথাই তাঁকে নবজীবনের আলোক-সন্ধান দিয়েছিল। তার অমর সাক্ষ্য—এ-যুগের ভাগবত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। মহেন্দ্রনাথের মরণ জয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ সেই দিনেই সূচিত,—যেদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃত কথা-শ্রবণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মহেন্দ্রনাথ চিরতরে গুপ্তই থেকে গেলেন,—'মাস্টার'-রূপে নবজীবনের পরিচিতিলাভে ধন্য হলেন। নতুন অভ্যুদয় হল—সেই দিনের সেই ক্ষণ থেকে নতুন ব্যক্তিত্ব,—'মাস্টার মশায়' বা স্বল্পাক্ষর অভিধায় শ্রীম-।

কথামৃত-শ্রবণ প্রসঙ্গে শ্রীম-নিজমুখে পরে বলেছেন :

"দুঃখ মনকে majestic height-এ তোলে। দুঃখ না থাকলে ব্রহ্মানন্দের খবর কেউ করতো না, তাই ঈশ্বর দুঃখ সৃষ্টি করেছেন।...দেখুন না আমার নিজের ব্যাপার। কি প্রহেলিকা! বাড়িতে কলহ। একদিন রাত্রি দশটায় গৃহত্যাগ করলুম। মনে সঙ্কল্প, এই দেহ আর রাখব না—Life is not worth living!

"...পরের দিন সিধুর সঙ্গে সারাদিন বাইরে এ-বাগান ও-বাগান বেড়িয়ে কাটাচ্ছি। সিধু জানে না আমার মনের অবস্থা। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে...রাসমণির বাগানে ঢুকে দেখি সুন্দর ফুলবাগান—ফুল তুলছি, শুঁকছি, আর ভাবছি, আহা কি সুন্দর—একটু কবি ছিলাম কি না! তারপরেই ঠাকুরের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনি তাঁর কথা—এক ঘর লোক বসা।...তার পরের কথা 'কথামৃতে' সব রয়েছে। সাতদিন পরে কালীবাড়ীর অঙ্গনে বেড়াচ্ছি ঠাকুরের সঙ্গে—সাহস করে তাঁকে বললাম এ-সংসারে না থাকাই ভাল—অত যন্ত্রণার-ভিতর। অন্তর্যামী ঠাকুর পূর্বেই আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন; তিনি ভরসা দিয়ে বললেন, 'বালাই, কেন যাবে তুমি শরীর ত্যাগ করতে—বললেই হলো! তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। যা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, স্বপ্নের অগোচর তাঁর কৃপায় তা সহজ হয়ে যায়।'

"...তাঁর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। দেখুন, কোথায় শরীরত্যাগের সঙ্কল্প আর কোথায় ভগবানলাভ। তাই দুঃখ যেন তিনি কোলে টেনে নেবেন বলে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের সকল কথাই অমৃত—মরণ-জয়ের বার্তাময়। তাঁর কথার স্বাদেও অমৃত—মাত্র মৃত্যুঞ্জয়-গুণেই নয়। তাঁর মুখের বাণী তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গভীর, কাব্যের দিক থেকেও তেমনি অনুপম। তত্ত্ব এনে দেয় অমৃতত্ব,—কাব্যের রসাস্বাদন জীবনকে করে তোলে আনন্দময়। শ্রীরামকৃষ্ণ বিহিত অর্থেই কবি। কবি হচ্ছেন ক্রান্তদর্শী—বেদবিৎ, কোবিদ, বিপশ্চিৎ। তিনি শেষ সীমানা অবধি—না, সীমানাকে ছাড়িয়েও দেখেন;—অতিক্রম করেও চলে যায় তাঁর দর্শন। মনস্বী পল ডয়সন্ (Paul Deussen) বলেছেন, পরমেশ্বর কবি এই জন্য যে, তাঁর অগ্রিম দৃষ্টি সর্বত্র—"Viewing in advance"। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীভগবানের এই কবিকৃতিকে—ক্রান্তদর্শিত্বকে কবিতার মতো করে বুঝিয়েছেন: "কবি শুধু দেখেন ও জানেন তাহা নয়, তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি অর্থাৎ তাঁহার আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করিতেছে তাহা তাঁহার জগৎ মহাকাব্য দেখিলেই বুঝা যায়।"

'কবি' তো মাত্র দেখেন না,—দেখার পরে আবার মননের রঙে তাকে বর্ণাঢ্য করেও তোলেন। তাই তো তিনি 'মনীষী'-ও বটে। তিনি কিন্তু সবার উর্ধ্বে—জগৎ প্রকৃতিতে সর্বত্রই তাঁর প্রভুত্ব। 'পরিভূঃ' তিনি। তিনি তাঁর নিজ দেখাকে কতোভাবেই না প্রকাশ করেন—স্ব-রচিত কবিতার বা কাব্যের প্রকাশকও তিনি স্বয়ং,—'স্বয়ম্-ভূঃ' তো এই জন্যই। "কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ"- আদিকবি পরমেশ্বরের পরিচিতি এই-ই।

কবির দৃষ্টি যেমন অনন্ত দিকে, অনন্ত পথে,—তাঁর মনন-শিল্পও বহুধা বিচিত্র—প্রকাশও তেমনই বিচিত্র বর্ণনাত্মক। আবার তাঁর স্ব-খ্যাতিও অশেষবিধ। তাঁর একটি খ্যাতি—তিনি হচ্ছেন সবিতা,—কেন না কবির মনেই সকল কিছুর জন্ম, সেখান থেকেই সমস্তের যাত্রা, সবের ভূমিকা। কবি তাই এক অর্থে জনয়িতা, রচয়িতা,—শিল্পের যেমন শিল্পী, গ্রন্থের যেমন গ্রন্থকার, সুরের যেমন গায়ক।

কবিতার জন্ম হৃদয়ে। কবিতার প্রকাশ সব সময়ে ভাষা দিয়েই হতে হবে, এমন কথা সত্য নয়। আবার ভাষায় যদি বা কবিতার দ্যোতনা থাকে,—সে-ভাষা সর্বদাই যে পদ্য হবে, তারও কোনও বাধ্য-বাধকতা নেই। ভাবে, ইশারায়, এমন কি রেখায়ও কবিতার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব। এখানে উল্লেখ্য শিল্পী-কবি রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তি: "My pictures are versification in lines"—আমার ছবিগুলো হচ্ছে রেখা-কাব্য। কবিতার যতোক্ষণ না বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, ততোক্ষণ তা' হৃদয়-মাঝেই রুদ্ধ,—ঘনীভূত ভাবরূপেই আবদ্ধ থাকে। উদ্দীপক কিছুর প্রেরণাতে,

কিংবা কোনও আবেগময় পরিস্থিতির সঞ্চারণায় সেই অবরুদ্ধ ভাবে স্পন্দন জাগে, স্ফুরিত হয় মূর্ছনা কবির হৃদয়তন্ত্রীতে। তখনই জন্ম হয় কবিতার। অনেক সময়ে কবি স্বয়ং থাকেন অসচেতন, তাঁর এই হৃদয়াবেগ-নিঃসৃত কবিতা সম্পর্কে। তিনি নিজেই তখন আশ্চর্য হয়ে যান। মনে পড়ে, আদি কবি বাল্মীকির বিস্ময়-বিমূঢ় কণ্ঠ থেকে ঝড়ে পড়েছিল সেই প্রথম কবিতা-সৃষ্টির ঠিক পরক্ষণেই "কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া"। অহো কী কথা ধ্বনিত হল আমার মুখে। প্রকৃত কবিতার মর্মমূলে থাকে একটা স্বাভাবিক প্রেরণা—স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। যথার্থ অর্থেই তিনি কবি মনীষী পরিভূ স্বয়ম্ভূ। জগৎ-বৈচিত্র্যকে তিনি কবি-দৃষ্টিতে দেখেছেন,—দেখেছেন সর্বত্র এক বিচিত্র বিন্যাসকে এক সুকৌশল গঠনসজ্জাকে। পর্বত-প্রান্তর, গাছ-ছায়া, ফুল-ফল,—পাখী-পতঙ্গ, বালুকণা জলরাশি, রঙ-বেরঙ, সুর-বেসুর—মনুষ্য-পশু, সাধু-তস্কর—সবেতেই এক অনবদ্য ছন্দ, একটি সুসমঞ্জস শৃঙ্খলা, একটা পরিপাটি অলঙ্কৃতি। এক কথায় তিনি দেখেছেন সর্বত্র সর্বব্যাপারে সেই সত্য-শিব-সুন্দরকে—সেই এককে। কেবল নিজে দেখেননি—দেখিয়েছেনও,—প্রকাশ করেছেন,—মুখের কথায় ব্যক্ত করেছেন। সকলের চেয়ে সহজ করে, সরল করে, সুন্দর করে—সুখকর করে দেখিয়েছেন ও বলেছেন। অমৃতোপম কথায়—রসাত্মক বাক্যে—সুষমা-স্নিগ্ধ বিন্যাসে তিনি ব্যক্ত করেছেন সব কিছুকে। অতুলনীয় এক শান্তিকর অর্থের দ্যোতনাময় তাঁর মুখের প্রতিটি পদোচ্চারণ।

উপনিষদের শুভ্রশির কবিরা আমাদের জানিয়েছেন—সর্বব্যাপী ব্রহ্ম হচ্ছেন "রসো বৈ সঃ।" সেই তিনি—পরমেশ্বর হচ্ছেন সর্বসঞ্চারী রস—সর্বব্যাপী আনন্দ। দশ দিকেই তাঁর পরিকীর্ণ প্রসন্ন নয়ন।

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সুখবার্তাই অহোরাত্রি প্রকাশ করেছেন তাঁর সকল কথায়—তাঁর বাক্যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে অনন্ত জীবনের,—অমর স্বারাজ্য-সিদ্ধির। শ্রীম- বা মাস্টার মশায় বিমোহিত হয়েছিলেন তাই তাঁর কথা শ্রবণ করে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের পাত্রভরে আমাদেরও জন্য তা রেখে গেছেন তিনি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত কখনও পুরাতন হবে না—অথবা, বলতে হয়, পুরাতন হয়েও চির নতুন—পুরা অপি নবীনঃ'। ক্লান্তিহরা এই কথামৃতে কখনও কোন জীর্ণতার বা জড়তার লেশমাত্র নেই—মৃতসঞ্জীবনী সাহিত্য। এক অদৃষ্টপূর্ব কবি-কৃতি,—যেন আদিকবির রচিত এক মহতী কাব্য, যাতে অনুক্ষণ অনুরণন প্রতি পদে অনন্ত জীবনের—এই মুহূর্তের—এই শুভ ক্ষণের। প্রখ্যাত সাহিত্যশিল্পী

ক্রীস্টোফার ঈশারউড্ (Christopher Isherwood) যেমন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ (Gospel of Sri Ramakrishna) পাঠ করে একটি অনবদ্য দুই শব্দের মন্তব্য করেছিলেন—"Eternal Now"—অন্তহীন অধুনা—চির বর্তমান।

"রসঃ বৈ সঃ"। তিনি যখন নরদেহধারী হয়ে এই মাটির ধরায় এসে অবতীর্ণ হন, তখন কি তিনি স্ব-স্বভাবের রসময়তাকে বা আনন্দকে পশ্চাতে কোথাও ছেড়ে আসেন? তা' অবশ্যই নয়। তাই তাঁর প্রতিটি কথায়, হাসিতে, চাহনিতে—তাঁর চলনে, বিচরণে, কর্মে, আচরণে, সব কিছুতেই সেই রস বা আনন্দের বিচ্ছুরণ হতে দেখা যায়। তিনি যেখানে দাঁড়ান, বসেন, শয়ন করেন—যেথায় তিনি অবস্থান করেন সেখানেও যেন আনন্দ ছড়িয়ে থাকে। তাঁর মুখের কথাতে মধু ঝরে, তাঁর উপদেশে অমৃত বর্ষে। ভক্তির প্রবক্তা শ্রীমৎ বল্লভাচার্য ঠিকই বলেছেন:

"বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতে অখিলং মধুরম্॥"

মানুষরূপী অবতীর্ণ ভগবানের বচন মধুর, চরিত্র মধুর, বসন মধুর, অঙ্গের ভঙ্গিমা মধুর। তাঁর চলন মধুর, ভ্রমণ মধুর। তিনি স্বয়ং যে মাধুর্যের অধিপতি তাঁর সবই মধুময়। মাধুর্য দিয়েই গড়া তনু তাঁর। শুদ্ধ ভাবুক হৃদয়ের ভাব-ভক্তি দিয়েই সেই মাধুর্য-রসকে—অলোকসামান্য কবিত্বকে উপলব্ধি করা সম্ভব। অর্থাৎ, কবিই পারেন সেই মহা কবিত্ব কিরণের আলোকে সমুদ্ভাসিত হতে—সেই আলোকে আপন দৃষ্টিকে উজ্জ্বলতর সম্পাদনে। অন্যথায়, পেচকের কাছে যেমন সূর্যালোক অন্ধতার কারণ হয়, সেই অবস্থাই হয়ে থাকে সাধারণের ক্ষেত্রে।

শ্রীম- ছিলেন কবি মনোভাবের। নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন: "একটু কবি ছিলাম কিনা!" তাই সম্ভবপর হয়েছিল অতো বড় কবিকর্ম—'কথামৃত'-কে সুগ্রথিত করা। 'কথামৃতং তপ্তজীবনং'—মর্মে মর্মে আস্বাদন করতে সমর্থ ছিলেন তিনি।

* * *

প্রকৃত প্রস্তাবে ঋষি মাত্রই কবি। স্বামী বিবেকানন্দও কিছু ব্যতিক্রম নন। অবশ্য তিনি লৌকিক অর্থেও সুপ্রতিষ্ঠিত কবি ছিলেন—তাঁর রচনা ও কথা কবিত্বরসে কতো সুনিবিড় ভাবে আসিক্ত ছিল, তা' আজ আর কোনও অজানা

তথ্য নয়। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে সুসাহিত্যিক ছিলেন—প্রচলিত তাৎপর্যেই কবি ছিলেন। তাঁর কবিতা ও গান সুবিদিত ও সুসমাদৃত বিদগ্ধ সমাজে। একদা 'মাদ্রাজ টাইমস্' (Madras Times) নামে প্রখ্যাত বিদেশী পত্রে 'The Swami as a Poet'—এই শিরোনামে দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (১৯ অক্টোবর, ১৮৯৫)—তাতে স্বামিজীর 'Song of the Sannyasin' (যার বাংলায় রূপান্তরিত নাম 'সন্ন্যাসীর গীতি') পড়ে সুপণ্ডিত সম্পাদক সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঐ বিপুলায়তন প্রবন্ধে সসম্ভ্রমে স্বীকার না করে পারেননি যে, বিবেকানন্দের কবিতার মধ্যে অনুরণিত শোনা যায় প্রাণের ঝঙ্কার। বিবেকানন্দের কবিতায় সমাবেশ ঘটেছে মহনীয় গাম্ভীর্যের—প্রতি পংক্তির মধ্যে দ্যোতনা রয়েছে ভাবৈশ্বর্যের।

কিন্তু স্বামিজীর রচিত কবিতাবলী ছাড়াও তিনি কবি—তাঁর গদ্যে—প্রকাশিত ভাষণে, রচনায় ও কথায়। স্বামিজীর গ্রন্থাবলী পাঠকের জানা আছে, তিনি কতোবার স্ব-মুখেই বলেছেন: 'জানো না, সর্বোপরি আমি কবি'। যে-হেতু তিনিও ছিলেন ক্রান্তদর্শী, মনীষী, পরিভূ ও স্বয়ম্ভূ,—শ্রীরামকৃষ্ণেরই অপর বিগ্রহরূপ, তাই সকল অর্থেই তিনিও যে কবি, তাতে আর কোন কথার অবকাশ নেই। বিবেকানন্দের কথাও নিষিক্ত মধুতে—পরিপ্লুত অমৃতে। স্বামিজী চিরসত্যের সঙ্গে একাত্ম,—অথবা, নিত্য সত্যেরই এক নাম বিবেকানন্দ। তাঁর মুখোচ্চারিত প্রতিটি কথা—সকল বার্তাই অনন্তের সুরকে ধ্বনিত করেছে। তিনি যে অনন্তেই অভিস্নাত এক ভাগবত ব্যক্তিত্ব,—শ্রীরামকৃষ্ণেরই আর এক দেহ। অতএব, স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও 'কথামৃতং তপ্তজীবনং' উদ্‌গীত হবে, তা আর বিচিত্র কি!

কেবল পদ্যে নয়, তিনি গদ্য-কথাতেও বরিষ্ঠ কবি। তিনি গদ্য-ভাষাতেই উপনিষদ্ বিতরণ করেছেন। বিবেকানন্দের গদ্যের ধ্বনি ছিল কবিত্বমণ্ডিত—যাতে মুগ্ধ রোমা রলাঁ (Romain Rolland) মন্তব্য করেছিলেন: "বিবেকানন্দের উচ্চারিত বাক্যে তরঙ্গায়িত আছে মহান সঙ্গীত—ধ্বনিতে বীঠোফেনের বিন্যাস, হ্যাণ্ডেল ঐকতানের মন-মাতানো ছন্দে তাঁর রচনা-ধারা ধাবিত।" বুধাগ্রণী রলাঁ নিছক সাহিত্য সাধকই ছিলেন না,—তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ এবং বীঠোফেনের জীবনীকার।

শ্রীম- যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতকে ধারণ করে রক্ষা করেছেন,—স্বামী বিবেকানন্দের অমৃত-কথাকেও যাঁরা বিধারণের ও সংরক্ষণের জন্য চিহ্নিত হয়েছেন

ইতিহাসে তাঁরাও মানবজাতির নমস্য। স্বভাবতই স্মরণ করতে হবে গুড্‌উইন (J. J. Goodwin), কুমারী ওয়ালডো বা ভগিনী হরিদাসী (Miss Ellen Waldo), শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখদের নাম। স্বামিজীর সমুদ্রোপম বাণী ও রচনার মধ্যেও কিন্তু একখানি নাতিকায় পুস্তকের কথা এখানে একক ভাবে উল্লেখ না করে পারা যায় না,—যেখানি আয়তনে স্বল্প কিন্তু ঘনত্বে গভীর—স্ফটিকীকৃত। অতিশয়োক্তি হবে না যদি বলা হয় ঐ গ্রন্থখানিই একখণ্ডে সমাপ্ত 'বিবেকানন্দ-কথামৃত'। আমরা বলতে চাচ্ছি, 'Inspired Talks' বা বাংলা 'দেববাণী'-ই সেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের উত্তর সংস্করণ—বিবেকানন্দ-শ্রীমুখ-নিঃসৃত।

শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ঋষি যদি শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—মাস্টার মশায়, তাহ'লে দেববাণীব শ্রৌত ঋষি—কুমারী ওয়ালডো—ভগিনী হরিদাসী। বিবেক-অমৃত-কথাকে তিনিই অতি যতনে ধারণ ও লালন করেছিলেন বলেই জগৎ আজ ধন্য সেই 'দেববাণী' লাভ করে। 'দেববাণী' প্রকৃত মর্মার্থেই কথামৃতের উত্তর সংস্কবণ—'কথামৃতং তপ্তজীবনং'-এর ভাষান্তর মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ, বিশিষ্ট বিবেকানন্দ সহচর পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—শ্রীমৎ শশী মহারাজের লেখনীকে এখানে উদ্ধৃত করতেই হবে। 'দেববাণী' তথা তার সঞ্চয়কারিণী সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

"ধন্য হোক সেই শিষ্যার মাতৃহৃদয়, যিনি ত্রাণকারী শব্দগুলিকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন—মহাকালের অতল গহ্বরে অদৃশ্য হতে দেননি। হরিদাসী মাতার (কুমারী ওয়ালডোর) কাছে সমস্ত পৃথিবী ঋণী—তাঁরই জন্য স্বামিজীর এই প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ বাণীগুলির দর্শনলাভ সম্ভব হল। এই গ্রন্থের তুল্য অন্য কোথাও মানব-সমাজের পক্ষে অধিক হিতকর বন্ধু, অধিক পথপ্রদর্শক মিলবে না। এর অমৃত পান করলে মানুষ অনুভব করবে—মৃত্যুর কর্তৃত্ব নেই তার উপরে। যে প্রাণ আলোক চায়, বিশ্রাম ও শান্তি চায়—সে যেন আশ্রয় নেয় এই গ্রন্থের।"

এই 'দেববাণী'-র অমৃত-স্বরূপতা তপ্তজীবনের পক্ষে কতোখানি প্রকট,—তা' উল্লিখিত এই অপর এক ঋষির লেখনীমুখেই সুস্পষ্ট। দেববাণীতে যে অনিন্দ্য কবিত্ব বা সঙ্গীতের দ্যোতনা,—তারও এক অপূর্ব কাব্যময় উল্লেখ পাওয়া যায় রামকৃষ্ণানন্দজী-লিখিত গ্রন্থ-ভূমিকাতে। সেখানে তাঁর ভাষা ঃ

"...এখানে তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) নিজ উপলব্ধির পূর্ণ জ্যোতির মধ্যে অধিষ্ঠিত, সুমধুর সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বরে সর্বদিকে বিকীর্ণ করেছেন মঙ্গলালোক, তারই

মৃদুকোমল স্পর্শে উত্তোলিত ও উন্মীলিত করে দিচ্ছেন একান্ত ভক্তগণের হৃদয়পদ্ম।...

"...শান্তি ও দিব্যানন্দের বাণীকে মৃদু স্থির কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন প্রশান্ত এক ঋষি। সে কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে আলোক ও আশ্বাসের বাণী—সেগুলি অন্ধকারকে ছিন্ন করে পূর্ব দিগন্তে আবির্ভূত, তা' বায়ুকম্পিত আনন্দঘন উজ্জ্বলরাগ অরুণ উষার তুল্য। যদি তাঁর বাণী সেদিন কয়েকটি প্রাণকে আশ্বাস দিয়ে থাকে, তা'হলে অন্য সকল প্রাণকেও আশা ও শান্তি দেবার শক্তি তাতে আছে।"

মনীষীই পারেন মনীষাকে ধারণ ও ব্যক্ত করতে—কবি ক্রান্তদর্শীই সক্ষম কবিত্বকে উপলব্ধি করতে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দই সুযোগ্য শক্তিসম্পন্ন মনীষী কবি,—যিনি পেরেছিলেন বিবেকানন্দের প্রখর কবি-রশ্মিকে আপন হৃদয়ে প্রতিফলিত করতে। বিবেক-অমৃতকথার পদে পদে যে-স্বাদ, তাকে প্রতিবোধে আস্বাদন করতে পারেন শশী মহারাজই।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ হিমাদ্রির দ্রবীভূত দুই রূপ,—দুটি ধারায় প্রবাহিত। একটি ধারার নাম বিবেকানন্দ, অন্য ধারা শ্রীসারদা—'মা' নামে প্রবাহিতা। শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান অসম্ভব প্রয়াস তাঁর কথামৃতকে বাদ দিয়ে। কথামৃতের পদে পদে অমৃতের স্বাদ সুস্নিগ্ধ কাব্যরস। 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' সেখানে ক্রান্তদর্শী শ্রীরামকৃষ্ণই বিপশ্চিত বাণীশিল্পী। স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও এই পরিচিতি সমান সত্য,—তিনিও নিত্যকালের অনন্তদর্শী কবি। শ্রীশ্রীমা সারদারও মুখের কথাতে—তাঁর ধ্যানে, মননে, বাণীতে—এক কথায় তাঁর অনুদিনের জীবনধারাতে সেই একই অমৃতময় কবিতা-স্রোত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত 'অশেষসৌম্যেভ্যঃ তু অতি সুন্দরী'—দেবী সারদার এই অতিলোক ব্যক্তিত্বের দ্বারা অন্বিত, একটা সহজাত প্রকৃতিগত কোমল-মধুর চিত্তাকর্ষী তাঁর মুখোচ্চারিত গল্পকথার নির্ঝর স্বতঃই আপ্লুত করে মানুষকে। শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময়ী সে বাক্-ভঙ্গিমা সাহিত্য-ইতিহাসেও অনন্যা। উদার অর্থে তাই তিনি প্রোজ্জ্বল একখানি সাহিত্য-প্রতিমা। ক্রান্তদর্শিনী কবি শ্রীসারদা।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা—গল্পের কথা—কিন্তু তা কবিতা। তাও তাঁর মুখের ভাষা ছিল গ্রাম্য আদলে—উচ্চারণও পল্লীর ছাঁদে। যখন তিনি জয়রামবাটীতে কি

কামারপুকুরে, অথবা কোয়ালপাড়ায়, তখন স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথাবার্তায় দেশ-প্রচলিত ভাষাই তিনি ব্যবহার করতেন। দেশ-প্রচলিত বলতে মুখ্যতঃ বাঁকুড়া জেলার কথ্যরূপই মায়ের মুখে শোনা যেত। সকলেই জানেন, বাঁকুড়ার সারা জেলাময় সর্বত্র এক ছাঁদের ভাষার ব্যবহার শোনা যায় না। জয়রামবাটী অঞ্চলের কথ্য ভাষার ঢং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—সন্নিহিত জেলা হুগলি ও মেদিনীপুরের ভাষার রেশ জয়রামবাটীতে বেশ সহজেই ধরা যায়। অতএব, শ্রীশ্রীমায়ের মুখের কথাতে জয়রামবাটী অঞ্চলের বিশেষত্বটুকুও অনায়াসেই শ্রুত হত। অবশ্য মা যখন কলকাতায় থাকতেন কিংবা অন্যত্র কোথাও যেতেন, তখন সেখানে তিনি যে-ভাষা সচরাচর ব্যবহার করতেন, তাতে পল্লীর ভাষার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই কলকাতার কথ্যরূপের কিছু সম্মিলন ঘটে যেত,—বলাই বাহুল্য। যা'হোক, শ্রীশ্রীমায়ের মুখের যে-কোনও কথা—তা' যেমন ঢং-এ বা ডৌলেই উচ্চারিত হয়ে থাকুক না কেন, শ্রোতার কানে তা সবই বড় মিষ্টি সুছন্দ বলে বিভাবিত হত। মায়ের সকল বাক্যই ছিল কাব্য,—সমস্ত কথাই যেন কবিতা—প্রত্যেক উচ্চারণেই ঝরে পড়ত উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরস। কিন্তু কেন? এর রহস্য কোথায়? অথচ তথাকথিত অর্থে, মা-সারদা সম্পূর্ণ নিরক্ষরা না হলেও, তথাকথিত শিক্ষা-সংস্পর্শবর্জিত ছিলেন তো বটেই।

কবিতার ধর্ম হচ্ছে উদ্‌ঘাটন-উদ্‌ভাসন। সহজ কথায়, কবিতা একটা স্ফূর্তি বা প্রকাশ—উন্মোচন বা প্রস্ফুটন। নিহিত মর্মকে বা অন্তলীন ভাবকে রসে পাক দিয়ে প্রতীক সহায়ে প্রকাশ করাই কবিতার কর্ম। ছন্দ বা মিল, যতি কিংবা ঝঙ্কার—সবই ভূষণ, কিন্তু প্রাণ নয়। গাছের যেমন বল্কল, পল্লব,—ছন্দ-যতিও যেন ঠিক তেমনই। গাছের ফোটা ফুলটিই হচ্ছে যথার্থ উদ্‌ভাসন বা প্রকাশ,—গাছের প্রাণ-দ্যোতক। ঠিক কবিতাও ভাবের ক্ষেত্রে তাই-ই। অঙ্গের প্রাণ-পরিচায়ক চোখের দীপ্তিতে,—তার চর্মের চাকচিক্যে নয়। চকিতের একটি নয়নপাত কোন্ সুদূরবর্তী অন্তলের অন্ধকারকেও আলোকিত করতে পারে,—কবিতাও পারে অন্তরের কোন্ সুগহন অন্ধকারকে বিমোচন করতে।

কবিতারূপ সমুদ্রে থাকবে ছন্দের তরঙ্গ, অলঙ্কারের সৌন্দর্য। ছন্দ, অলঙ্কার, রস প্রভৃতি ছাড়া কবিতার কল্পনা করা চলে না। কিন্তু এ-সবের দ্বারা বিভূষিত করা গেলেও, ভাষাকে প্রাণময় করা যায় না—তাই সঠিক অর্থে কবিতাও হয় না মাত্র ছন্দ আর অলঙ্কারের সজ্জায়। কবিতায় অবশ্যই থাকবে প্রাণ-প্রেরণা, স্বতঃ-স্ফূর্ত আবেগ। এই প্রাণপ্রবাহ বা আবেগধারা তো চেষ্টাচরিত্র করে আনা যায়

না। সে-বেগ হতে হবে একান্তই আন্তরিক। তাই বলা হয় আ-বেগ। এ-বেগ অতিশয় সহজ—অর্থাৎ সহ-জ।

অতি সহজ সরল স্বল্প কথাতে ভাবকে প্রকাশের বা পরিস্ফুটনের যে স্বভাব-দক্ষতা শ্রীশ্রীমায়ের ছিল—তা' চিরকালের সাহিত্য-জগতে এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ। তাঁর মুখের ভাষাতে ছিল এক অত্যাশ্চর্য উন্মোচন-কুশলতা, যা' জীবনের বহু বিচিত্র কঠিন সমস্যা ও জটিলতার গ্রন্থিগুলিকে অনায়াসে শিথিল করে দিত। তাঁর বাক্‌ভঙ্গিমার সঙ্গে অতি স্বাভাবিকভাবেই সংযুক্ত থাকত একটা সুনিশ্চিত ধ্রুব জ্ঞান,—আধ্যাত্মিক অপরোক্ষ, যা তাঁর মুখে উচ্চারিত কথাগুলিকেই করে তুলেছিল যেন একখানি জীবন্ত বাক্‌প্রতিমা—তাঁর স্বকীয় মাতৃভাবের। তাঁর মুখের প্রতিটি বাণীই ছিল কবিসুলভ সুষমামণ্ডিত,—দুই নয়নে ছিল কবিদৃষ্টির সৌন্দর্য। উদাহরণ স্বরূপ মায়ের একটিমাত্র উক্তিকেই স্মরণ করা যথেষ্ট হবে—যাতে লক্ষ করা যাবে, তাঁর অনুপম বাক্-ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য-পরিজ্ঞান, ভাব প্রস্ফুটনশৈলী—অপূর্ব উপমা-উপস্থাপন কুশলতা।

একটি বিশেষ দিনে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে এসেছেন বেলুড় মঠ থেকে অনেক সাধু-সন্তান। একে একে প্রণাম করে শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে চলে গেলেন সকলেই। সবাই চলে যেতে, মা বললেন :

"দেখ, ঠাকুরের আকর্ষণ,—তাঁর আকর্ষণে সব আসছে। সূর্যোদয়ে চাঁদও ম্লান হয়ে যায়। আবার পূর্ণিমায় কেবল বড় তারাগুলো দেখা যায়। চাঁদের আলোয় তারাও মিট্‌মিট্ করে। কিন্তু যেই চাঁদ একটু সরে দাঁড়ায়, আর লোকে দেখে আকাশ ভরা তারা।"

ক্রমপ্রসারমান এই বিশাল ভাবান্দোলনের মূলে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনিই এর প্রাণকেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণেরই শক্তি আজ সর্বতোমুখী ধারায় প্রবহমান—তাঁরই শক্তিতে আজ সব কিছুর এতো বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা—নানা রূপে ও নামে। শ্রীশ্রীমা এই নিগূঢ় সত্যটিকেই কবিতার ভাষায়, অনিন্দ্য উপমা সহায়ে প্রকাশ করলেন এখানে। কবি-সাম্রাজ্ঞী শ্রীসারদা।

কবিতা তো মাত্র পদ্যই নয়, আগেই বলা হয়েছে,—কবিতার প্রকাশও বিচিত্রভাবে হওয়া সম্ভব;—কাঠামোটি গদ্যও হতে পারে। শ্রীশ্রীমায়ের কবিতার গঠন গদ্য। কিন্তু সে-গদ্য রৌদ্রালোকের মতো দৃপ্ত—অত্যন্ত তীক্ষ্ণ লক্ষ্য—দূরভেদী। ব্যক্তকে ছাড়িয়ে সে-গদ্যের গতি অব্যক্তের পানে। গোচরের সীমাকে ঠেলে সরিয়ে চলে যায় কোন্ অস্তিকে গভীরে। যেন কায়াকে ত্যাগ

করে কায়াতীত কোন্ ছায়াকীর্ণ রহস্যলোকে সেই গন্ধের সহজ গমনাগমন। মৃন্ময় নয়—লক্ষ্য চিন্ময়। বিদিতকে ছাপিয়ে অবিদিতের প্রতিই ধাবমান সে। যেন শুষ্ক একখণ্ড কাষ্ঠ—কিন্তু সে তো অগ্নিমন্থ। শুভ্র ক্ষুদ্র একটি শঙ্খ, তথাপি সে বহনক্ষম সমুদ্রের আহ্বান-ধ্বনিকে। অল্পের মধ্যে অতিশয়ের অধিষ্ঠান। নিরর্থকের মধ্যেও পরমার্থ স্বীকৃত। প্রত্যক্ষের মধ্যেই অপরোক্ষের আমন্ত্রণ,—পরোক্ষকেও রূপান্তর অপরোক্ষানুভূতিতে। নিকটের মধ্যে সুদূরের পরিচয়।

ছোট একটি কঠিন বীজ—তাতেই লুকানো দীর্ঘজট বট। বাক্যটি গদ্য, কিন্তু তারই মধ্যে কবিতার নির্ঝর। আসলে পদে পদে 'আমি'—গদ্যময় 'আমি'। সহসা সেই 'আমি' ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে 'তুমি'-তে—সৃজন হয় কবিতার। 'আমি'-র তার যখন বেজে ওঠে—উৎসারিত হয় সুর—'তুমি'। এই বেজে ওঠারই নাম ছন্দ। আমি আর তুমি সহিত হয়ে রূপ নেয় সাহিত্য। গদ্যও হয়ে ওঠে কবিতা।

সাহিত্য অর্থ সহিত-ত্ব। সহিত হওয়া মানে মিলিত হওয়া—একত্বকে বোধে আনা। জীবজগৎ ও ব্রহ্মকে যা মিলিত করে দেয়—সহিত হতে সহায় হয়, তাই হচ্ছে প্রকৃত সাহিত্য। 'আমি'-কে তুমি-তে মিলিয়ে দেওয়াই প্রকৃত সাহিত্য-কর্ম। সীমান্বিতা ভূমিকে অন্তহীন ভূমার সহিত সন্নিহিত করে দেয় যা, সত্যিকারের সাহিত্য হচ্ছে সেটাই। জীবন-বীণার তারে তারে যতো সুর বেজে ওঠে—কড়িতে আর কোমলে, কিংবা ধৈবতে আর গান্ধারে—সমস্ত সুরকে সমর্পণ করে এক অনাহত-সুরে। সাহিত্যকৃতি তখনই। সাহিত্যে কোন পরিহার নেই—পরিবর্জন নেই। উদার-নিমন্ত্রণ সকলের জন্যই প্রসারিত। পাঙ্‌ক্তেয়-অপাঙ্‌ক্তেয়, সাধু-অসাধু, অভিজাত-অপজাত সকলেরই জন্য সাহিত্যে অবাধ আসন—নিরপেক্ষ ব্যবস্থা। সম্পর্ক সমগ্রের সঙ্গে—আত্মীয়তা অখণ্ডের সাথে। না, আরও আছে,—সহিত-ত্ব সার্থক হয় যখন ইন্দ্রিয়াতীতের সঙ্গে, চিরন্তনের সঙ্গে সম্মিলন ঘটায়,—সহিতত্বের পূর্ণতা তখনই। ইদানীন্তনকে ঊর্ধ্বগামিনী করে চিরন্তনে উন্নীত করাই সত্যকার সাহিত্যের ধর্ম। অসুন্দর ইদানীংকে পরিমার্জন করে সুন্দর সনাতনে উত্তরণ ঘটানোই সাহিত্যের চিরকীর্তি। শুধু ইদানীং তো নিছক সংবাদ,—যখন সনাতন চিরন্তন তখনই হয় সত্য। সংবাদ ও সত্যের সহিতত্বই হচ্ছে প্রকৃত সাহিত্য। আর এই সহিতত্বের বার্তাকে যিনি সহজ সরল করে পরিবেশন করতে পারেন, যথার্থ তাৎপর্যার্থে তিনিই কবি,—স্বনামসার্থক সাহিত্যিক।

শ্রীশ্রীমা সকল অর্থেই কবি,—সহিতত্বের তত্ত্বদর্শিনী।

একজন সাধু-সেবক একটি বটের বীজ হাতে নিয়ে মাকে দেখাচ্ছেন-,—বলছেন, "মা, দেখছ, লাল শাকের বীজের চেয়েও কতো ছোট। এ থেকেই গজাবে অত প্রকাণ্ড গাছ। কী আশ্চর্য!" শ্রীশ্রীমায়ের মুখে তৎক্ষণাৎ উৎসারিত হল একটি ছোট্ট কবিতার মতো উত্তর: "তা হবে না? এই দেখ না, ভগবানের নামের বীজ কত্তোটুকু। তা' থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম এসব কত কি হয়।" একটি সাহিত্যের প্রকাশ! এক অসামান্য সহিতত্বের উদাহরণ। সামান্য থেকে অসামান্যে উত্তরণের ইঙ্গিত। অণু থেকে মহীয়ানে আকর্ষণ করে নিয়ে গেলেন। এই ই তো মহৎ কবিতা।

আরও একখানি অপূর্ব দৃশ্যকাব্য,—মায়ের কথা কুসুমে গাঁথা কবিতার মালা:

কোঠাবে বলরামবাবুদের ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরে একদিন অপরাহ্ণে। মা নিরিবিলিতে একাকী বসে কোন্ ভাবলোকে অধিষ্ঠিতা। পা ছড়িয়ে বসে আছেন, যেমন ছবিতে দেখা যায়—দুই চোখ মেলা কিন্তু দৃষ্টি অন্তর্লোকে,—বাহ্যদৃষ্টি একেবারেই নেই। ধীর পদক্ষেপে সেবক কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু ভাবের বিঘ্ন না ঘটিয়ে নিঃশব্দে অনিমেষ নেত্রে মায়ের স্তিমিত চিত্রার্পিতবৎ মূর্তিখানি দেখছিলেন মাত্র। দশ-পনেরো মিনিট এইভাবে কেটে যাবার পরে, যেন মায়ের বাইরের দিকে হুঁশ এল। সুপ্তোত্থিতার মতো অপ্রতিভ কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন:

"কতক্ষণ এসেছ?"

উত্তর: "বেশিক্ষণ নয়। আপনি কতোক্ষণ এসেছেন মা?"

মা: "বন্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগে না—তাই দুপুর বেলা—ওরা সব শুলে, বেরিয়ে নিরিবিলিতে বসে আছি।"

মা বলেই চলেছেন: "বার বার আসা—এর কি নিস্তার নেই? যেখানে শিব, সেখানেই শক্তি—শিব শক্তি একত্তরে। বার বার সেই শিব সেই শক্তি। নিস্তার নেই। তবু তো লোকে বোঝে না—কত কষ্ট ঠাকুর করছেন তাদের জন্যে। কি সব তপিস্যে—তপিস্যের দরকার কি? তবু তপিস্যে—খালি লোকের জন্যে। লোক কি পারবে? তাদের তেজ কই, শক্তি কই? তাই তো ঠাকুরকে সব করতে হয়।...

"এসেছে কাঙালের ঠাকুর কাঙালের তরে। সত্যিই বাছারা আমার কাঙাল। একবার মা বলে ডাকলে কি থাকা যায়? অমনি ঠাকুরকে আসতে হয়।"

সেবক মাঝখানে কিঞ্চিৎ থামিয়ে প্রশ্ন করেন : "চৈতন্যদেবও কি এই ঠাকুর ?"

মা : "হ্যাঁ হ্যাঁ। এই ঠাকুর বার বার—একই চাঁদ রোজ রোজ। নিস্তার নেই—ধরা পড়ে আছেন। তাঁরই জীব। তিনি দেখবেন না তো কে দেখবে, ও পাড়ার লোকে এসে? বলেছেন—যখনি ডাকবি মোরে, এসে দেখা দিব তোরে।—এইটি মনে রেখে'—কখনো ভুলো না—ডাকলেই পাবে—তিনি যে কল্পতরু।"

সেবকের পুনরায় উক্তি : "আমি জানি আমার মাকে।"

মা : "ঠাকুরই তো 'মা' বুলি শিখিয়েছেন। 'মা' বলা কি ছেল আর? তাঁর ছিষ্টি—তিনি প্রসব করছেন, আবার খেয়ে ফেলছেন। খেয়ে ফেলছেন মানে কি? মুক্ত করে দিচ্ছেন। তাঁর লীলা, তাঁর খেলা।…

"…বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, যাতনা সহিবে ক'দিন?—একি খালি জীবের—এ যে ঠাকুরের। তাই বসে বসে ভাবছিলুম। দেখলুম শেষ নেই। কি কষ্ট ঠাকুরের—কে বুঝবে?"

সেবক : "খালি ঠাকুরের কেন মা, আপনারও তো। ঠাকুর আর আপনি তো এক।"

মা : "ছিঃ, ও-কথা কি বলতে আছে? বোকা ছেলে! আমি তাঁর দাসী। পড়নি? 'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর; যেমনি করাও, তেমনি করি।' সব ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া কিছুই নেই। এক একবার মনে হয় জীবের ধার কি শোধ হবে না? আবার ভাবি—না—এ-ধার তো শোধ হবার নয়—দাঁতে কুটো কেটেও নয়—জীব যে তাঁর!…

"…কত শোকতাপ পেয়ে, কত জ্বালা যন্ত্রণায় জীব ছটফট করে আসছে! ঠাকুর না হলে কে তাদের জ্বালা ঘোচাবে? তিনি যে ব্যথার ব্যথী। তিনি যে নিজে ওদের চেয়েও জ্বালা পাচ্ছেন—তাই তো জীবের জ্বালা বুঝছেন।…

"ঠাকুরই তো সব হয়ে রয়েছেন। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই ঠাকুর—কানাও ঠাকুর, খোঁড়াও ঠাকুর—ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই। তখন বুঝলুম, তাঁরই ছিষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না—তিনিই পাচ্ছেন। তাই তো যে এসে কেঁদে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তাঁরই জিনিসে তাঁকেই করি।…

"এরা সব ঘুমুতে বলে। ঘুম কি আর আছে, না আসে…

"একটা ডেঁও পিপড়ে…দেখলুম, সেটা পিপড়ে তো নয়—ঠাকুর—ঠাকুরের সেই

হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই।...সব জীব যে ঠাকুরের। আমি আর কি করতে পাচ্ছি—ক'জনকে দেখতে পাচ্ছি? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন! সকলকে দেখতে পারতুম, তবে তো হ'ত।"

ঠাকুরবাড়িতে শাঁক-ঘণ্টা বেজে ওঠায়, সম্বিৎ জাগল যে সন্ধ্যারতির সময় হয়েছে। মা বলে উঠলেন: "সন্ধ্যে হয়ে গেল!..." সেবকও প্রণাম করে বিদায় নিলেন। কিন্তু কানে স্পষ্ট শুনলেন, মা যেতে যেতে অস্ফুটে বলছেন: "মা আর ছেলে, মা আর ছেলে।"

একটি দীর্ঘ-সংলাপ—গ্রাম্য গদ্য ভাষায়, কিন্তু প্রতি পদে ছন্দ, যতি,—একটানা একটি কবিতা। শুধু মাত্র খণ্ড খণ্ড কথায় নয়, হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কোনও বিচ্ছিন্ন কবিতা-পংক্তি নয়,—একটি দীর্ঘস্থায়ী আলাপচারী, অথচ 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। সাধারণ কথোপকথনের মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে এক সূক্ষ্ম অব্যক্ত আধ্যাত্মিক বার্তা,—যা, সঞ্চিত হয়েছিল এক শান্ত নিভৃত একান্ত আত্মমগ্ন অবস্থায়। প্রখ্যাত ইংরেজ কবি শেলী (Shelley) তাই কি বলেছেন যে, প্রশান্ত প্রসন্ন মনের এক পরম পবিত্র ও আনন্দিত ক্ষণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে কবিতার! "Poetry is the record of the best and happiest moments of the happiest and best minds."।

* * *

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির মধ্যে সঠিক কাব্য-প্রত্যাশা উচ্চারিত। তিনি তৃষিত কণ্ঠে বলেছেন:

"ধেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা।"

কাব্যতত্ত্বের চাবিকাঠি আছে ভাষার মধ্যে। সে ভাষা স্বতঃই প্রত্যাশিত—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথায় 'ধেয়ানের ভাষা'। এই ভাষার যে একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে, অর্থাৎ ভাষার যতো প্রকার প্রয়োগ-রীতি আমরা সকলেই জানি, কবিতার ভাষা যে সেগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই ভাষার মহিমার উপরেই কাব্য-মহিমা অনেকটাই নির্ভরশীল—সেটা একটি বহু-স্বীকৃত চিরকালিক সত্য। যে-ভাষার গুণে কবিতার সৃষ্টি হয় বা হতে পারে, তার ঐ অনির্বচনীয় বৈলক্ষণ্য বা বৈশিষ্ট্যটি যে কবিতাপাঠের বা শ্রবণের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে থাকে, তার নজিরও

বহুল। কিন্তু সে-বৈশিষ্ট্যকে অনুভব করা বরং সহজ, পক্ষান্তরে তাকে লিখে বা বলে বুঝানো কিংবা কোনওরূপ কথার বুননে তাকে একটা সংজ্ঞার মধ্যে বেঁধে দেওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য প্রয়াস। ভাষা যখন কবিতা হয়ে ওঠে, তখন সেই ভাষার মধ্যেও যেন একটা অনির্দেশ্য অথচ মৌলিক গুণগত পরিবর্তন ঘটে বলে বেশ অনুভব করা যায়। অবশ্য ভাষা বলতে, একমাত্র ব্যাকরণ-নির্ভর পোষাকী ভাষাই যে সব সময়ে কাব্যের বাহন হবে,—এমন কথা ভাবা উচিত নয়। বরং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনস্বী কবিদের অনেকেই এই মতকে নেহাতই অচল বলেছেন। তাঁরা বলেন, যে-ভাষায় প্রতিদিনের সাধারণ অভিজ্ঞতার অভিঘাতে উৎসারিত সুখ দুঃখ, অনুরাগ-অনীহা, অশান্তি-প্রশান্তি ইত্যাদির সহজ সাদামাঠা ও জীবন্ত প্রকাশ হয়ে থাকে কিংবা হতে পারে,—অর্থাৎ, যা সবার প্রাণের ভাষা, মুখের ভাষা কাব্যে প্রকৃষ্ট বাহন হবার যোগ্যতা তারই। সেটাই তো মানুষের আসল ভাষা (real language)। আচার-সর্বস্ব আইনের ভাষা বা অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত বাগ্মিতাপূর্ণ কৃত্রিম রেটারিক্ (rhetoric)-সূত্রবদ্ধ ভাষা এটা নয়। এই ভাষার প্রধান লক্ষণই হচ্ছে অনুভবের সহজ-সাধ্যতা। মরমী কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth) এই ভাষাকেই বলেছেন "the real language of men in a state of vivid sensation"—মানুষের অনুভূতির অভিব্যঞ্জনাতেই খাঁটি ভাষার প্রকাশ। 'সব শেয়ালের এক রা'—মহাকবি কীটস্ (Keats)-ও তাই বলেছেন এই প্রাণের ভাষাকে 'the true voice of feeling'—সত্যকার বোধের ভাষা।

প্রাণস্পন্দনময় এই মুখের ভাষাকেই অ-সাধারণ কাব্যিক ভাষায় রূপান্তরিত যিনি করতে পারেন—তিনি অবশ্যই মহান্ কবি—মনীষী স্বয়ম্ভূঃ। তাঁর এই কাব্যিক ভাষা বিশুদ্ধতম অর্থে একান্তভাবেই সাঙ্গীতিক (musical) হতে বাধ্য। অনির্বচনীয় সঙ্গীতরূপই ঐ ভাষার জীবনচিহ্ন। তা'হলে স্পষ্টতঃই বুঝা যাচ্ছে যে, মুখের কথা বা গদ্য হচ্ছে এক মেরুপ্রান্ত—অপর প্রান্তে হচ্ছে বাক্-সঙ্গীত। উভয় প্রান্তকে সম্মিলিত করে প্রবাহিত হয় কবিতাস্রোত। তথাপি স্মরণ রাখা দরকার যে, অমন কথ্য গদ্য ভাষা সব সময়ে, সকলের ক্ষেত্রেই যে কাব্য-ভাষা হয়ে দাঁড়াবে,—কিংবা সবার মুখেই কবিত্বময় কথা ব্যক্ত হবে, তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং সবার ক্ষেত্রেই গদ্যের শুষ্কতাই প্রকট থাকে, অ-কাব্যিক প্রকৃতিই বলসিত থাকে। এই কারণেই তো অসাধারণত্ব—অ-সাধারণ বলেই। জোর করে টেনে-হিঁচড়ে কবিতার সৃষ্টি করা যায় না। "বলাদ্ আকৃষ্যমানা চেৎ সরসা বিরসায়তে"—প্রাচীন কবিতা-কোবিদ্গণ বলে গেছেন। কবিতা যখন স্বেচ্ছায়

আসে তখনই আনন্দদায়িনী—তখনই অমৃত—তখনই রসঘন। কিন্তু চেষ্টাচরিত্র দ্বারা টেনেবুনে তৈরী করতে গেলে তার সরসতা নষ্ট হয়ে যায়।

কথার পিঠে কথা বলার নামই কিছু কবিতা রচনা নয়। কেবল কথার ব্যাপার নয়,—কাব্য রচনাতে একান্ত অপেক্ষা রয়েছে, বাক্যের বা কথার অতিরিক্ত আরও একটা ইঙ্গিতের—যার নাম অনুভূতি। কবিতার আকারেই তাই বলতে পারি—

কবিতা বুঝিতে চাও?
সহজে তো দিবে নাকো ধরা,
অভিধান ব্যাকরণ দেখিও না,
অনুভূতিকে আনিও তোমরা।

শ্রীশ্রীমা তাঁর সরল গ্রাম্য-গদ্যে যতো কথাই মুখে ব্যক্ত করেছেন, তা' সবই তাঁর অনুভূতির মানস-সরোবর থেকে নিঃসৃত,—তাই তাঁর প্রতি কথাই হয়ে উঠেছে অমৃতকাব্য। যে-হেতু মায়ের উচ্চারিত সকল ভাষাই 'ধেয়ানের ভাষা'। রবীন্দ্রনাথের কথায় নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়:

"তার বৈচিত্র্য ছন্দ-তরঙ্গে,
কল-কল্লোলে।"

উদ্বোধনের বাড়িতে একদিন নানা প্রসঙ্গের মাঝে কর্মক্ষয়ের কথা উঠেছে। শ্রীশ্রীমা বললেন:

"আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস করে কি যায়? এও তেমনি।

"ধীরে ধীরে কর্মক্ষয় হয়। ভগবান লাভ হলে ভেতরে ভেতরে তিনি জ্ঞানচৈতন্য দেন—নিজে জানতে পারে।"

মা তাঁর অহেতুক করুণার দ্বার সকলের জন্যই অহর্নিশ সমান উন্মুক্ত রেখেছেন। সে করুণার রূপাঙ্কন করেছেন স্ব-মুখের ভাষার তুলিতে—যা অনবদ্য। মা উপমা ব্যবহার করেছেন—যা তাঁর কথার মুখেই এসেছে—'বলাদ্ আকৃষ্টমানা' হয়ে আসেনি। সর্বোত্তম এক কবিকৃতি মায়ের এই উপমা-প্রয়োগে ফুটে উঠেছে,—যেখানে উপমার প্রভাবও অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বহুল ব্যবহৃত, একটি খোলা বাজারের সুলভ উপমা নয়,—এমন উপমা জীবনসত্যের এক আশ্চর্যতম নব-আবিষ্কার। মা বলেছেন:

"সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে মাটিতে। উপরে সূর্য নিচে জল।

জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সূর্য, আমাকে তুমি টেনে তুলে নাও উপরে? সূর্য নিজের স্বভাব থেকেই টেনে নেয়। তেমনি আমি সকলের মা। সকলকে স্বভাববলেই টেনে নেব। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না।"

আপন মাতৃস্বরূপেরও এমন উন্মোচন এক দিব্য প্রকাশ ছাড়া আর কি? এখানেই কবিতার সার্থক সৃষ্টি,—শ্রীশ্রীমায়ের ছোট্ট একটি প্রাসঙ্গিক কথাতে। কবিতার উৎকর্ষ সেখানে, যেখানে তার উৎস হচ্ছে ঈশ্বরে—যখন তা মানুষের কাছে শান্তি ও সান্ত্বনা বহন করে,—এবং যখন তাতে আধ্যাত্মিকভাবের বিকিরণ থাকে। কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth) যথার্থই লিখেছেন : "Poetry is most just to its divine origin, when it administers the comforts and breathes the thought of religion"।

শরণাগতির প্রশ্নে মায়ের উক্তিতে কী অপূর্ব লাবণ্যলাভ করেছে. মাত্র একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখই যথেষ্ট হবে।

"এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।"

ভক্তিসাধনার এক অপূর্ব কাব্যরূপ। মায়ের ভাষাতে ছন্দ, যতি, লক্ষনায়।

শ্রীশ্রীমায়ের কথায়—অতি পরিচিত ব্যাপারেও তাঁর উক্তির মধ্যে যেমন সুষমা সিঞ্চিত থাকত, তেমনটি আর কোথায় কে দেখেছে? এমন সূক্ষ্মতা, চারুতা, প্রসাদরম্যতা! কেবল দেখা নয়, কল্পনাও নয়. নিপুণ পর্যবেক্ষণ। নির্বাচনেও কী বৈশিষ্ট্য! ঘরোয়া, সুপরিচিত, সবার দেখা,—তবুও কতো অভিনবত্ব! কথাটি সরল, ভাষা সহজ—অথচ কী তীক্ষ্ণ, কতো শক্তিমণ্ডিত। একটি মামুলি দৃশ্য, সাদাসিধা ছবি—অতি চিরাচরিত, অথচ কী অপরূপ বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জনা! সীমার মধ্যে থেকেও কোন্ অসীমে নিবদ্ধ থাকত তাঁর দৃষ্টি।

পুরীধামে সমুদ্রতটে। মা বিরাটের মুখোমুখি দণ্ডায়মান। ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে আছড়ে আছড়ে ভেঙ্গে পড়ছে তটে। মায়ের কানে তখন মহাগর্জনের অন্তরালে উত্থিত মর্মান্তিক একটি হাহাকার-ধ্বনি। বেদনার্ত কণ্ঠে মা বলছিলেন :

"ওর কি কম দুঃখু! ব্যথায় ওর বুকটা যে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অসুরে মিলে যে যার লভ্যাগণ্ডার জন্যে সমুদ্দুরকে মন্থন করলে, ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে রাখা ধনরত্ন, অমৃত, কত কি লুটে নিলে, শেষে কিনা ওর প্রাণাধিক কন্যা

কমলাকেও কেড়ে নিলে! পিতার এ বুক-চেরা দুঃখু কি কম গা? মেয়েকে একবারটি ফিরিয়ে পাবার জন্যে সমুদ্দুরের এত আর্তনাদ।"

জীবনকে জড়িয়ে যে সুগভীর দুজ্ঞেয় রহস্য তাকে নিষ্কাসন করাই তো কবিতা,—যার প্রকাশ এই ভাবেই তো ভাষায় ধরা পড়ে। শ্রীশ্রীমা সারদা স্বয়ং সরস্বতী—বাগ্‌দেবী—কবিকুলজননী। তাই-ই তো এমন কবিতার স্ফূর্তি তাঁর প্রতি নয়নপাতে।

* * *

কোনও কথায় সুনিয়মিত যে ধ্বনিবিন্যাস শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে, তাকেই বলা হয় ছন্দ। একান্তভাবে বাক্‌নির্ভর ধ্বনিশিল্পই উৎকৃষ্ট ছন্দ। ছন্দের ধর্ম হচ্ছে,—নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ধ্বনির পুনরাবর্তনতৃষ্ণাকে মেটানো, শ্রোতার প্রত্যাশাকে চরিতার্থ করা। অবশ্য ভাষার স্বাভাবিক ও যথাযথ উচ্চারণ-ভঙ্গির মধ্যেই ছন্দের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। উচ্চারণ-প্রবণতার উপরে তাই ছন্দের কৃতকার্যতা নির্ভরশীল। সাধারণতঃ দেখা যায়, পদ্যের ক্ষেত্রে ছন্দের যতিবিভাগ হয়ে থাকে একটা সুনিরূপিত গাণিতিক প্রক্রিয়াতে। কিন্তু গদ্যের বেলায়, তা আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যাঁরা প্রকৃত তাৎপর্যার্থেই কবি,- তাঁদের রচিত বা কথিত গদ্যের মধ্যেও অল্লাধিক ধ্বনিসাম্য এবং শিল্পসুষমা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ছন্দঃস্পন্দ সেখানে গদ্যতেও অনুভব করা যায়।

উচ্চারণ-বিরতির নাম যতি। বাস্তবিক পক্ষে কথাকে বা রচনাকে যতোই তরঙ্গায়িত বোধ হবে—অথচ ঐ তরঙ্গমালাতে ভঙ্গও থাকবে, ততোই ঐ কথার বা রচনার কাব্যধর্মিতা সার্থক। তার ছন্দ-রীতির উৎকর্ষ। গতিমান তরঙ্গের মাঝে মাঝে যে ভঙ্গ, তাকেই বলা হয়ে থাকে যতি। মোটকথা যতি ও গতিই হচ্ছে ছন্দের জীবন-চিহ্ন। অবশ্য গদ্যের ক্ষেত্রে সব সময় ছন্দ-অনুসারী যতি হয় না, ভাব অনুযায়ী হয়ে থাকে। ছন্দঅনুসারীকে বলা হয়ে থাকে 'ছন্দ-যতি',—ভাবানুগ যতিকে নাম দেওয়া হয় 'ভাব-যতি'। মনে রাখতে হবে, গদ্যময় কবিতাতে সব সময়ে কথার মিল খোঁজার প্রয়াস বৃথা। কোথাও স্বাভাবিকভাবেই মিল এসে যায় বটে—কিন্তু সেটা কোনও চেষ্টা প্রসূত নয়। চেষ্টা করে মিল-রচনার চমক থাকে,—কিন্তু গুরুত্ব কিছু নেই।

কবিতার ভাষায় বা শব্দে একটা সুরও থাকে—এটা স্বীকার করতেই হয়।

ছান্দসিকরা তা জানেন। এই সুরকে তারা নাম দিয়েছেন 'লয়'। এই সুর মাত্র কথার বা শব্দেরই থাকে না,—অর্থেরও সুর থাকা সম্ভব। সঠিক তাৎপর্যে—এই অর্থ-লয়ের নামান্তরই হচ্ছে গদ্যছন্দ। ছন্দসম্রাট রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যছন্দেরই পরিভাষা করেছেন 'ভাবের ছন্দ'—ইংরেজীতে যাকে বুঝানো হয় Sense Rhythm আখ্যায়।

শ্রীশ্রীমায়ের রচিত নয়,—তাঁর কথিত বা উচ্চারিত সকল আটপৌরে কথাতেও মিলবে এমন সহজাত স্বাভাবিক গদ্যছন্দ,—অথবা রবীন্দ্রনাথ-কৃত সংজ্ঞায় 'ভাবের ছন্দ'। এই প্রকার সংবেদ-ছন্দঃস্ফূরণ বা Sense Rhythm মায়ের অমৃত কথায়, একটা অতি সাধারণ ধরা-ছোঁয়ার ব্যাপার যেন। তাঁর মুখোচ্চারিত কথাগুলিতে ছন্দ যেমন তরঙ্গায়িত,—যথাবিহিত ভাবযতিও তেমনই স্পষ্ট বিদ্যমান।

শ্রীশ্রীমায়ের দৈনন্দিন জীবনবৃত্তের সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন যে তিনি যেন কবিতা দিয়েই গড়া ছিলেন,—কাব্য উৎসারিত হত তাঁর মুখের অতি সাধারণ, এমনকি সাংসারিক ব্যাপারেরও সকল অভিব্যক্তিতে। উচ্চ জ্ঞান-ভক্তিমূলক কথাবার্তায় তো বটেই, নেহাত ঘরোয়া আলাপেও এর ব্যতিক্রম কখনও আমাদের জ্ঞাত নয়। আনন্দই যাঁর স্বরূপ, তাঁর সর্ববিধ প্রকাশ—মুখের ভাষাও যে হবে আনন্দেরই ছোট বড় প্রস্রবন, তাতে আর আশ্চর্য কি? আমরা মায়ের সকল কথাকেই অমৃত-কথা—আনন্দ-বার্তা বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম, আপন আপন বোধ-সামর্থ্য অনুযায়ী। সে-রকম সুযোগ্য আধার এই অমৃত-ধারাকে নিশ্চয়ই আত্মগত করে এমন জটিল দুঃখের সংসারের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অধিকারী হবেন বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে। অবশ্য এ-কথাও ঠিক যে আনন্দ কাউকে বুঝিয়ে বলার বা গছিয়ে দেবার বিষয় নয়। মনে পড়ে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'কাব্যের তাৎপর্য' ব্যাখ্যায় উপসংহারে বলেছেন: "আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুমফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ বা তৈলের জন্য বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন,—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।" আমরাও অসমসাহসে 'বাণীর কমলবনে' নিতান্তই অনধিকার প্রবেশ করে, কয়েকটি মাত্র সারদা-কথা-

কুসুমকে চয়ন করতে প্রয়াসী হয়েছি এখানে,—যাঁর যেমন অভিরুচি, তিনি তেমনই পেতে পারবেন এ-থেকে স্বচ্ছন্দে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এবং বিবেকানন্দ-বাণীর মতোই মায়ের গল্পকথাও অসাধারণ ছন্দঃস্পন্দিত। তাঁর মুখের পাড়াগেঁয়ে কথা,—শুধু বক্তব্যের তেজেই নয়, বক্তব্যবাহী ধ্বনিতরঙ্গের বেগে ও প্রখরতায়ও বটে, শ্রোতার সর্বাঙ্গের রক্ত-স্রোতকে কখনও উত্তাল করে তুলেছে, কখনও সেই স্রোতে নিয়ন্ত্রিত গতি প্রদান করেছে,—সংযমিত করে দিয়েছে তার সকল প্রবৃত্তিকে। তার হৃদয়ে সঞ্চার করেছে নব শক্তি, উৎসাহ ও প্রেরণা। মরণকে পরাভূত করার তেজ এনে দিয়ে, মরণজয়ের সামর্থ্য দান করেছে শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত কথা! 'কথামৃতং তপ্তজীবনং' —আকারভূতা এখানে। এখানে উদাহরণ-স্বরূপ উৎকলিত মায়ের অমৃত কবিতাময় কথাগুলিতে আমাদের বক্তব্যের উপলব্ধি করা কতকটা সহজ হবে ভরসা রাখি।

আশ্রিতা জনৈকা কন্যার আক্ষেপময় এক চিঠির উত্তরে মা লিখেছিলেন ঃ

"পথ হারাবে কেন? পথ পাবার জন্যেই তো এখানে আসা। যখন মনে অশান্তি আসে ঠাকুরকে খুব ডাকিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি আশীর্বাদিকা তোমার মাতাঠাকুরানী।"

রীতিমতো ছন্দানুবর্তন পত্রে লক্ষণীয়। ছন্দোগ্রথিত কথাগুলির মাঝে মাঝে ভাবযতিও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অসামান্য প্রেরণাদায়ী তো বটেই। পথ বিভ্রান্তি মোচনকারিণী শ্রীশ্রীমায়ের এই অতুলনীয় পত্র-ভাষাকে যদি কবিতাকারে সাজিয়ে আমরা পাঠ করি,—তা'হলেই বা আপত্তি কোথায়? যেমন—

"পথ হারাবে কেন? / পথ পাবার জন্যেই তো [এখানে] আসা। যখন মনে অশান্তি আসে / ঠাকুরকে [খুব] ডাকিবে। // [তুমি] আমার আশীর্বাদ জানিবে। / ইতি আশীর্বাদিকা [তোমার] মাতাঠাকুরানী। //

উপরে ব্যবহৃত চিহ্ন-পরিচয় এইরূপ ঃ পূর্ণযতি—//, লঘুযতি—/।

উদ্ধৃত পত্রাংশে ধ্বনিসাম্য এবং সুনিরূপিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দঃস্পন্দ সুস্পষ্ট। কখনও কখনও ছন্দের তরঙ্গভঙ্গিতে একটু বিশেষত্ব আরোপের উদ্দেশ্যে পর্ব, পংক্তি বা পদের প্রথমে বা মাঝে একটা অতিরিক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ছন্দরসিকরা আখ্যা দিয়েছেন 'অতিপর্ব'। এমন অতিপর্বের প্রয়োগ সুবিখ্যাত কবিদের দ্বারাও হামেশা হয়ে থাকে। যথা— "হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা।" রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা-পংক্তিতে

'হায়'-টি হচ্ছে অতিপর্ব। শ্রীশ্রীমায়ের উল্লিখিত পত্র-কাব্যে তৃতীয়-বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে কয়েকটি অতিপর্বের অবস্থানকে।

চিঠির প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা স্মরণ না করে থাকা যায় না,—সেখানেও মায়ের এক অলোকসাধারণ পত্র-স্মৃতি আমাদের মন বুদ্ধিকে চিরদিনের মতো আবিষ্ট রেখেছে। মায়ের আদেশ-সম্বলিত সেই পত্রখানি যেন মহাকাব্যের এক বিশেষ সর্গ—কিংবা বেদোপনিষদের অন্তর্গত শিক্ষাবল্লীর কিছু অনুচ্ছেদ। সে-পত্রখানিতে সম্পুটিত আছে শিক্ষা-শাসন, করুণা-তিরস্কার, অভয়-অমৃত। অথচ গদ্যভাষায় কবিতার ছন্দে ভরা।

একজন সন্তান মাকে অসঙ্কোচ অকপট পত্র দিয়েছেন,—যা তাঁর "অতীত জীবনের এমন সব কুকার্যের বর্ণনায় ভরা, যাহা মনুষ্যে কি করিয়া সম্ভবপর হয়, তাহা মনুষ্যমাত্রেরই অগোচর! সঙ্গে সঙ্গে কি অকুতোভয়তা, কি অকপটতা সহকারে নিজ পাপ-কীর্তি করা!" দীর্ঘপত্রটির ভাষা এইরূপ খোলামেলা ও স্নিগ্ধ যে, তাতে একবার চোখ বুলাবার পরেই, যে-সেবকটি মাকে নিত্য পত্রাদি পড়ে শোনান, সেই তিনিও শুষ্ক-ওষ্ঠে কম্পিতস্বরে মাকে নিবেদন করেছিলেন, "কি করে পড়ব মা? পাচ্ছিনে যে!" জনাই থেকে সেই আশ্রিত সন্তানের লেখা চিঠিটির আয়তন ছিল লম্বা ছয়-পৃষ্ঠা। শ্রীশ্রীমা সেবকের অস্বস্তির কারণ পলকের মধ্যেই বুঝে নেন এবং তাকে চিন্তামুক্ত করে তৎক্ষণাৎ-ই বলে দেন: "বুঝেছি, পড়তে হবে না। তাকে এরকম চিঠি লিখতে বারণ করে দাও। আমার চিঠি এখানকার ছেলেরা মেয়েরা কেউ পড়ে শোনায়।" ক্রমে একটু শান্ত হয়ে, পুনরায় বলতে থাকেন: "লিখে দাও—আগে ছিলে রাহুখেগো চাঁদ, এখন ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে হয়েছ পূর্ণিমার ষোলকলায় পূর্ণ! ভাবনা কিসের? ঠাকুরই সব ঠিক করে দেবেন'।"

আমরা মায়ের উক্তিগুলিকে পুনর্বিন্যাস করে লিখছি এখানে,—শুধু প্রত্যক্ষ করতে যে, স্বয়ং বাগ্‌বাদিনীর মুখোচ্চারিত অমৃতনির্ঝরিণী বাক্য-ধারায় কীরূপ ছন্দানুবর্তন থাকে।

"আগে ছিলে রাহুখেগো চাঁদ,
[এখন] ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে হয়েছ
পূর্ণিমার ষোলকলায় পূর্ণ!
ভাবনা কিসের?
ঠাকুরই সব ঠিক করে দেবেন।"

এবার তাঁর আরও কিছু কাব্যময় গদ্য-উক্তিকে লিপিবদ্ধ করব—ছন্দোবদ্ধ আকারেই।

ভগবদ্দর্শন সম্পর্কে এক জিজ্ঞাসু ভক্তের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন মা,—কেমন সহজ-সরল নিরলঙ্কারের অলঙ্কার মায়ের কথার সজ্জা, তা' এখানে উপলব্ধব্য। মায়ের দুই হাতে যেন শুদ্ধ দুই গাছি শ্বেত শুভ্র শঙ্খ-বলয়,—অনৈশ্বর্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভূষণ,—অনলঙ্কৃত অলঙ্করণ! কী অপূর্ব স্নিগ্ধ কাব্য-সুধা :

"যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়,
চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়,
তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে
তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়।
নির্বাসনা যদি হতে পারে,
এক্ষুণি হয়।"

* * *

প্রশ্ন করা হয়েছিল,—ছবিতে কি ঠাকুর আছেন? বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো মায়ের উত্তর :

"আছেন না?
ছায়া কায়া সমান।
ছবি তো তাঁর ছায়া।"

* * *

মাত্র এক পংক্তির কবিতাময় কাব্যে নিজ স্বরূপ-কথন :

"ওরে আমি যে আস্তাকুড়ে পদ্ম ফুটেছি।"

একটি তাৎক্ষণিক সম্ভাষণ—কিন্তু কী অপূর্ব ভাবের ছন্দ দোলায়িত। পুরীধামে একবার জনৈকা মহিলার সঙ্গে তার দুই কিশোর পুত্রকে দেখে শ্রীশ্রীমা সস্নেহে ছেলে দুটিকে কাছে ডাকেন :

"এস কৃষ্ণ-বলরাম, এস।"

ছেলে দুটির মধ্যে যে-বড়, সে ছিল গৌরবর্ণ,—ছোট ছিল কৃষ্ণবর্ণ।

মায়ের সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও কবিতার সহজ উপস্থিতি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। উদাহরণ :

"যার আছে ভয়, তার হয় জয়।"

আবার, "যে খায় চিনি, তারে জোগায় চিন্তামণি!"

অন্য একজনকে :

"যা না করে ধনে জনে,
তা করে ক্ষণের গুণে।"

শ্রীশ্রীমায়ের সম-দৃষ্টি প্রোজ্জ্বল হয়েছে, সহজ একটি কথা-কাব্যে :

"শরৎ আমার যেমন ছেলে,
আমজেদও আমার তেমন ছেলে।"

বেদনা বা শোককে প্রকাশ করেছেন মা একটি অনবদ্য ছন্দে। ভগিনী নিবেদিতার দেহত্যাগে মায়ের অন্তর-ব্যথার অভিব্যক্তি শোনা গিয়েছিল :

"যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাঁদে মহাপ্রাণী।"

মায়ের বাক্যে ভাবপ্রকাশের সংহতি,—অতিশয় অল্প কথায় কী বিপুলায়তন ভাবরাশির ব্যঞ্জনা! ভাষার এমন দ্যোতনা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতিতেও বিরল।

অভয়া সর্বাশ্রয়দাত্রী মা তাঁর স্খলিতচরিত্র জনৈক সন্তানের প্রতি স্নেহের পক্ষপাত-প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

"আমার কাছে আসবে নি তো
কার কাছে যাবে ?
আমি কি খালি ভালরই মা !
—মন্দের নই ?"

লীলাসংবরণের প্রাক্‌কালে অন্নপূর্ণার মাকে উপলক্ষ করে বাংলা সাহিত্যের যে অবিস্মরণীয় কাব্যগাথা শ্রীশ্রীমায়ের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল—তাতে তাঁর সর্বোত্তম কথামৃতই মানব-সন্তানদের উদ্দেশে বিতরিত হয়েছে।

"যদি শান্তি চাও মা,
কারও দোষ দেখো না।
দোষ দেখবে কার ?—
জগৎ কি তোমার পর ?
জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ।
কেউ পর নয় মা,
জগৎ তোমার ;-
দোষ দেখবে নিজের।"

শাশ্বত সারদা-বাক্যসুধা ! শান্তি-তিয়াসী মানুষের জন্য স্নেহ-পাথার জগজ্জননীর আশিসামৃত। মহাযাত্রার পূর্বক্ষণেও কণ্ঠে কবিতারস !!

মানুষের প্রতি দোষদৃষ্টির প্রসঙ্গে, আত্মকথা প্রকাশ করেছেন,—সেখানেও কী মধুর ছন্দ ! মা বলেছেন :

"মানুষের কি দোষ দেখতে আছে !
ওটি শিখিনি !
ক্ষমারূপ তপস্যা।"

উপদেশ-প্রদান, কথোপকথন, পত্রলিখন, আলাপ-অনুলাপের মধ্যেই মায়ের কথার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত—তাঁর স্বভাব-সাহিত্য-বিভাব স্ফুরিত হত, তা' নয়—তাঁর মুখের বর্ণনাত্মক সংলাপের মধ্যেও ঐ অসাধারণত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সাহিত্য ছিল যেন তাঁর জীবন-শিল্প,—যেন তিনি একজন জাত-শিল্পী। শিল্পচেতনা তাঁর শিক্ষাপ্রাপ্ত বা আয়ত্তীকৃত কোনও গুণ ছিল না,—সেটা ছিল তাঁর সহজাত আত্মভাব বা চারিত্র্য গুণ। সাহিত্য—কবিত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য এগুলি ছিল তাঁর স্বভাবপ্রেরণা বা প্রকৃতিসিদ্ধ। তেলোভেলোর প্রান্তরে সেই ডাকাতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনার বর্ণনা কতোভাবে বর্ণিত হয়েছে, কতো জনের দ্বারা। কিন্তু মা স্ব-মুখে যে বিবৃতি দিয়েছেন ঘটনাটির,—তাতে মনে হবে কোনও বিখ্যাত শিল্পীর হাতে আঁকা একখানি দৃশ্যপট দেখছি আমরা! অথচ বিস্তারিত বর্ণনা নয়, – বরং অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু নিখুঁত। যেন মাত্র কয়েকটি তুলির টানে, চকিতের মধ্যে এঁকে দিয়েছেন একখানি জীবন্ত ছবিকে। শ্রীশ্রীমায়ের মুখের বর্ণনা ঃ

"কখনও তো ওদের মতো চলার অভ্যেস নেই। তবুও ধিকিধিকি চলতে লাগলুম। একা সেই তেপান্তরের মাঠে চলেছি। ওখানে বড় ডাকাতের ভয়। অনেক গল্প ছেলেবেলায় শুনেছি। সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবু চলেছি। গা ছম্‌ছম্‌ করছে। এমন সময়ে দেখতে পেলুম সামনে থেকে একটা লোক—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, হাতে রূপোর বালা—খুব ঢেঙ্গা—লাঠি হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি থমকে দাঁড়ালুম। গোটা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।"

প্রথম শ্রেণীর কথাসাহিত্য একখানি! শিল্পকলা তো বটেই। আবার এরই মধ্যে আপন চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকেও কী আশ্চর্য সুন্দর সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এখানে,—লোকশিক্ষাদানরীতিও কতো সুকুশল! তেলোভেলোর মাঠে একাকিনী মাকে দূরে ফেলে রেখে সঙ্গীদের নিরাপদ স্থানে চলে যাবার সংবাদটিকে নিজমুখে ব্যক্ত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন,—জানিয়েছিলেন গম্ভীর কণ্ঠে ঃ "আমি সকলের কাছে ঐ কথা বার বার বললে তাদের অপমান হয়।"

মূর্তিমতী তিতিক্ষা, ক্ষমা, মমতা—শান্তশ্রী সারদা। শ্রী ও সুষমা তাঁর কথায়, ব্যবহারে, আচরণে এবং সর্বপ্রকার প্রকাশে,—তা' ভাষা দিয়েই হোক, বা দৃষ্টি দ্বারাই হোক, কিংবা ইঙ্গিতেই হোক।

দ্বৈত-ভাব থেকে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের চরম পর্যায় পর্যন্ত মায়ের অবাধ বিচরণ। সর্ব বেদান্ত-তত্ত্বের সার উৎকর্ষ অনুরণিত হয়েছে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীমা সারদার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে। অথচ কী সরল কথায়, মধুর ব্যঞ্জনায় সিদ্ধান্ত বাক্যকে তিনি পরিবেশন করেছেন,—তা' অধ্যাত্মরাজ্যের এক বিস্ময়কর ইতিহাস। শ্রীরামকৃষ্ণভাবেরই সজীব প্রতিমা তিনি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতেরই বাঙ্‌ময়রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, মায়ের মুখের মিষ্ট কথাতে। মা বলছেন: "জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। 'মা' 'মা' শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা।"

শ্রীশ্রীমায়ের কথায় সহজ ভাবে ব্যক্ত যে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বা বেদান্তের চরম সত্য—তার তুলনা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ছাড়া আর কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনাতেও অবশ্য একই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। বিশ্বের ধর্ম সাহিত্যে এ-হেন বস্তু নিতান্তই অলভ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে আমরা তাঁকে দেখেছি এক অসামান্য বাণীশিল্পীরূপে,—যাঁর অমরসাক্ষ্য শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'। স্বামী বিবেকানন্দের অমৃত-বাণীও সংরক্ষিত কতকাংশে—সর্বাংশে না হলেও। আমরা উল্লেখ করেছি, পূজ্যপাদ মাস্টার মশায় বা শ্রীম-র নাম। যিনি ঐ অথৈ অমৃতসমুদ্রকে আপন পাত্রে ধারণ করে রেখে, জগতে বিলিয়েছেন অকাতরে। তা'ও অংশতঃ-ই বলব। অনন্ত সাগরকে ধারণ করার সাধ্য কার? পুণ্যকীর্তি গুড্‌উইন, ওয়াল্ডো (ভগিনী হরিদাসী), শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখরাও জগতের অমৃত-ভোজে বিতরণের জন্য—নিজ নিজ সঞ্চয় পাত্রকে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছেন। এ-প্রসঙ্গে 'Inspired Talks' বা 'দেববাণীর'-র বিশেষ প্রকর্ষের কথা আমরা বলেছি আগে। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের প্রসন্ন প্রসাদ—তাঁর অনুপম অমৃত-কথাকে সে-ভাবে সংরক্ষণের বা বিতরণের প্রয়াস তেমনভাবে কোথাও তো এখনও পর্যন্ত হয়নি বোধ হয়। অথচ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত-কথাগুলিও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং বিবেক-অমৃত-কথা 'Inspired Talks' ('দেববাণী')-র মতোই কোনও স্বতন্ত্র গ্রন্থ-সম্পুটে যদি আবৃত হত—তা'হলে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হত। আমরা জানি দুইখণ্ডে প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ভক্তগৃহে বা সাধুজনের ধ্যান-

প্রকোষ্ঠে নিত্যপাঠ্য গ্রন্থ বলেই সমাদৃত। অথবা, দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না যে, সাম্প্রতিক কালের এক অত্যন্ত শ্লাঘনীয় প্রকাশন স্বামী সারদেশানন্দ-প্রণীত 'শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা' মাতৃভক্ত ত্যাগী-গৃহী প্রায় সকল সন্তানের কাছেই ইদানীং নিত্যসহচর হয়ে আছে। যা'হোক, ঠিক একটি আধারে বিধৃত না হয়েও, মায়ের বচনামৃতরস এ-ভাবে নানা পাত্রে ভরে পরিবেশিত হয়ে চলেছে,—যা' এ-সংসারে আধ্যাত্মিক প্রত্যয় ও অনুভূতির দিশারীর কাজ করছে সুনিশ্চিত।

পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী অরূপানন্দ—রাসবিহারী মহারাজের নাম—যাঁর উদ্যোগ, উৎসাহ ও অদম্য নিষ্ঠার ফলশ্রুতিস্বরূপ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থখণ্ডদ্বয় আমরা পেয়েছি। ভক্তিভাজন স্বামী সারদেশানন্দও স্মরণার্হ,—শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে এমন অমূল্য স্মৃতিসম্পদরাশিকে তিনি এতোকাল পরে হলেও, আমাদের অধিকারের সীমানার মধ্যে বিতরিত করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে সুলিখিত জীবনীগ্রন্থ বেশ কয়েকখানিই প্রকাশিত, ইদানীং তাঁর জীবনের নানা-দিক নিয়ে গবেষণা ও মননও করা হচ্ছে। তবে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তিনিচয়ের মধ্যে যে-অসাধারণত্ব সে-বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করার প্রথম প্রয়াস দেখেছি আমরা শ্রীমান্ দাশঙ্কর দাশগুপ্তের 'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থে। অন্যান্য আরও বিদগ্ধজন শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনী-রচনায় সফল হয়েছেন। সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

শ্রীরামকৃষ্ণভাব-জগতে যিনি সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার—লীলাপ্রসঙ্গকার পূজ্য স্বামী সারদানন্দজী তাঁর চিরন্তন গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'—সাধকভাবের বিংশ খণ্ডে শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম জীবনের প্রসঙ্গ লিখেছেন খুবই অল্প। যদিও অল্প—তথাপি অনন্তের সংবাদটি তিনিই সর্বপ্রথম জগদ্বাসীকে দিয়েছেন। শ্রীশ্রীমাতৃ-অনুধ্যানের প্রেরণাদাতা গুরুরূপে তিনিই আমাদের সর্বাগ্রে প্রণম্য।

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতকথা ভাগীরথীপ্রবাহের মতো আমাদের তাপিত অভিশপ্ত জীবনকে চেতনাবান করে তোলে। অমেয় সেই কথা-ভাগীরথী থেকে মাত্র এক শত আট বিন্দু অমৃত-বারি আমরা এখানে আহরণ করলাম,—জীবন-যন্ত্রণায় যখন কাতর হব, তখন তা থেকে বিন্দু বিন্দু পান করার উদ্দেশে। অভিশপ্ত সেই সগরপুত্রের

মতো আমরা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছি কতো কাল ধরে,—মায়ের অমৃত-কথার ভাগীরথী ধারায় নতুন জীবন যেন প্রাপ্ত হই,—প্রার্থনা মাত্র এই ই। মাকে শুধু বলি,—অমৃত বাণীরূপে তুমি এস মোদের জীবনে। আমাদের মাঝে,—অন্তরতম অন্তরে। আমাদের আধি-ব্যাধি জরামৃত্যু শোক-বিচ্ছেদের কারাগৃহে। তুমি এস একটি শান্ত-শুভ্র কল্যাণ-কিরণের মতো। সমস্ত স্বার্থ আর ঔদ্ধত্য, দারিদ্র্য আর ভীরুতা মার্জিত হোক,—তোমার নয়নের রশ্মি-সম্পাতে। দাও একটি বেজারহীন অমল সন্তোষ, যা' সকল দম্ভ-অহংকারকে, ঐশ্বর্য-অন্ধতাকে ম্লান করে দেবে। দাও একটি করুণার দৃষ্টি, যাতে ঘোরতর দুর্দিনেও দেখতে পারি তোমার প্রেমঘন প্রসন্নতাকে। এই শরীর-মন-বুদ্ধিকে তোমার প্রসাদধারণের যোগ্য পবিত্র পাত্র করে তোল। তোমার নীরব শান্ত উপস্থিতির অবিরাম আনন্দ আমার সমস্ত সত্তায়, সকল অস্তিত্বে সঞ্চারিত হোক। তোমার কৃপা স্পর্শে—তোমার অমৃত-কথায়, আমাদেরও হৃদয় পরিপূর্ণ হোক তোমার কবিতায়, তোমার সহিতত্বে—আমরা যেন প্রসারিত হই প্রীতিতে মৈত্রীতে সর্বভূতে। আমরাও যেন প্রকাশিত হই এই চৈতন্যে—তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ,—আমাদের মাঝে নিহিত সমাহিত। জেগে উঠি যেন তোমারই উপস্থিতির অবারিত আনন্দে।

অষ্টোত্তর শত তোমারই অমৃত-বাক্যপুষ্প চয়ন করে, তোমার চরণে সভক্তি অঞ্জলি দিলাম। দাও সেই মন্ত্র একাক্ষর সেই 'মা' নাম,—যা হবে আমাদের শাশ্বত কাব্য—দেহের শ্রান্তিহরণ, প্রাণের বিরাম, মনের শান্তি, বোধের স্থিরতা, আত্মার আনন্দ।

স্মরি যবে সুমধুর অমৃত কথা শ্রীমায়ের—
দেখি সে-তো কথা নয়, হৃদয়ের স্বতঃ-নির্ঝরিত
অমেয় অমিয় ধারা, দূর করে তাপিত জনের
তৃষা, ক্লান্তি, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক অপরিমিত;
যেন আমরা সগরপুত্র অভিশপ্ত যুগ যুগ ধরে,
নিষ্প্রাণ মৃতের দল,—আমাদের প্রাণ দেও ভরে।
শুনি অনাহত বাজে: 'কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিঃ ঈড়িতং কল্মষাপহম্'।

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত-কথা : অমেয় অমিয় ধারা

নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে গিয়ে স্বরূপত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। ১ ॥

হাঁ, আপনার বই কি! যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার। ২ ॥

ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। তাঁর নিজের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়। ৩ ॥

ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, সদসৎ-বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়। ভাবে লাভ···—ভাবে দর্শন, ভাবে কথাবার্তা, সব ভাবে হয়। ৪ ॥

চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে, চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু ক'রে পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি ক'রে সৃষ্টি করেছেন? না, তাঁর একটা শক্তি আছে।

তাঁর 'হা'-তে জগতের সব হচ্ছে, 'না'-তে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয় নি। ৫ ॥

কল্পান্তে সব যেন ঘুম থেকে ওঠে। ৬ ॥

জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়। কিন্তু ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া পাওয়া যায় না। জপটপ কি জান? ওর দ্বারা ইন্দ্রিয়টিন্দ্রিয়গুলোর প্রভাব কেটে যায়। ৭ ॥

বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়।··· বাসনাটি সূক্ষ্ম বীজ—যেমন কিছু পরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই। বাসনা

থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর এক খোলে ঢুকিয়ে দিলে। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না। ৮ ॥

...জ্যৈষ্ঠ মাসে যে আমটি হয় তা যেমন মিষ্টি, অন্য মাসে কি তেমনটি হয়? মানুষ অকালে ফলাবার চেষ্টা করছে। দেখ না এখন আশ্বিন মাসে কাঁঠাল হয়, আম হয়। কিন্তু কালের মতো কি মিষ্টি হয়? ঈশ্বরলাভের পথেও অমনি। এজন্মে হয়তো জপতপ করলে পরজন্মে হয়তো ভাব একটু ঘনীভূত হ'ল, তার পর জন্মে হয়তো আর একটু হ'ল—এইভাবে আর কি। ৯ ॥

আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। তোমাদের ভাবনা কি? । ১০ ॥

সকাল সন্ধ্যায় বসবে। আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে জপধ্যান করবে। এর চেয়ে মাটি-কোপানো সোজা কাজ। ১১ ॥

সকলেই কি করে চিনতে পারে, মা? ঘাটে একখানা হীরা পড়ে ছিল। সব্বাই পাথর মনে ক'রে তাতে পা ঘষে স্নান করে উঠে যেত। একদিন এক জহুরী সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখানা এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীরা। ১২ ॥

মলয় বয়ে গেছে, এইবার সব চন্দন হবে। কেবল বাঁশ, কলা ছাড়া। ১৩ ॥

দেখ, বিচার করা, মনের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, জপ-ধ্যান কর্ম করা সব হল মনের, চিত্তের শুদ্ধতা আনার জন্যে,—কি না, অনিত্য জিনিস থেকে, মনের বিক্ষেপ থেকে মনকে গুটিয়ে শুদ্ধ করে তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্যে ব্যাকুল হওয়া, তারপর তাঁর কৃপা যে কিসে হবে তিনিই জানেন। তবে কি জানো, সবচেয়ে তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন? ওই যা করছ—এতেই একমাত্র তিনি সন্তুষ্ট হন—অর্থাৎ সেবাতে। সেবাতে বনের পশুপাখী থেকে স্বয়ং ভগবান—সব বশ। কাজেই মন খারাপ না করে যা করছ করে যাও। আপনার জনকে চাওয়ার বলার কি আছে? । ১৪ ॥

যার জন্য কাশী যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে বেলুড়ে আছেন। ১৫ ॥

জানবে এই তিনটির সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলতে হয়—প্রথম নদীর তীরে বাসস্থান; কোন্ সময়ে নদী হুস্ করে এসে বাসস্থান ভেঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয়, সাপ; দেখলেই খুব সাবধানে থাকতে হয়—কখন এসে কামড়ে দেবে তার ঠিক নেই। তৃতীয়, সাধু; তাঁদের কোন্ কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল হতে পারে তা তুমি জান না। তাঁদের দেখলে ভক্তি করতে হয়; কোনও জবাব করে অবজ্ঞা দেখানো উচিত নয়। ১৩॥

টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাস। কোথায় সংসার ছেড়ে এসে ভগবানের নাম করবে, না কেবল কাজ। আশ্রম হল দ্বিতীয় সংসার। লোকে সংসার ছেড়ে আশ্রমে আসে, কিন্তু এমন মোহ ধরে যায় যে আশ্রম ছেড়ে যেতে চায় না। ১৭॥

ঘরে রাঁধবার সব জিনিস আছে। রান্না করে খেতে হয়। যে যত সকাল রাঁধবে সে তত সকাল খেতে পাবে। কেউ সকালে খায়, কেউ সন্ধ্যায়, কেউ কেউ কুড়েমি ক'রে রাঁধবার ভয়ে উপোস দেয়। ১৮॥

বাবা, বিপদ যে তোমাদের আসবে না, তা নয়, ও তো আসবেই। তবে ও থাকবে না; দেখবে পায়ের তলা দিয়ে জলের মতন চলে যাবে। ১৯॥

দেখ মা, ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, 'এস, বস, নাও, খাও'। আর ভাববে তিনি এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের কাছে কি মন্ত্রতন্ত্র লাগে? ওসব হচ্ছে যেমন কুটুম এলে তাদের আদরযত্ন করতে হয়, সেই রকম। আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাঁকে যেমন ভাবে দেবে, তেমনি ভাবেই নেবেন। ২০॥

দেখ মা, মানুষকে ভালবাসলে দুঃখকষ্ট পেতে হয়। ভগবানকে যে ভালবাসতে পারে সেই ধন্য হয়, তার দুঃখকষ্ট থাকে না। ২১॥

দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। এতে নিজেরই ক্ষতি হয়।

দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।...দোষ কারও দেখো না, শেষে দূষিত চোখ হয়ে যাবে। ২২ ॥

সৃষ্টিই সুখদুঃখময়। দুঃখ না থাকলে সুখ কি বুঝা যায়?। ২৩ ॥

যে জন্মে মন বাসনাশূন্য হয়, সেইটি শেষ জন্ম। ২৪ ॥

কালে ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর ঠুকুর সবই মায়া—কালে আসছে, যাচ্ছে। ২৫ ॥

জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টীশ্বর সব উড়ে যায়। মা, মা শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দাঁড়ায়। এই তো সোজা কথাটা। ২৬ ॥

ছায়া কায়া সমান। ছবি তো তাঁর ছায়া। ২৭ ॥

ডাকতে ডাকতে ছবিতে তাঁর আবির্ভাব হয়। স্থানটি একটি পীঠ হয়। ২৮ ॥

তিনি আপনার। চিরসম্বন্ধ। তিনি সকলের আপনার, যেমন ভাব তেমনি লাভ। ২৯ ॥

জগৎই স্বপ্নবৎ। এটাও (এই জাগ্রৎ অবস্থাও) একটা স্বপ্ন। স্বপ্ন বই আর কিছু নয়। ॥ ৩০ ॥

...ভাঙতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে ক'জনে? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে ক'জনে? দুর্বলতা তো মানুষের আছেই। । ৩১ ॥

মায়া কাটিয়ে কাটিয়ে নির্বাণ হবে—ভগবানে মিশে যাবে। বাসনা হতেই তো দেহ। একটু বাসনা না থাকলে দেহ থাকে না। একেবারে নির্বাসনা হ'ল তো সব ফুরাল। ৩২ ॥

(সবাই কি নির্বাসনা হতে পারে ?) তা' পারলে তো সৃষ্টি ফুরিয়ে যেত। পারে না বলেই তো সৃষ্টি চলছে—পুনঃ পুনঃ জন্মাচ্ছে। ৩৩ ॥

(ভগবান-দর্শন মানে) জ্ঞানচৈতন্যলাভ না তো আর কি ? নতুবা কি দুটো শিং বেরোয় ? । ৩৪ ॥

দেখা না পেলে কোথা থেকে ভালবাসা হয় ? এই তোমার সঙ্গে দেখাটি হয়েছে—আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে। ৩৫ ॥

অবিশ্বাস তো আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম করেই তো বিশ্বাস হয়। এই রকম হ'তে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয়। ৩৬ ॥

ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে কৃপা হলে তবে প্রেমভক্তি হয়। এই প্রেমটা অতি গোপনীয় জিনিস, মা। ব্রজগোপীদের প্রেমভক্তি হয়েছিল। ৩৭ ॥

তাই তো, মা, বাছাবা কত বকুনি খাবে ! কত রকমের লোক আছে তার কি ঠিক আছে ? যারা সমাজ নিয়ে চলে, তাদের কেবলই ভয়। তোমরা এস, মা। আহা কত বকবে।

ঠাকুরের কৃপায় সব সোজা হ'য়ে যাবে। যদি বকে, কোন কথাটি বোল না। সংসারে কতরকম লোক থাকে। সব সহ্য করে থাকতে হয়। ঠাকুর বলতেন, শ, ষ, স—তিনটি স। যে সয় সে-ই রয়। ৩৮ ॥

শুধু তাঁর কৃপাতে হয়। তবে ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা কাটে। পূজা, জপ, ধ্যান—এসব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়, চন্দন ঘসতে ঘসতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবৎতত্ত্ব আলোচনা করতে করতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসনা যদি হতে পার এক্ষুণি হয়। ৩৯ ॥

যারা পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব সূক্ষ্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন যা ধরে, সেটাকে খুব আঁকড়ে ধরে। তাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ যখন চমকায় তখন শার্সিতেই লাগে, খড়খড়িতে লাগে না। ৪০ ॥

মুক্তি তো প্রতিক্ষণে দেওয়া যায়। কিন্তু ভক্তি ভগবান সহজে দিতে চান না। ৪১

আমার যা করে দেবার, আমি সেই এক সময়ে করে দিয়েছি। তবে যদি সন্ত শান্তি চাও, সাধন ভজন কর, নতুবা দেহান্তে হবে। ৪২

বাবা, তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ সেই খাটখানাসমেত তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙ্গতেই কি বুঝতে পারবে যে স্থানান্তর হয়েছ? না, যখন বেশ পরিষ্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন দেখবে যে অন্যত্র এসেছ। ৪৩ ॥

বাবা, ওটা (মনের দুর্বলতা) প্রকৃতির নিয়ম; যেমন অমাবস্যা, পূর্ণিমা আছে না? তেমনি মনও কখনও ভাল, কখনও মন্দ হয়। ৪৪ ॥

ধ্যানজপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার। কারণ কখন যে ক্ষণ বয়, বলা যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়—টের পাওয়া যায় না। সেজন্য যতোই গোলমাল হোক, নিয়ম রাখা খুব দরকার। ৪৫ ॥

যা না করে ধনে জনে, তা করে ক্ষণের গুণে। ৪৬ ॥

রাত যাচ্ছে, দিন আসছে; দিন যাচ্ছে, রাত আসছে—এই হ'ল সন্ধি। এই সময় মন পবিত্র থাকে। ৪৭ ॥

কাম একেবারে যায় গা! শরীর থাকলেই কিছু না কিছু থাকে। তবে কি জান? সাপের মাথায় ধূলপড়া পড়লে যেমনটি হয়, তেমনটি হয়ে যাবে। ৪৮ ॥

ভয় কি? সর্বদা জানবে, তোমাদের পিছনে একজন আছেন। যতদিন (এ) শরীর আছে, আনন্দ করে চলে যাও। ৪৯ ॥

ঘাস আর বাঁশ ছাড়া সকলকেই এখানে আসতে হবে। ৫০

যেমন ঝড়ে মেঘ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তাঁর নামে বিষয়-মেঘ কেটে যাবে। ৫১ ॥

এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলামই বল, কিছুই কিছু নয়। মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন। ৫২ ॥

ওকি গো, মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য হলেও অপ্রিয় করে, বলতে নেই। শেষে ঐরূপ স্বভাব হয়ে যায়। মানুষের চক্ষুলজ্জা ভেঙ্গে গেলে আর মুখে কিছু আটকায় না। ঠাকুর বলতেন, 'একজন খোঁড়াকে যদি জিজ্ঞাসা করতে হয়, তুমি খোঁড়া হলে কি করে?—তাহলে বলতে হয়, পা-টি অমন খোঁড়া হল কি করে?' ৫৩ ॥

ফুলটি দেবসেবায় লাগলেই সব চেয়ে সার্থক; না হয় গাছেই শুকিয়ে যাওয়া ভাল। আমার দেখে বড় কষ্ট হয়, যখন বাবুরা ফুলটি কখনও তোড়া করে, কখনও বা এমনি হাতে নিয়ে নাকের কাছে একবার ধরে বলে, 'বাঃ, বেশ তো গন্ধটি!' ওমা পরক্ষণেই হয়তো মেঝেয় ফেলে দিয়েছে। জুতোয় মাড়িয়েই হয় তো চলেছে। চেয়েও দেখলে না। ৫৪ ॥

ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রদ্ধা করে ছুঁড়ে দিলে? ছুঁড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীরে হয়ে রাখতেও ততক্ষণ। ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছবোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। আবার তো ওটি দরকার হবে?…এ সংসারে ওটও তো একটি অঙ্গ। সেদিক দিয়েও তো ওর একটা সম্মান আছে। যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। ৫৫ ॥

…জপধ্যান, প্রার্থনা বিশেষ দরকার।…ওটি হ'ল যেন নৌকার হাল। ৫৬ ॥

…সামর্থ্য থাকলে দেবে বইকি। যে প্রার্থী সেই গরীব। ৫৭ ॥

এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসনা প্রার্থনা করতে হয়। কেন না বাসনাই সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মুক্তিপথের অন্তরায়। ৫৮ ॥

ক'জন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়? সে ব্যাকুলতা কোথায়? এত তো ভক্তি, আগ্রহ—এদিকে সামান্য একটু ভোগ্যবস্তু পেলেই সন্তুষ্ট! বলে, ‘আহা, তাঁর কি দয়া।’ ৫৯ ॥

আকাশে চাঁদটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে তো চাঁদটি দেখতে পাবে। ফস করে কি যায়? এও তেমনি। ৬০ ॥

সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ মন ভাল থাকে। সর্বদা সাধনভজন করতে পার না বলেই ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ করা দরকার। ৬১ ॥

এ সৃষ্টির মধ্যে কত গোলমেলে,—ঠাকুর এটাকে দিয়ে সেটা করেন, হাড়ীর মাকে নিয়ে তাড়ীর মা, এটাকে দিয়ে সেটা, কত কি! ৬২ ॥

নাটাইতে সুতো যেভাবে গুটিয়েছে—লাল সুতো, কালো, সাদা—খোলবার সময় তেমনি করে খুলবে তো? ৬৩ ॥

তিনি কি আর একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? এ যেন তাঁর একটা কল চলছে—এই যেমন ময়দার কল। কলওয়ালা দেখছে, কলটি যাতে নষ্ট না হয়। সে কি কোথায় একটি একটি করে গম গুঁড়ো হচ্ছে দেখছে? তেমনি তাঁর কলটি তিনি ঠিক রাখছেন। কোথায় কে কি খুঁটিনাটি করছে তা কি তিনি অত দেখছেন? তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, তাঁকে সর্বক্ষণ দেখতে হচ্ছে। অত খুঁটিনাটি দেখলে কি চলে?। ৬৪ ॥

মানুষ নিজের মনটি আগে দোষী করে নিয়ে তবে পরের দোষ দেখে। পরের দোষ দেখলে তাদের কি হয়?—নিজেরই ক্ষতি। আমার এইটি ছেলেবেলা থেকেই স্বভাব যে আমি কারও দোষ দেখতে পারতুম না। আমার জন্ম যে এতটুকু

করে আমি তাকে তাই দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি। তা আবার মানুষের দোষ দেখা! মানুষের কি দোষ দেখতে আছে! ওটি শিখিনি। ক্ষমারূপ তপস্যা। ৬৫॥

এ কলিতে শুধু সত্যের আঁট থাকলেই ভগবানলাভ হয়। ঠাকুর বলতেন, 'যে সত্যকথাটি ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে।'। ৬৬॥

ঠাকুর বলতেন, 'আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে।' 'ছাঁচে ঢালা' মানে ঠাকুরকে ধ্যান-চিন্তা করা। ঠাকুরকে ভাবলেই সব ভাব আসবে। ৬৭॥

(বটফলের বীজ, লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট—অথচ তা থেকে অত প্রকাণ্ড গাছ!) তা' হবে না? এই দেখ না, ভগবানের নামের বীজ কতটুকু? তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম এসব কত কি হয়!। ৬৮॥

এমন যে জল, যার স্বভাবই নীচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নীচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে। ৬৯॥

তোমাদের চৈতন্য হোক, ভক্তিবিশ্বাস হোক। ৭০ ॥

পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়েছে, তাই দেখে ছোট ছোট মাছেরা আনন্দে সেইখানে খুব লাফালাফি করে খেলা করছে—ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্ব অবস্থা। লাফালাফির পর অবসাদ এল—কিছুই বুঝতে পারলে না। ৭১॥

ব্রহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান—সাধু পুরুষেরা সব আসেন মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জন এক এক রকমের বোল বলেন। পথ অনেক, সে জন্য তাঁদের সকলের কথাই সত্য।

একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে, হরেক

রকমের বোল বলছে। শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলগুলিকে আমরা পাখীর বোল বলি—একটাই পাখীর বোল আর অন্যগুলো পাখীর বোল নয় এরূপ বলি না। ৭২ ॥

সূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে মাটিতে। উপরে সূর্য নিচে জল। জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সূর্য, আমাকে তুমি টেনে তুলে নাও উপরে? সূর্য নিজের স্বভাব থেকেই টেনে নেয়। তেমনি আমি সকলের মা। সকলকে স্বভাববশেই টেনে নেব। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না। ৭৩ ॥

মন্ত্র তন্ত্র কিছু নয়, মা, ভক্তিই সব। ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইষ্ট, সব পাবে। উনিই সব। ৭৪ ॥

দেখ মা, সকলেই বলে ‘এ দুঃখ, ও দুঃখ—ভগবানকে এত ডাকলুম, তবু দুঃখ গেল না।’ কিন্তু দুঃখই তো ভগবানের দয়ার দান। ৭৫ ॥

যত বড় মহাপুরুষই হোক, দেহধারণ করে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়। তবে তফাত এই, সাধারণ লোক যায় কাঁদতে কাঁদতে, আর ওঁরা যান হেসে হেসে—মৃত্যুটা যেন খেলা। ৭৬ ॥

মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন ‘মা’ আছেন। ৭৭ ॥

জোছনা রাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি, ‘তোমার ঐ জোছনার মতো আমার অন্তর নির্মল করে দাও।’ ৭৮॥

সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদি ডোমের মাঝেও তিনি—তবে তো মনে দীনভাব আসবে। ৭৯ ॥

জপধ্যান করতে করতে দেখবে—(ঠাকুরের ফোটো দেখিয়ে) উনি কথা কবেন, মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূর্ণ করে দেবেন—কি শান্তি প্রাণে আসবে। ৮০ ॥

মন না মত্ত হস্তী, মা। হাওয়ার সঙ্গে ছোটে। তাই সদসৎ বিচার ক’রে সব দেখতে হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্য। ৮১ ॥

প্রসাদে ও হরিতে কোন প্রভেদ নেই—মনে এটি স্থির বিশ্বাস রেখো। ৮২ ॥

বাবা, তোমাদের পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার বুকে শেল বাজে। ৮৩ ॥

বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি—আমি থাকতে ভয় কি?...ঈশ্বর হাত পা ইন্দ্রিয়াদি দিয়েছেন, তারা তো ছুঁড়বেই, তারা তাদের খেলা খেলবেই। ৮৪ ॥

মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে। শেষে কি শিব গড়তে বানর হয়ে যাবে। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকা ভাল। তিনি যখন যেমন দরকার তেমন দিবেন। তবে ভক্তি ও নির্বাসনা কামনা করতে হয়—এ কামনা কামনার মধ্যে নয়। ৮৫ ॥

বাবা, ঠাকুর দয়া করবেন, তাঁকে ডাকো। আব সৎসঙ্গ কর, সাধনভজন কব। ৮৬ ॥

কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে। ৮৭ ॥

আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখ যে, তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন। ৮৮ ॥

অভ্যাসের কত শক্তি! জপ অভ্যাস করতে করতে মানুষ সিদ্ধ হয়—জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ। ৮৯ ॥

প্রারব্ধের ভোগ ভুগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়—যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হ'ল। ৯০ ॥

আন্তরিক হলে শেষটা ক্রমে এখানেই এসে পড়বে। দেখছ না এখন তারকব্রহ্ম নামের ছড়াছড়ি। একটু সার থাকলে কেউ বড় বাদ যাবে না। ১১ ॥

আমি তোমায় কি বলব, মা, আমি তো কিছুই জানিনা। ঠাকুরের একখানি ছবি নিজের কাছে রেখো, আর জানবে তিনি সত্য—ঠাকুর তোমার কাছে রয়েছেন। তাঁর কাছে কেঁদে কেঁদে মনের দুঃখ জানাবে, ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলো—ঠাকুর, আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শান্তি দাও। এ-রকম করতে করতে তোমার প্রাণে শান্তি আপনি আসবে। ঠাকুরে ভক্তি রেখো, যখনই কষ্ট হবে ঠাকুরকে জানিয়ো। ১২ ॥

সর্বদা মনে ভাববে, আমি কার সন্তান, কার আশ্রিত! যখনই মনে কোন কু-ভাব আসবে, মনকে বলবে—তার ছেলে হয়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? দেখবে—মনে বল পাবে, শান্তি পাবে। ১৩ ॥

যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসোনা। ভাল বাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়। যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না। তোমার কোন ভয় নাই। ১৪ ॥

যার আছে সে মাপো; যার নাই সে জপো। তা'ও না পার (ঠাকুরকে দেখিয়ে) শরণাগত হও। একটু মনে রাখলেই হল—আমার একজন দেখবার আছেন, একজন মা কি বাবা আছেন। ১৫ ॥

মন স্থির করে একবার ডাকলে লক্ষ জপের কাজ হয়। নতুবা সারাদিন জপ করছে, কিন্তু মন নেই, তাতে ফল কি? মন চাই, তবে তাঁর কৃপা। ১৬ ॥

হ্যাঁ (দেখেছিলুম), একটি মেয়ে একটি কলসী ও ঝাঁটা হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কে গা? সে বললে—অমৃতের কলসী ছড়িয়ে যাব। তাই বুঝি হচ্ছে। ১৭ ॥

সাধুর সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়।…সাধুর রাস্তা বড় পিছল।

পিছল পথে চলতে হলে সর্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের কথা ?.. সাধুর গেরুয়া কাপড় কুকুরের বগলসের মতো তাকে রক্ষা করবে। কেউ তাকে মারতে পারবে না। সাধুর সদর রাস্তা। সকলেই ছেড়ে দেয়। ৯৮ ॥

নির্জনে হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন ভজন করে মন পাকলে তারপর মনকে যেখানেই রাখ, যে-লোকের সঙ্গেই মেশো একরূপই থাকবে। যখন গাছ চারা থাকে তখন চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বড় হলে ছাগল গরুতেও কিছু করতে পারে না। নির্জনে সাধন করা খুব দরকার। যখন মনে কোন বিষয় উদিত হবে, জানবার ইচ্ছা হবে, তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট প্রার্থনা করবে। তিনি সমস্ত মনের ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে দেবেন। ৯৯ ॥

ঠাকুর তোমার সন্ন্যাস রক্ষা করুন। তিনি দেখছেন, তোমার ভয় কি ? ঠাকুরের কাজ করবে, আর সাধন ভজন করবে, কিছু কিছু কাজ না করলে মনে বাজে চিন্তা আসে। একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে।১০০॥

কাশী তোমাদের স্থান। সাধন মানে তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা মনে রেখে তাঁর চিন্তাতে মনকে ডুবিয়ে রাখা তাঁর নাম জপ করবে। ১০১ ॥

জলেতে ইচ্ছে করেই পড়, আর ঠেলেই ফেলে দিক—কাপড় ভিজবেই। নিত্য ধ্যান করবে। কাঁচা মন কি-না! ধ্যান করতে করতে মনস্থির হয়ে যাবে। সর্বদা বিচার করবে। যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন সমর্পণ করবে। একটি লোক মাছ ধরছিল—পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, কিন্তু তার ফাতনার দিকেই দৃষ্টি। ১০২ ॥

জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

ভগবান লাভ করা ও তাঁর পাদপদ্মে সর্বদা মগ্ন হয়ে থাকা। ১০৩ ॥

তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম অনুসারে সকলে নিজ

নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক—কিন্তু জায়গা ও বস্তু ভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। ১০৪ ॥

সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ১০৫ ॥

বিষয়ী লোকদের বাতাস লাগাও খারাপ। ১০৬ ॥

…মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না। তোমার কাজ তুমি করে যাবে। নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হবে—বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মতো। বাতাস থাকলে প্রদীপের শিখা স্থির থাকে না, মনেও কল্পনা বাসনা থাকলে মন স্থির হয় না। ঠিক ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ না হলে দেরী হয়। একটি স্ত্রীলোকের মন্ত্র ছিল 'রুক্মিণীনাথায়'। সে 'রুকু' 'রুকু' জপ করতো। সেজন্য তাকে কিছুদিন ঠেকতে হয়েছিল। পরে, আবার তাঁর কৃপায় সে ঠিক মন্ত্র পায়। ১০৭ ॥

যারা এসেছে, যারা আসেনি, যারা আসবে—আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা, আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে। ১০৮ ॥

' প্রকৃতিং পরমাং ' গ্রন্থ সমাপ্ত